ইয়া উখতি

হে আমার বোন

সংকলন বিয়ে : অর্ধেক দ্বীন টিম

মুওয়াহহিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

সূচীপত্র

৩	এসো জান্নাতের পথে
৩৭	নারীদের প্রতি ধর্মীয় দিকনির্দেশনা
৯৫	ইসলাম প্রতিষ্ঠায় নারীর অবদান
১৩৯	জিহাদে নারীর ভূমিকা
১৫৯	মুজাহিদের জীবন সঙ্গিনী...
১৬৬	তিনি ছিলেন এ ধরার শাহীদের সাক্ষী...
২৪৩	সত্যের পথে মৃত্যুর এই অদম্য বাসনা, আমাদেরকে থামতে দেয় না
২৫৪	হিজরতের পথে অবিচল
২৬৯	একটা প্রেমের গল্প

এসো জান্নাতের পথে

মুসলিম বোনদের উদ্দেশ্যে বার্তা

মাওলানা আসেম উমর হাফিজাহুল্লাহ

الحمد لله الدي جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من بنين حفدة ورزقكم من الطيبات افبا لباطل يؤمنون و بنعمة الله هم يكفرون ونشهد ان لااله الاالله وحده لاشريك له و نشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بعث بشيرا ونذيرا—اما بعد: فأعوذ باالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়, যেমন এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়। [সুরা হাদীদ ৫৭:২০]

হামদ সালামের পর.....

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজিদে জায়গায় জায়গায় একথা বুঝিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা মহিলাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তারা যেন দুনিয়াতে থেকে আখিরাতের প্রস্তুতি নেয়। দুনিয়াতে পাঠানোর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, মন মতো জীবন-যাপন করবে এবং হাঁসি, মজাক ও নফসের পূজায় জীবন পার করে দিবে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এই দুনিয়ার বাস্তবতা নিজ কিতাবে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে বলেন, দুনিয়ার এই নাজ নেয়ামত, জনসমাবেশ, রঙিন জীবন, বিলাসিতা, আনন্দ-ফুর্তি সবই খেল তামাশা। যত অর্থ সম্পদ আছে একে অপরের উপর গর্ব করার জন্য অন্যকে নিচু করার জন্য এ সব কিছুই ভুসির মত। গ্রামে-গঞ্জে ফসল কাটার সময় ভুসি উড়তে দেখা যায়। গম ভাঙানোর সময় কোন মানুষ তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নাকে রুমাল চেপে যায়। কিন্তু এই ভুসি যখন গমের সাথে ক্ষেতে থাকে তখন কৃষকের কাছে খুব ভালো লাগে। তেমনিভাবে দুনিয়ারও একই অবস্থা। বর্তমানে তো একে ক্ষেতে দুলতে থাকা ফসলের মত সুন্দর মনে হয়। কিন্তু এর পরিণতি এই ফসলের ভুসির মতো।

সূরা তীনের মধ্যে আল্লাহ এই হাকিকত বর্ণনা করে দিয়েছেন। যে সূরা নিয়ে মহিলারা অনেক গর্ব করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴿١﴾ وَطُورِ سِينِينَ ﴿٢﴾ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴿٣﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ

শপথ আঞ্জীর (ডুমুর) ও যয়তুনের, (১) এবং সিনাই প্রান্তরস্থ তূর পর্বতের, (২) এবং এই নিরাপদ নগরীর। (৩) আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে। (৪) অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে নীচে। (৫) (সূরা আত-তিন ৯৫; ১-৫)

তীন ও যাইতুনের কসম! এই নিরাপদ শহরের কসম! لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ আমি মানুষকে সব থেকে সুন্দর আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছি। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যৌবনে মানুষের সৌন্দর্য অনেক থাকে। মানুষ এটা নিয়ে গর্ব করে। অবশ্যই আল্লাহ তীন, যাইতুন এবং মক্কার কসম খেয়ে বলেন, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর আকৃতি দান করেছি।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যৌবনে সৌন্দর্যের ঝলকানি থাকে। সৌন্দর্যে ঢেউ খেলে। যৌবনের অহংকারে লিপ্ত থাকে। আয়নার সামনে এলে নিজের সৌন্দর্য দেখে অজান্তেই ঠোটে মুচকি হাসি ফোটে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন - আমি মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর আকৃতি দিয়ে তৈরি করেছি। তার গাল, চামড়া, সৌন্দর্য, গঠন-আকৃতি খুব সুন্দর করে বানিয়েছি।

কবি এই সৌন্দর্যের প্রশংসায় আসমান জমিনে বিপ্লব ঘটিয়েছে। কেউ তো পূর্ণিমার চাঁদের সাথে তাকে তুলনা করেছে। কেউ তাকে মুক্তার মত বলেছে। কেউ গোলাপের লাল বলেছে। কোন কবি বলেছেন,

وَلَقَدْ ذَكَرْتُكِ وَالرِّمَاحُ نَوَاهِلٌ ۞ مِنِّي وَبِيضُ الْهِنْدِ تَقْطُرُ مِنْ دَمِي
فَوَدِدْتُ تَقْبِيلَ السُّيُوفِ لِأَنَّهَا ۞ لَمَعَتْ كَبَارِقِ ثَغْرِكِ الْمُتَبَسِّمِ

এক ব্যক্তি আবেগের বশে তার স্ত্রীকে বলেছিল, "তুমি যদি পূর্ণিমার চাঁদের চেয়ে সুন্দর না হও, তাহলে তুমি তিন তালাক"।

ব্যাপারটি খলিফা মানছুরের কাছে গেল। সব ফকিহগণ ফতোয়া দিয়েছেন তালাক হয়ে গেছে। এক ফকিহ বললেন - তালাক হয়নি। দলিল হিসেবে উল্লেখ করলেন এই আয়াত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (1) وَطُورِ سِينِينَ (2) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4)

শপথ আঞ্জীর (ডুমুর) ও যয়তুনের, এবং সিনাই প্রান্তরস্থ তূর পর্বতের, এবং এই নিরাপদ নগরীর। আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সবচেয়ে সুন্দরতর অবয়বে। [সুরা তীন ৯৫:১-৪]

সুতরাং মানুষের এই সৌন্দর্যের মোকাবেলায় চাঁদের এই সুন্দর্য কি ই বা প্রভাব ফেলতে পারে।

এর পর আল্লাহ তা'আলা বলেন:

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ

প্রত্যেক উন্নতির অবনতি আছে।

তারপর এই যৌবনের পরে, এই গর্বের পরে এর শেষ হওয়াও আছে।

হে এই সৌন্দর্যে গর্বকারী,

এই রূপ, এই দুনিয়া অস্থায়ী, এক দিন সব শেষ হয়ে যাবে। এই অস্থায়ী সৌন্দর্যকে স্থায়ী মনে করা যাবে না। অবস্থা দেখে মনে হয় চিরকাল এই অবস্থা থাকবে। কখনই বার্ধক্য গ্রাস করবে না। কিন্তু সময়কে কেউ কি বেঁধে রাখতে পেরেছে?

সুতরাং মনে রেখ এই যৌবনের পর বার্ধক্য আসবে। এই দুনিয়ার মোহাব্বত কারো মধ্যে যদি বসে যায় তাহলে বয়স তিরিশের বেশি হওয়াকেই ভয় লাগে। আফসোস লাগে, এখন তো এই যৌবন সৌন্দর্য শেষ হওয়ার পথে।

তারপর একদিন এই রূপ সৌন্দর্য শেষ হয়ে যায়, চেহারায় ভাজ পড়ে। যেই আয়নার সামনে দাঁড়ালে আগে খুব ভালো লাগত, এখন সেই আয়নার সামনে দাঁড়াতে মন চায় না। চামড়া ঢিলা, পেশি দুর্বল হয়ে যায়। নিজের কাছেই আর ভালো লাগে না।

মানুষ হলো আত্মতৃপ্তিবোধকারী। মিথ্যা আশ্রয়, সত্যকে লুকানোর জন্য মনকে প্রবোধ দেয়। কিন্তু বাস্তবতা থেকে কে পলায়ন করতে পারে?

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ

প্রত্যেক উন্নতির অবনতি আছে।

অস্তিত্বের পর অনস্তিত্ব আছে। যৌবনের পর বার্ধক্য আছে।

শাহ ইসমাইল শহীদ রহ. একবার খবর পেলেন যে, দিল্লীর সমস্ত গায়িকা, নর্তকী এক ঘরে উপস্থিত হয়েছে। ঘরটি ছিল তাদের মালিকানের। কোন একটি অনুষ্ঠান ছিল। তিনি সেই ঘরের সামনে গিয়ে দরজায় করাঘাত করলেন। এক গায়িকা বের হয়ে এসে ভিক্ষুক মনে করে কিছু পয়সা দিতে চাইল। তিনি বললেন, “আগে আমি খদ্দের হই, তারপর কিছু নেব”। সে গিয়ে মালিকানকে বললে মালিকান বলল, “কোন ভিক্ষুক হবে হয়ত। যাও ডেকে নিয়ে আসো। মজা করা যাবে কিছুক্ষণ”।

শাহ সাহেব ঘরে প্রবেশ করে সূরা ত্বীন তেলাওয়াত করে তাফসীর করা শুরু করলেন। যখন তিনি ثم رد دناه اسفل سا فلين এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন সবাই চিৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করে দিল। তারপর ঘরের মালিকান তওবা করে চিরদিনের জন্য নিজের জীবনকে জিহাদের জন্য ওয়াকফ করে

দিল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল? [সুরা ইনফিতার ৮২:৬]

হে আমার বোন!

কথা তো এত কঠিন না। নর্তকীরা কথা বুঝে গেছে তো তোমাদেরকে কোন জিনিস ধোঁকায় ফেলে রেখেছে? এই যৌবন তো শেষ হয়ে যাবে। এর বাস্তবতা যদি বর্ণনা করা হয় তাহলে তো মানুষেরই ঘৃণা চলে আসবে।

হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন আমাদের সামনে দুনিয়ার বাস্তবতা তুলে ধরতেন, তখন এমন ভাবে উপস্থাপন করতেন যে, আমাদের নিজেদের উপর ঘৃণা সৃষ্টি হত"।

আজ যুবকদের কি অবস্থা!! তারা আল্লাহর হুকুমের পরোয়া করে না। আল্লাহ যে জিনিস হারাম করেছেন তার কোন পরোয়া নেই। মনে রেখ! একদিন এই যৌবন শেষ হবে, উন্নতির পর অবনতি আসবে। একদিন দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। সমস্ত মাল সামানা ভাগ বণ্টন হয়ে যাবে। সন্তান ও আত্মীয় স্বজনরা কবরে ফেলে আসবে। এই সব কিছু খেলাধুলার মত। দুনিয়ার কোন 'আনন্দ অনুষ্ঠান' হলে অপেক্ষার পর অপেক্ষা করতে থাকে। তারপর সে সময় এসে শেষ হয়ে যায়। তারপর আর কী থাকে?

হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মোহাব্বতকারী বোন!

এই দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ো না। এটা বড় চালবাজ, ধোঁকাবাজ, নিজের জালে এমনিতেই ফাঁসিয়ে দেয়। লম্বা-চওড়া ওয়াদা করে কিন্তু কারো সাথে ওয়াদা পূরণ করেনি। সে কারো হয়নি। যে একবার দুনিয়ার পিছনে পড়েছে দুনিয়া তাকে ঐ কুকুরের মত বানিয়ে দিয়েছে, যে একটি হাড্ডি বা একটি রুটির টুকরার জন্য লেজ নাড়িয়ে মালিকের পিছনে চলতে থাকে।

নিজের পূর্বের লোকদের দেখ, দুনিয়া কি তাদের সাথে স্থায়ী হয়েছে? যখন তাদের সৌন্দর্য শেষ হয়ে গেছে, চামড়া ঢিলা হয়ে গেছে দুনিয়া কি তাদের কোন মূল্যায়ন করেছে? কোথায় গেলো সেই রং তামাশা? কোথায় গেলো সেই আড্ডা? কোথায় সেই হাসি-তামাশা? কোথায় সে খেলার সাথী? সবাই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সবাই দূরে চলে গেছে।

এই দুনিয়া কি কোন কাজে আসবে? যখন মালাকুল মউত মাথার কাছে এসে দাঁড়াবে - দুনিয়া ও দুনিয়াদার সবাই তোমাদের মরার অপেক্ষায় থাকবে। কখন মৃত্যু হবে আর অন্ধকারে নিক্ষেপ করে ঘরে গিয়ে আরাম করবে। তোমার ধন-দৌলত অর্জনের জন্য লড়াই করবে। তোমার ঘর-বাড়ী কবজা করার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হবে। ব্যাংক ব্যালেন্সকে হাতানোর জন্য পুলিশের সাহায্য নিবে। কোথায় গেল সেই মোহাব্বত? কোথায় গেল সেই প্রেম? কোথায় গেল সেই ভালোবাসা?

এটাই কি সততা? এটাই কি ভালোবাসা? আজ অনেকেই জীবন বের হওয়ার আগ পর্যন্ত আল্লাহর হুকুমের খেলাফ করতে থাকে। নবীর সুন্নতের বিপরীত

জীবন-যাপন করে। নামাজ পড়ে না, পর্দা করে না, জিহাদ করে না, এমনকি জিহাদের তামান্নাও তাদের অন্তরে রাখেনা।

আজ কে আছে যে, মালাকুল মউতের হাত থেকে বাঁচাবে? সেই স্বামী কি বাঁচাতে পারবে, যে তোমার জন্য মরার কসম খেয়েছিল? নিজের সেই সন্তান, যার জন্য নিজের সমস্ত খুশি-আনন্দ কুরবান করে দিয়েছ? সেই সখিরা, যাদের জন্য নামাজও কাজা করে দিতে? নাকি খান্দানের সেই রীতি-নীতি যা রক্ষা করার জন্য নিজের পর্দাও ছেড়ে দিয়েছিলে? কে আজ তোমাকে বাঁচাবে?

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

প্রত্যেকেরই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। [সুরা আনকাবুত ২৯:৫৭]

মালাকুল মউত এসে এজন্য অপেক্ষা করবে না যে, প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে কি না, আশা ভরসা পূরণ হয়েছে কি না। আজরাইল আসবে ভীতিকর চেহারা নিয়ে। আল্লাহর পানাহ! তার হাত থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। ধনী হোক বা গরীব। চাটাইয়ের উপর ঘুমাক অথবা মখমলের বিছানায় ঘুমাক। কখনও কি ভীতিকর স্বপ্ন দেখেছো? কেউ কি স্বপ্নে তোমার গলা চেপে ধরেছে? এমন ভীতিকর চেহারা যে, দেখলেই মনে ভয় ধরে যায়, শরীরে কাঁপুনি এসে যায়। বাস্তবে মালাকুল মউত আসলে অবস্থা আরও ভয়াবহ হবে।

চিন্তা করো, সে সময় কোনো জিনিস তোমার কাজে আসবে না। আলিশান বাড়ি, দামি গাড়ি, দামি পোশাক, কোন বন্ধু-বান্ধব কেউ কোন কাজে আসবে না। তারা শুধু পাশে বসে থাকবে। তারপর কবরের অন্ধকার রাত, যদি

আমল ভালো না হয়। যদি এই জমিনের উপর নাফরমানি করা হয় তাহলে জমিন রাগ্বান্বিত অবস্থায় থাকবে। দুনিয়ায় নাফরমানি কারীর কবর, গুনাহগারের কবর হবে - অন্ধকার কবর। দুনিয়াতে কখনও অন্ধকার কামরায় একা একা সময় অতিবাহিত করেছো?

এরপর কবরের সাপ বিচ্ছু তো আছেই। তুমি তো তেলাপোকাকেও ভয় পাও। কবরে সাপ, বিচ্ছু, টিকটিকি শরীরে চলাফেরা করতে থাকবে যদি শরীরে অজুর পানি না লেগে থাকে। যে কান দিয়ে সারাক্ষণ গান বাজনা শুনেছো যদি তওবা না করে মৃত্যুবরণ করো তাহলে বিচ্ছু সেই কানে তার বিষ ঢেলে দেবে। স্বর্ণ রৌপ্যের যাকাত আদায় না করা হলে সাপ কামড়াবে। চোখ খোলা থাকবে। সেদিন এই সম্পদ কোন কাজে আসবে না।

টিভির লেকচারার, দ্বীনের বিকৃতিকারী, বহুরূপী মানুষগুলো - যারা দ্বীনকে মানুষের সামনে মিষ্টি মিষ্টি করে উপস্থাপন করেছে তারাও পার পাবে না। খাহেশাতের মধ্যে লিপ্ত 'মডার্ন ইসলাম' - কোন কিছুই কাজে আসবে না। এক আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক করা ছাড়া বাকি সব বেকার সেদিন। তারপর হাশরের দিন আসবে। সেদিন কে কাজে আসবে? সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি করতে থাকবে। কোরআনে কারীমের জায়গায় জায়গায় বলা হয়েছে –

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى
وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

(কেয়ামতের ভয়াবহতা খুবই কঠিন) যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যধাত্রী তার দুধের শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয় বস্তুতঃ আল্লাহর আযাব সুকঠিন। [সুরা হাজ্জ্ব ২২:২]

সে দিন দুগ্ধ দানকারিনী মা তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে, ভয়াবহতার কারণে গর্ভবতী মায়ের গর্ভ বেরিয়ে পড়বে, ভয়-ভীতির কারণে একে অপরকে ভুলে যাবে, কেউ কাউকে চিনবে না, প্রত্যেকেই এই কামনা করবে, হায়! যদি কোনভাবে আমার জান বের হয়ে যেত। তার স্থানে তার সন্তান ফেঁসে যাওয়াকে কামনা করবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ﴿١١﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿١٢﴾ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ﴿١٣﴾ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ﴿١٤﴾

অর্থ: সেদিন গোনাহগার ব্যক্তি পণ স্বরূপ দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে, তার স্ত্রীকে, তার ভ্রাতাকে, তার গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত। এবং পৃথিবীর সবকিছুকে, অতঃপর নিজেকে রক্ষা করতে চাইবে। [সুরা মা'য়ারিজ ৭০:১১-১৪]

স্বামী চিন্তা করবে আমার স্ত্রী ও তার সবকিছু দিয়ে নিজে বেঁচে যাই আগে। সে চাইবে তার বাড়ী-গাড়ি, অলঙ্কারাদি, ধন-সম্পদ, ব্যাংক-ব্যালেন্স সবকিছু দিয়ে হলেও বেঁচে যাই। কিন্তু কোন কাজ হবে না। বলা হবে:

كَلَّآ إِنَّهَا لَظَىٰ • نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ

অর্থ: কখনই নয়। নিশ্চয় এটা লেলিহান অগ্নি, যা চামড়া তুলে দিবে। [সুরা মা'য়ারিজ ৭০:১৫-১৬]

কিছুতেই কেউ কারো উপকারে আসবে না। দুনিয়ার মুহাব্বত, আত্মীয়তার বন্ধন সব ছিন্ন হয়ে যাবে। বন্ধুদের মজমা-আড্ডা খানা, রং তামাশা, মৌজ-মাস্তি কোন কিছুই কাজে আসবে না। যে সমস্ত সম্পর্ক আল্লাহর নাফরমানির সাথে করা হয়েছিল তা সব শেষ হয়ে যাবে। সামনে জাহান্নাম অবস্থিত (আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন)। জাহান্নামকে সত্তর হাজার ফেরেশতা শেকলে বেঁধে নিয়ে আসবে। কান ফেঁরে দেওয়া হবে। ইরশাদ হচ্ছে:

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ

অর্থ: সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে। [সুরা হুদ ১১:১০৬]

হাশরের মাঠে সে দিন অস্বীকৃতির পর্দা ফেঁরে দেওয়া হবে। আর বলা হবে:

إِنَّهَا لَظَىٰ

[সুরা মা'য়ারিজ ৭০:১৫] নিশ্চয় এটা লেলিহান অগ্নি তথা জাহান্নাম।

نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ

যা চামড়া তুলে দিবে। [সুরা মা'য়ারিজ ৭০:১৬]

সেখানে দেহ থেকে চামড়া খসানো হবে। চেহারায় চামড়া, গোস্ত কিছুই বাকি থাকবে না। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

“কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে যে কখনও দুনিয়াতে কষ্ট ভোগ করেনি। তাকে জাহান্নামে একবার প্রবেশ করিয়ে বের করে আনা হবে। তারপর আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন, “তুমি কি দুনিয়াতে কখনও আরাম ভোগ করেছ”? সে বলবে, ‘না’। জাহান্নামের শাস্তির ভয়াবহতায় সে সব আরামের কথা ভুলে যাবে”।

হে আমার মুসলিম বোনেরা!

কোন জিনিস তোমাকে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে। একদিন এই মুখ কথা বলতে পারবে না। কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে:

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

অর্থ: আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। [সুরা ইয়া-সীন ৩৬:৬৫]

হে আমার মুসলিম বোনেরা!

এই দুনিয়া কোন কাজে আসবে না। এই দুনিয়ার সামান কোন কাজে আসবে না। এর দ্বারা ধোঁকায় পড়ো না। আল্লাহর দিকে ফিরে আসো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বত অন্তরে পয়দা করো, তার হুকুমসমূহের সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে দাও। আমাদের বুঝে আসুক বা না আসুক। আমাদের সহজ মনে হোক অথবা কঠিন মনে হোক। চাই তা হজ্জ ও ওমরার সফর হোক কিংবা জিহাদের মত ভারি কষ্টকর ইবাদত হোক। যে

আল্লাহর বান্দী হয়ে যাবে সেই কামিয়াব হবে। আল্লাহ আমাদের জন্য যে ফয়সালা করেছেন তাই আমাদের জন্য উপকারী। চিন্তা করার বিষয়, যে আল্লাহ পুরুষ মহিলাকে সৃষ্টি করেছেন তার থেকে বেশি উপকার ও জীবন-যাপনের পদ্ধতি আর ভালো কে জানবে?

আল্লাহ তা'আলা ছাড়া নিজের বান্দীদের উপর বেশি কে দয়াকারী হবে? মহিলাদের জন্য কোনটা উপকার ও কোনটা অপকার তা কি ইউরোপের ঐ নরপশু পুরুষ বলবে, যে কখনও মহিলাদেরকে নিজের জুতার চেয়ে বেশি ভালো মনে করেনি। ইন্ডিয়ার হিন্দুত্ববাদী সমাজ কি তার ফয়সালা করবে যারা মহিলাদেরকে মনুষ্যত্বের কলঙ্ক মনে করে।

হে আমার বোন!

একটু খেয়াল করুন - আল্লাহ তোমাকে কত ভালোবাসেন। তিনি একজন মহিলাকে সম্মানিত করার জন্য কত পদ্ধতি দিয়েছেন। তিনি জীবন-যাপনের জন্য যে পদ্ধতি দিয়েছেন এর থেকে উত্তম কোন পদ্ধতি কি হতে পারে? এই এনজিও গুলো কি তোমাদের জন্য আল্লাহ ও তার রাসূল থেকে বেশি দয়াশীল?

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে অতুলনীয় সম্মান দান করেছেন। তোমাদের জন্য নিজের জীবন কুরবান করেছেন। আরবে সে যুগে মহিলাদেরকে তো জীবন্ত কবর দেওয়া হত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি পরিমাণ সম্মান দিয়েছেন ইতিহাস তার সাক্ষী। যে ফয়সালা আল্লাহ ও তার রাসূল করেছেন তার থেকে উত্তম ফয়সালা আর কেউ করতে

পারবে না।

কেউ কেউ তোমাদেরকে খেলনার বস্তু বানাতে চায়। কেউ তোমাদের দ্বারা ডলার কামাই করে। কিন্তু আল্লাহ তো আল্লাহই, আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উম্মতের জন্য সব ধরণের কষ্ট সহ্য করেছেন। আজ আমাদের বুঝতে হবে মহিলাদের কামিয়াবি কোথায়। কিছু সময়ের জন্য ভুলে যাও সেই শ্লোগানকে যা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য গ্রহণ করেছো। কিছু সময়ের জন্য ঐ সমস্ত সুবিধাকে ভুলে যাও যে সুবিধা তোমাদেরকে বাজার, পার্ক ও বিভিন্ন জায়গায় ঘুরাঘুরির সুযোগ করে দিয়েছে।

তোমরা দেখো মহিলারা আজও সেই হিন্দু কালচারের মধ্যে ডুবে আছে। মহিলাদেরকে পশ্চিমা সভ্যতার বাঘ ও হিন্দুত্ববাদী সভ্যতার বাঘের সামনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই স্বাধীনতা, ঘুরাফেরা, আড্ডা, হাঙ্গামা, রোনক-সাজ সজ্জা, চাকরি-বাকরি সব নিজেদের জালে ফাঁসানোর ফন্দি। এ সবই ধোঁকা। এটা স্বাধীনতা নয়। এটা জাল। যাতে ফেঁসে সারা জীবন পুরুষের গোলামী করতে হয়। এটা কি স্বাধীনতা যে, ঘরের ছাদের নিচ থেকে বের করে বাস, সড়ক ও বাজারে ধাক্কা খাওয়ার জন্য নামিয়ে দেওয়া হয়? স্বামীর অধীনে থাকা সূখের সংসার ছিন্ন করে তাদেরকে দোকান, শপিং-মল, ফ্যাক্টরি ও কারখানার কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেখানে তাদেরকে পুরুষের লোভাতুর দৃষ্টিতে পড়তে হয়।

অনেকে বলে পশ্চিমা সভ্যতা নারীদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছে। আমি প্রশ্ন করি, সে দেশে মহিলাদের কী সম্মান আছে? মহিলাদের কী অবস্থান আছে? আরে জালেমরা! তোমরা তো মহিলাদেরকে নিজেদের খাহেশাত পূরণের খেলনা

বানিয়েছ। তোমাদের থেকে বেশি জুলুমকারী ও মহিলাদের উপর ডাকাতি-কারী আর কে হতে পারে। তোমরা তো মহিলাদেরকে সেই অধিকার থেকেও বঞ্চিত করেছ যা আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্মগতভাবে দিয়েছিলেন। তোমরা তো বোনকে ভাই থেকে আলাদা করেছ। তোমরা বলেছ মহিলারা তো স্বাধীন, তারা কেন ভাইয়ের মুখাপেক্ষী হবে। বোনকে ভাইয়ের বিরোধী বানিয়েছ। মেয়েকে পিতা থেকে আলাদা করেছ। তাকে তো তোমরা বাজারে বাজারে ঘুরে করুণা ভিক্ষা করায় লাগিয়ে দিয়েছ। তোমরা নারীর অধিকার সংরক্ষণকারী নও। তোমরা হলে নারীর অধিকার ছিন্নকারী। তোমরা স্বাধীনতার নামে মেয়েকে পিতা থেকে ছিনিয়ে নিয়েছ। মা বৃদ্ধাশ্রমে কথা বলার জন্য কাউকে পায় না। অসুস্থ হলে কেউ তাকে দেখার নেই। এমন কেউ নেই যে, বুড়ি মাকে এক গ্লাস পানি দিবে।

বলুন এই সমাজ থেকে খারাপ সমাজ আর কি হতে পারে? যে তার মায়ের হক চিনে না। বছরে একদিন মা দিবস পালন করে মনে করছে মায়ের হক আদায় করে দিয়েছে। না আমার বোনেরা। ধোঁকা খেয়ো না। এই জাহেলি সমাজ তোমাদের রক্ষাকারী নয় বরং তোমাদের দুশমন। এই সমাজ চায় সমস্ত মৌলিক হক নষ্ট করতে। এটা ইবলিশি সভ্যতা। তারা চায় ভাই-বোন, মা-মেয়ে ও পিতা-ছেলের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাক। খালা-ফুফুর সম্পর্ক যেন না থাকে। তাদের উদ্দেশ্য হল সমস্ত মহিলাদেরকে এক দৃষ্টিতে দেখা হবে। পুরুষ মহিলাদেরকে খাহেশাতের দৃষ্টিতে দেখবে। কোন লজ্জা শরম নেই, কোন আত্মীয়তা নেই, কোন দয়া-সহমর্মিতা নেই, কোন সমতা নেই। সমস্ত মহিলাকে এক রকম বানিয়ে দেওয়া হবে, যেভাবে ইউরোপ আমেরিকায়

বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু যদি ইসলামী সমাজ তৈরি হয়, তাহলে সেখানে কোন এনজিও বানানোর প্রয়োজন নেই। বরং এই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি সবার হক আদায়কারী হয়। বড়রা তো আছেই ছোটরাও নিজেদের মহিলাদের হক রক্ষার জন্য নিজেদের জীবন কুরবানি করে দেয়। তারা এজন্য কোন এনজিও বানায় না এবং কাফের দেশ থেকে বোনদের নামে ডলারও উসুল করে না। মহিলাদের ভিডিও বানিয়ে কাফেরদের দেখিয়ে নিজেদের জায়গা জমি ক্রয় করে না।

ইসলামী সমাজে বোন ইয়াতিম হয় না, বরং ভাইয়ের শক্ত বাহু তার সম্মান রক্ষায় প্রস্তুত থাকে। কোন ঘরে আগত বউ পুরো মহল্লার সম্মান হয়। তার সম্মান রক্ষায় যদি পুরো খান্দানের ক্ষতি হয় তাহলে তারা তা করতে রাজি থাকে। ইসলামী সমাজের মহিলাদেরকে এনজিওরা লালন-পালন করে না। মাকে কষ্ট দেওয়া তো দূরে থাক কেউ মাকে উফ বলারও অধিকার রাখে না, বরং ছেলেদেরকে বলা হয়েছে সর্বদা মায়ের জন্য দয়ার ডানা বিছিয়ে দিতে। দুনিয়া ও আখিরাতের কামিয়াবি আল্লাহ দ্বীনের মধ্যে রেখেছেন। মহিলাদের সফলতা পশ্চিমা সভ্যতার মধ্যে নেই, বরং আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর পদাঙ্ক অনুসরণের মধ্যে রয়েছে।

এই দুনিয়াতে খেল তামাশা ও ঘুরাফেরার জন্য তোমাদেরকে পাঠানো হয়নি। এটা কেমন গাফলতি যে, দুনিয়ার তামাশার মধ্যে পড়ে নিজেদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ভুলে যাবে। আল্লাহ তা'আলা এই দুনিয়াতে আখিরাতের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। যেদিন পরীক্ষার সম্মুখীন করা হবে, সেদিন সে

বোন কতই না নাদান হবে যে সারা বছরেও পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়নি। আর ফলাফলের দিন খুব আশা নিয়ে বসেছে। এত খুশি কিসের ভিত্তিতে? এটা কেমন জুলুম? আল্লাহর উপর এত সাহস কোথা থেকে হয়?

আল্লাহ তার বান্দী হতে বলেছেন কিন্তু তারা মানুষের বান্দী হয়ে বসে আছে। আল্লাহ তা'আলা তো নামাজের হুকুম করেছেন, যাকাতের হুকুম করেছেন, রোজার হুকুম করেছেন। কিন্তু আজ মহিলাদের কী হল তারা নামাজ পড়ে না। টিভির সামনে বসে নামাজ ছেড়ে দেয়। ভরি ভরি স্বর্ণ অলঙ্কার পরিধান করে কিন্তু যাকাত দেয় না। অথচ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يا معشر النساء فإني أريتكن أكثر أهل النار (رواه البخاري) تصدقن

"হে নারী সমাজ! তোমরা যাকাত আদায় করো, কারণ আমি তোমাদের অধিকাংশকে জাহান্নামের অধিবাসী দেখেছি"। (বুখারী)

নবী যুগের ঐ মহিলারা দ্বীনদার ছিলেন, তাদের ভিতরে জাহান্নামের ভয় ছিল, তাই তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথা শুনে তাদের অলঙ্কার খুলে খুলে দান করতে লাগল। কেউ চুড়ি দিল, কেউ কানের বালা, কেউবা গলার হার দিল, কেউ হাতের আংটি খুলে দিয়ে দিল। কারো কারো কাছে তখন কিছু ছিল না, তাই ঘরে গিয়ে অলঙ্কার বের করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পাঠিয়ে দিল। তারা তো সাহাবীয়া ছিলেন, যারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় নিজেদের সব উজার করে দিতেন। হিজরতও করেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দ্বীনের বিজয়ের

জন্য তারা নিজেদের বাপের বাড়ি, স্বামীর বাড়ি সব ছেড়ে হিজরত করেছেন। তারা ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতেন, তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জিহাদে বের হতেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব হুকুম যথাযথ পালন করতেন। জিহাদে স্বামীকে পাঠাতেন। তারা শহীদের স্ত্রী ছিলেন, শহীদের মা ছিলেন, শহীদের বোন ছিলেন এবং সন্তানদেরকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি করতেন। তাদের বাপ ভাই শহীদ হতেন।

তারা আমাদের যুগের নারীদের মত ছিলেন না যে, পর্দার খবর নেই, নামাজ রোজার খবর নেই, হালাল-হারামের খবর নেই, দান-সদকার খবর নেই, জিহাদের খবর নেই। বাবা, ভাই, স্বামী ও সন্তানদেরকে জিহাদে পাঠানোর খবর নেই। বরং এখন তো দেখা যায় তারা জিহাদের বিরোধিতা করে, জিহাদে গমনকারীদেরকে বারণ করে, জিহাদে না যাওয়ার বাহানা খুজে বের করে, জিহাদ ও ইসলামকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে উল্টো ষড়যন্ত্র করে, মুজাহিদদের বদনাম করে। আল্লাহর দুশমনদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করার পরিবর্তে হাম-দরদি প্রদর্শণ করে, তারপর বছরে একবার শবে কদরে রাত জেগে নামাজ-রোজা করে মনে করে আমরা ইসলাম বিজয় করে ফেলেছি। ইসলামের যত বিধি-বিধান আছে সব ছেড়ে দিয়ে বলে আমাদের এখনও দুনিয়ার চাহিদা পূরণ হয়নি তাই আখেরাতের ফিকির করার সুযোগ কোথায়?!!

পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিলাসিতায় ভরপুর। আবার জান্নাতের দাবিদার। মূলত এরা মডার্ন ইসলামের প্রবক্তা। এদের সিস্টেম হল দুনিয়াও যেন না ছুটে,

কোন পেরেশানিও যেন না আসে। ইসলামের জন্য কোন কুরবানিও যেন না করা লাগে আবার জান্নাতেরও বড় হকদার যেন হওয়া যায়। কিন্তু সাহাবিয়াদের অবস্থা দেখো কি পরিমাণ জাহান্নামের ভয় তাদের ভিতরে ছিল।

সুতরাং হে আমার বোনেরা!

দ্বীনের দিকে ফিরে আসুন। আল্লাহর ওয়াস্তে ফিরে আসুন। কুরআন আপনাদেরকে সতর্ক করছে।

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে, এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌছে যাও। এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্বরই জেনে নেবে। [সুরা তাকাসুর ১০২:১-৩]

দুনিয়ায় প্রাচুর্যের দিক দিয়ে অন্যের আগে বেড়ে যাওয়ার লালসা কবর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, সারাটি জীবন এর পিছে ব্যায় করা হয়, এই জন্য তো তোমাকে পাঠানো হয়নি। শিঘ্রই তুমি জানতে পারবে, সময় তো চলে যাচ্ছে, প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে জীবনের বহু কাজ করে যাচ্ছ, একপর্যায়ে এই শ্বাস-প্রশ্বাস মৃত্যুর সন্নিকটে গিয়ে ঠেকবে। এই দুনিয়ার হাঙ্গামা, রং তামাশা, আনন্দ ফুর্তি, আড্ডা সব শেষ হয়ে যাবে।

আমার বোনেরা!

ঐ সমস্ত মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না যাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লানত করেছেন। ঐ সমস্ত মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না যারা প্রকাশ্যে গুনাহ করে। তাদের মতো হবেন না যাদের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন – আমার উম্মতের সবাইকে মাফ করে দেওয়া হবে, তবে ঐ মহিলারা ব্যতিত যারা পোশাকে পুরুষের বেশ ধারণ করে।

হে আমার বোন!

রাস্তা ঘাটে ঘুরাফেরা করা, পুরুষের সাথে মাখামাখি করা, নাফরমানি করা অনেক হয়েছে। এখন আল্লাহর কাছে তওবা করুন। এখনই সিদ্ধান্ত নিন আমাদেরকে আল্লাহর বান্দী হয়ে থাকতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হয়ে জীবন-যাপন করতে হবে। তাতে যদি দুনিয়াকে ছাড়তে হয় ছাড়ব। পশ্চিমা সভ্যতা আমাদের ঘরের শান্তি কেড়ে নিয়েছে। আমাদের দ্বীন ছিনিয়ে নিয়েছে। এই জাহেলি সমাজের সাথে আমাদের টক্কর দিতে হবে এবং তার মোকাবেলা করতে হবে। যদি পর্দা করার জন্য গোষ্ঠী থেকে আলাদা হয়ে যেতে হয়, তাহলে কিসের পরোয়া? আপনাদের সাথে আপনাদের আল্লাহ আছেন। আপনাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম আছে। কিসের ভয়? কেউ কি রিযিক বন্ধ করে দিবে? আপনাদের উপর কেউ কি ইবলিসি নেযাম চাপিয়ে দিবে? যদি আল্লাহ ও তার রাসূলকে খুশি করতে গিয়ে দুনিয়ার মানুষ নারাজ হয়ে যায় তাহলে যাক। গোত্র যদি বয়কট করে তাহলে করুক। বাহাদুরির খাতায় নাম লেখাতে হবে। বিশ শতকে আপনারাই ইসলামী সভ্যতাকে পুনর্জীবিত করেছিলেন। আল্লাহর

কোরআন আপনাদেরকে আহবান করছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসসমূহ আপনাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

হে আমার বোন!

এই জাহেলি সভ্যতায় লিপ্ত হওয়া যাবে না। এর সাথে বিদ্রোহ করতে হবে। এ জন্য ঘর থেকে বের হতে হবে এবং এর জন্য দাওয়াত দিতে হবে। এই সভ্যতার বাস্তবতা অন্যদের সামনে প্রকাশ করতে হবে। দুনিয়ার সমস্ত শয়তান যদি পর্দার বিরুদ্ধে কথা বলতে থাকে তাহলে বলতে থাকুক। আপনি যদি পর্দার নিয়ত করেন তাহলে এগুলো কিছুই না। মুমিন তো সে, যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট। যার ই'লান কোরআনও করেছে।

এক বুজুর্গের কাছে এক মহিলা এসে বলল, 'আপনি এই যুবকদেরকে বুঝান এখান দিয়ে মেয়েরা যায় তারা যেন মাথা নিচু করে'। বুজুর্গ শাইখ বললেন, 'যদি আপনি রাস্তা দিয়ে হাতে গোশত নিয়ে যান আর কুকুর পিছু নেয় তাহলে আপনি কী করবেন?' সে বলল, 'আমি কুকুর তাড়াব'। শাইখ বললেন, 'যদি তারপরেও না যায় তাহলে?' সে বলল, 'আমি আমার সর্ব শক্তি ব্যয় করব'। শাইখ বললেন, 'এতে তো আপনি অনেক কষ্টে পড়ে যাবেন। তার চেয়ে উত্তম হল আপনি গোশত একটি ব্যাগে করে নিয়ে আসবেন। তাহলে আর কুকুর দেখবেও না। পিছুও নিবে না'।

হে আমার বোন!

নফসের ধোঁকা বলে - পর্দা অন্তরের বিষয়। আমি বলি যদি অন্তরে খাহেশাতের পর্দা পড়ে তাহলে এর চিকিৎসা কী? যদি অন্তরেই কাদা লেগে যায় তাহলে কী হবে? নফস বলে পরপুরুষ দেখার দ্বারা কী হয়? আমাদের তো কিছু হয় না। আমি বলি, যখন ময়লা লাগতে লাগতে কাপড় একদম কালো হয়ে যায় তখন অনেক ময়লা লাগলেও বুঝা যায় না। আর স্বচ্ছ সাদা কাপড়ে সামান্য দাগও দেখা যায়। আমি বলি, একবার কিছুক্ষণ যদি গায়রে মাহরাম ছেলে অতিক্রম করার জায়গায় নজর রাখা হয় তারপর এমন মজা লাগবে যে, নযরের এই গান্দেগি আর ছাড়তে পারবে না। অনেক ছেলে দাবি করে যে, মহিলাদের দেখলে আমাদের কোন সমস্যা হয় না। কিন্তু তাদের কেউ মহিলাদের থেকে নযর হেফাজত করতে পারেনি। নযরের প্রভাব অন্তরে অবশ্যই পড়ে। যারা দাবি করে যে, তাদের দেখার দ্বারা কোন সমস্যা হয় না। তারা কিছু দিন নযর হেফাজত করে দেখুক তারাই বুঝতে পারবে যে নযর কত খারাপ জিনিস। এর দ্বারা মানুষের অন্তর কালো হয়ে যায়।

সুতরাং হে আমার বোন!

আল্লাহর সত্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তা কখনও মিথ্যা হতে পারে না। বদ-নযর শয়তানের তীরের মধ্য হতে একটি তীর। এই তীরও বিষ মিশ্রিত। এক মুহূর্তেই অন্তরকে বিষাক্ত করে দেয়। এরপর অন্তর এই বিষে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এরপর যদি এই বিষ না পায় তখন অন্তর অস্থির হয়ে যায়। সে শুধু এদিক সেদিক তাকিয়ে নিজের শিকারকে তালাশ করে। মহল্লার মধ্যে না পেলে বাজারে যায় মহিলা দেখার জন্য। কখনও পার্কে, কখনও রাস্তায়। ফিরে আসুন ভাই, ফিরে আসুন বোন!

হে আমার বোন!

কোরআন আহবান করছে:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

অর্থ: নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্য্যশীল পুরুষ, ধৈর্য্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালণকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ, , যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারী নারী-তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরষ্কার। [সুরা আহযাব ৩৩:৩৫]

আল্লাহর কুরআন জান্নাতের দিকে ডাকছে। আল্লাহর কুরআনের দিকে ফিরে আসুন। আল্লাহ তা'আলা আলোকিত ঝলমলে জান্নাত বানিয়ে রেখেছেন। যা এমনভাবে চমকাবে যে, দুনিয়ার মধ্যে তার কল্পনাও সম্ভব নয়। সুন্দর সুন্দর পোশাক। মনোহারী বাজুবন্দ। ইয়াকুতের হার। আল্লাহর জান্নাতে সব কিছু আছে। যা মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না। কুরআনের বর্ণনাকৃত দৃশ্য নিজের চোখের সামনে নিয়ে আসুন। ইরশাদ হচ্ছে:

أُوْلَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا

অর্থ: তাদেরই জন্যে আছে বসবাসের জান্নাত। তাদের পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। তাদের তথায় স্বর্ণ-কংকন অলংকৃত করা হবে এবং তারা পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ কাপর পরিধান করবে এমতাবস্থায় যে, তারা সিংহাসনে সমাসীন হবে। চমৎকার প্রতিদান এবং কত উত্তম আশ্রয়। [সুরা কা'হফ ১৮:৩১]

জান্নাতে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম নাজ-নেয়ামত অলঙ্কারাদি, পোষাক-পরিচ্ছেদ, রকমারি খাবার আরো কত কিছু যা দুনিয়াতে কল্পনাও করা যায় না। তোমরা কোনটা পছন্দ করো সবই পাবে, সবর করো ধৈর্য ধারণ করো, সন্তান-সন্তুতি এবং ঘর ওয়ালাদেরকেও এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করো। ইরশাদ হচ্ছে:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

অর্থ: যারা ঈমানদার এবং যাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃত কর্মের জন্য দায়ী। [সুরা তুর ৫২:২১]

জান্নাতে ঘর ওয়ালাদেরকে একসাথে মিলিয়ে দেওয়া হবে, বিভিন্ন রকমের খাবার ও ফল-ফলাদি সেখানে থাকবে। ইরশাদ হচ্ছে:

وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ

অর্থ: আমি তাদেরকে দেব ফল-মূল এবং মাংস যা তারা চাইবে। [সুরা তুর ৫২:২২]

দুনিয়ার ফল এখন তো আর ভালো নেই। জাহেলি সমাজ একে ফরমালিন ও বিভিন্ন প্রকার মেডিসিন দিয়ে বিষাক্ত বানিয়ে দিয়েছে। জান্নাতের ফল যে রকম চাও পাবে। যে স্বাদের জিনিস খেতে মনে চায় পাবে। তাজা সুঘ্রাণযুক্ত দস্তরখান দেখে মন ভরে যাবে। এর থেকে মুখ ফিরবে না এবং খাওয়ার পর ক্লান্তিও আসবে না। এমন পানীয় যা কোনদিনও পান করা হয়নি। মজা আর মজা, স্বাধ আর স্বাধ। ইরশাদ হচ্ছে:

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ﴿١٧﴾ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴿١٨﴾

অর্থ: তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে 'যানজাবীল' মিশ্রিত পানপাত্র। এটা জান্নাতস্থিত 'সালসাবীল' নামক একটি ঝরণা।

[সুরা দা'হর ৭৬:১৭-১৮]

টক মিষ্টি মিশ্রিত পানীয়। যারা এ ধরণের পানীয় পান করেছে তারা এর কথা শুনলেই মুখে পানি চলে আসে। জান্নাতি রমণীদের চেহারার সৌন্দর্যের সামনে হুরদের সৌন্দর্যও ম্লান হয়ে যাবে। হুরগণ জান্নাতি মহিলাদের সৌন্দর্যের উপর ঈর্ষা করবে। বালিশে হেলান দিয়ে বসবে, আড্ডা চলবে, অনুষ্ঠান হবে, আনন্দ ফুর্তি হবে। তারা বলবে আমরা দুনিয়াতে আল্লাহর

আযাব থেকে ভয় পেতাম।

হে আমার উম্মতে মুহাম্মাদী বোনেরা!

নিজের উপর রহম করো, আল্লাহর জান্নাতের দিকে দৌড়িয়ে আসো। একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করো। আখিরাতের এই সমস্ত বিষয়ের জন্য অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করা উচিৎ, একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করা উচিৎ জান্নাত নিয়ে। পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হচ্ছে:

وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। [সুরা মুতাফফিফীন ৮৩:২৬]

জান্নাতের এই নাজ-নেয়ামত ও সুখ-সাচ্ছ্যন্দের জন্য প্রতিযোগিতা করা উচিৎ, দুনিয়ার জন্য নয়। আপনারা তো ইসলামের মুজাহিদাহ বোন। আপনাদের উপর জিম্মাদারি হল নিজেদেরকে ও ঘর ওয়ালাদেরকে এই পঁচা গান্ধা পরিবেশ থেকে বাঁচানো। আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেদের সন্তানদেরকেও এর থেকে বাঁচান। যদি বোনেরা এর থেকে না বাঁচে, দুনিয়ার এই গান্ধা পরিবেশ থেকে বাঁচার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ না করে, তাহলে মনে রেখ কিছুই বাঁচাতে পারবে না। দুনিয়ার এই চাকচিক্য কিন্তু আমাদের সব কিছু নিয়ে যাবে, পরে কিন্তু এই বলে কাঁদবে না যে, সন্তান পিতা-মাতা ছেড়ে চলে গেছে, স্বামী খেয়ানত করে। এরপর কোন বোন যেন ভাইয়ের মোহাব্বত না থাকার অভিযোগ না করে। কোন মা যেন অভিযোগ না করে যে, বৃদ্ধাবস্থায় আমাকে দেখার কেউ নেই। কোন ঘর থাকবে না সবই সরাইখানা হয়ে যাবে,

যেখানে মানুষ নিজের প্রয়োজনে আসে আর প্রয়োজন শেষে চলে যায়।

এসো! ফিরে এসো ঐ জীবন ব্যবস্থার দিকে, যার জন্য সারা দুনিয়ায় মুজাহিদরা নিজেদের জান কুরবানি করছে। ইসলামী নেযাম কায়েম করা, খেলাফতের জন্য কিতাল করা আল্লাহ এই উম্মতের জন্য ফরজ করেছেন। আমরা এমন এক সমাজ গড়তে চাই যেখানে ঘর জান্নাত হয়। যেখানে মা-বাবা ঘরের বাদশাহ হয়, বউ ঘরের ইজ্জত হয় ও ভাই-বোন ঘরের গর্ব হয়। জাহেলি সমাজ ও ইসলামী সমাজের মাঝে মৌলিক পার্থক্য এটাই যে, জাহেলি সমাজ লাভের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। যে জিনিস দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে তা কাজের বলে গণ্য করা হবে। আর যা কাজের অনুপযুক্ত তা ব্যবহারের অযোগ্য প্রমাণিত হবে। যেমন - মা যদি বৃদ্ধ হয়ে যায় তাহলে তাকে বেকার মনে করা হয়।

আর ইসলামী খেলাফতের সমাজ তো ইখলাছ, ভালোবাসা, মোহাব্বত ও বিশ্বস্ততার উপর ভিত্তি করে চলে। যে সমাজে মুখ অন্তরের কথা বলে, যা অন্তরে থাকে তাই মুখে বলে। মা-বাবা সন্তানের ব্যাপারে সত্যনিষ্ঠ, স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের প্রতি বিশ্বস্ত। খুশি ও দুঃখের সময় দুইজন সর্বদা একে অপরের সহযোগী হয়। যদি শুকনা রুটি খেয়ে থাকতে হয় তাহলেও একে অপরের সঙ্গী হয়। ইউরোপের মত নয় যে, যখনই মন চায় তখনই এই সম্পর্ক ভেঙে দেয় বরং এক মজবুত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার উপর তারা প্রতিষ্ঠিত থাকে। আমাদের দাওয়াত হল পবিত্র সমাজ গড়ার দাওয়াত, ছেলে-মেয়েকে পিতা-মাতার আনুগত্য করার দাওয়াত এবং খারাপ সম্পর্ককে ভালো সম্পর্কে রূপান্তরিত করার দাওয়াত।

এমন এক সমাজ বানানোর দাওয়াত যাদের উপর ফেরেশতারা সকাল সন্ধ্যা সালাম পাঠায়। যেখানের মানুষ চব্বিশ ঘন্টা ইবাদতকারী হয়ে যায়। ঘরে থাক বা মসজিদে, আদালতে থাক বা দোকানে সবাই কুরআন সুন্নাহর আইনের আওতাভুক্ত থাকবে। প্রত্যেক মহিলার বুঝা উচিৎ যে, আল্লাহ তাকে এক বিশেষ উদ্দেশ্য দিয়ে পাঠিয়েছেন। এই খারাবি ও ভালোর কেন্দ্রবিন্দু দুনিয়ায় আল্লাহ মহিলাদেরকে ভালোর কারখানা বানিয়ে পাঠিয়েছেন। তার দায়িত্ব হল, সে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে এমন জানবাজ মুজাহিদ তৈরি করবে যারা ইসলামকে রক্ষা করবে, যারা আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী জীবন-যাপন করবে এবং যারা ইসলামের বিজয়ের জন্য রক্ত সাগর পাড়ি দিবে এবং আল্লাহর ভয়ে অশ্রু ঝড়াবে। আমাদের ভুল তখনি হয় যখন আমরা মহিলাদের থেকে আল্লাহর বিধানকে গোপন করি, যার ফলে আমরা আমাদের ঘরের মধ্যেও জাহেলি পরিবার ব্যবস্থা নিয়ে আসি। আমাদের চাহিদা, কাপড়-চোপড়, থাকা খাওয়া সব কিছুই সেভাবে করি যেভাবে জাহেলি সমাজ করে।

হে আমার মা ও বোনেরা!

এক আল্লাহর হয়ে যান। উম্মাহাতুল মুমিনীনদেরকে নিজেদের আদর্শ বানান, তাদের আদর্শ পূর্ণাঙ্গ একটি আদর্শ। যে বিষয়টি মনের সাথে মিল হয় তার ক্ষেত্রে শরীয়তের দলিল পেশ করা, আর যে বিষয়টি মনের সাথে মিল হয় না তার ক্ষেত্রে টালবাহানা শুরু করা – এমনটা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না। মনে রাখবেন, আল্লাহ আমাদের অন্তরের খবর জানেন। এটা আল্লাহর সাথে কেমন ভালোবাসা ও মোহাব্বত যে, তার জন্য না বরং

মানুষকে দেখানোর জন্য দ্বীনের কিছু বিষয়ের উপর আমল করবে? যখন মনের এই অবস্থা যে, অন্তরে আল্লাহর চেয়ে দুনিয়ার মোহাব্বত বেশি, ভালো কাপড়-চোপড়, ভালো খাট, ফার্নিচার ও আলমারির মোহাব্বত বেশি – এটা কেমন কথা?

যখন বার্মায় আপনাদের বোনদের কাফনও মেলে না। শামের মধ্যে আপনাদের বোনদের এক টুকরো রুটিও মেলে না। এটা কেমন মোহাব্বত, আল্লাহ ও রাসূলের উপর কেমন ঈমান? অথচ আমাদের দাবী তো হল, আমরা আমাদের জীবন থেকেও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বেশি মোহাব্বত করি। নিজের আত্মীয় স্বজন থেকে নিজের পিতা-মাতা থেকেও বেশি। এটা কেমন মোহাব্বত? এই মোহাব্বত সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে।

শেষ একটি প্রশ্ন। আমাদের সকলের দাবী হল আমরা আল্লাহ এবং আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখি। অর্থাৎ জান্নাত, জাহান্নাম, আখিরাত, শাস্তি ও পুরষ্কার সব কিছু সত্য। প্রশ্নটি হল এই, মানুষের যেই জিনিসের উপর বিশ্বাস থাকে তা পাওয়ার জন্য সে সব ধরণের চেষ্টা-তদবির করে। যেমন পিতা-মাতা সন্তানদের কাছে অনেক আশা করে। তাই ছোটবেলা থেকেই তাকে ভালো স্কুলে ভর্তি করে। নিজের সাধ্যের চেয়ে বেশি খরচ বহন করে। নিজে কষ্ট করে বাচ্চার খরচ যোগায়। তারপর খুব ঠাণ্ডা বা গরম থাকুক মা বলে না, বাবা আজ অনেক গরম তাই আজ স্কুলে যেও না। বরং মা নিজেই বাচ্চাকে প্রস্তুত করিয়ে দেয়। সামনে যদি সরকার আইন জারি করে যে, এখন থেকে স্কুল রাত দুইটায় শুরু হবে। তাহলে আমার মনে হয় না কোন

মা ছেলেকে স্কুলে যেতে বাঁধা দেবে।

এতো কষ্ট কেন করে? কারণ মায়ের ইয়াকিন আছে যে, এত কষ্ট করার পরে একদিন আমার ছেলে দুনিয়া কামাই করে নিয়ে আসবে। যাদের আগ থেকেই টাকা পয়সা আছে তারা চিন্তা করে আমার ছেলে আমার নাম উজ্জ্বল করবে। এটা তো এমন আশা যা বিশ বাইশ বছর পর পাওয়া যাবে। তাও এটা কোন নিশ্চিত বিষয় নয়। কারণ সব ছেলেরা লেখাপড়া করে না। তারপর যদিও বা করে চাকরি পাওয়া নিশ্চিত থাকে না। আবার যদি চাকরি পেয়ে টাকা পয়সা কামাই করে, তাহলেও তো কয়জন আছে যারা বড় হওয়ার পর মা-বাবাকে ভালোবাসে?

এমনিভাবে একজন কৃষকের দিকে লক্ষ্য করুন। সে ফসলের জন্য কি পরিমাণ চেষ্টা করে। প্রশ্ন হল সে তুলনায় আমাদের আখিরাতের প্রতি কী পরিমাণ বিশ্বাস আছে। কয়জন মা আছে যারা নিজের আখিরাতের জন্য নিজের সন্তানকে আখিরাতের রাস্তায় দিয়ে দিয়েছে।

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যে শহীদ হবে সে তার পিতা-মাতাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে' তাদেরকে এমন সম্মান করা হবে যে, মানুষ মনে করবে কোন নবীর পরিবার জান্নাতে যাচ্ছে। এছাড়া শহীদ হওয়ার ফজিলত দ্বারা কুরআন হাদিস ভরপুর। কিন্তু তারপরও কেন আমরা সন্তানদেরকে, ভাইদেরকে আল্লাহর রাস্তায় পাঠাই না। অথচ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদাতের এত ফজিলত বর্ণনা করে গেছেন যে, তার প্রতি ইয়াকিনই হয় না। দুনিয়ার প্রতি ইয়াকিন জমে গেছে, দুনিয়া কামানোর জন্য দুনিয়ার

পিছনে ছুটতে ছুটতে যৌবনকে শেষ করে দেয়। ইরশাদ হচ্ছে:

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ • أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ

প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে, এমনকি তোমরা কবরস্থানে পৌছে যাও। [সুরা তাকাসুর ১০২:১-২]

পা কবরে যাওয়ার পরেও দুনিয়া কামানো শেষ হয় না। দুনিয়াবি লম্বা-চওড়া আশা-আকাঙ্খার তালিকা পূরণে সদা ব্যস্ত। কিন্তু আখিরাতের জন্য কোন তত্ত্ব-তালাশ, আশা-আকাঙ্খা, চেষ্টা-তদবীর কিছুই নেই। হালাল হারামের পরোয়া না করে দুনিয়ার পিছনে ছুটা এবং কিছু ব্যক্তিগত ইবাদত করেই জান্নাতের আশা করা, দ্বীনের অধিকাংশ বিধান ছেড়ে দিয়ে জান্নাতের আশা করা এটা কত বড় জালিয়তি। হে বোন! এটা কেমন ঈমান?!! আখিরাতের উপর ঈমান নিয়ে আসুন। দুনিয়ার ইয়াকিনের মত আখিরাতের ইয়াকিন পয়দা করুন। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দীদের জন্য জান্নাতে সব ঐ জিনিস রেখেছেন যা সে আশা করে।

এই দ্বীনের দিকে ফিরে আসুন। এই দ্বীনকে নিজের প্রথম পছন্দ ও টার্গেট বানান। এই অন্তরে আল্লাহ ও তার রাসূলের মোহাব্বত পয়দা করুন। সব কিছুতে মজা অনুভব করবেন ইনশা আল্লাহ। জান্নাতের দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখুন দুনিয়ার সব রং তামাশা মিথ্যা ও ধোঁকা মনে হবে। নিজেকে বাঁচান, নিজের আসল ঘরকে রক্ষা করুন। এই দুনিয়া এমনিতেই চলে যাবে। এই

দুনিয়ার রং তামাশা সব শেষ হয়ে যাবে। আসল ঘর তো আখিরাত। নিজের দ্বীনের ফিকির করুন।

আমেরিকান মহিলাদেরকে দেখো। তারা তোমাদের দ্বীন ধ্বংস করার জন্য আমেরিকা থেকে আফগানিস্তানে যুদ্ধ করতে এসেছে। তারা তোমাদের দ্বীন ধ্বংস করার জন্য, ইসলামী জিন্দেগী খতম করার জন্য সমস্ত কিছু কুরবানি করছে। তারা এর জন্য সব ধরণের কষ্ট সহ্য করছে, সব ধরণের ত্যাগ স্বীকার করে যাচ্ছে। কিন্তু একজন মুসলিম মহিলা যে আল্লাহ এবং তাঁর সত্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছে। তার কি হল যে, তার কোন পরোয়াই নেই যে- আফগানিস্তানে আজ কি হচ্ছে, শামের মধ্যে কি হচ্ছে, পাকিস্তানে কি হচ্ছে, মুজাহিদরা কেন তাদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে জিহাদ করছেন। কেন তারা দুনিয়ার আরাম-আয়েশকে বিসর্জন দিয়েছে। কেন তারা স্ত্রী সন্তান ত্যাগ করে ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ছে। সারা দুনিয়ায় কিসের যুদ্ধ চলছে। একজন মুসলিম নারী হিসেবে তো একটু ফিকির করার দরকার ছিল।

একদিকে কুফরি শক্তি অপর দিকে ঈমানি শক্তি। একদল বলে আমরা দুনিয়ায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা করব। অপরদল বলে আমরা তোমাদের আল্লাহ ও তার রাসূলের বিধান প্রতিষ্ঠা করতে দেব না। এটা তো শুধু মুজাহিদের লড়াই নয়, বরং এটা তোমাদেরও লড়াই। কারণ মুজাহিদরা যে কালেমা পড়েছে তোমরাও সেই কালেমা পড়েছো। আফগানবাসীর যে ঈমান তোমাদেরও তো সেই একই ঈমান। শাম, ইরাক, সোমালিয়া, ইয়েমেনবাসীর যে ঈমান তোমাদেরও তো সেই একই ঈমান। এরপরও তোমরা কীভাবে

নিজেকে এই যুদ্ধ থেকে বিরত রাখতে পারো? কীভাবে নিজেকে এই কল্যাণ-অকল্যাণের যুদ্ধ থেকে দূরে রাখতে পারো? তোমাদের ময়দানে আসতে হবে এবং নিজেদের জিম্মাদারি বুঝতে হবে।

হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনয়ন কারিনী বোনেরা!

তোমাদের উপর দ্বীনের খুব কঠিন জিম্মাদারি এসে পড়েছে। এই জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং আল্লাহর রাস্তায় নিজের জান-মাল কুরবানি করে দাও। আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করে জান্নাতের নেয়ামতরাজি দান করুন। বিশেষ করে বর্তমান এই দুঃসময়ে যখন ইসলাম ও কুফুরের লড়াই সারা দুনিয়ায় চলছে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে ইসলামের পতাকা সুদৃঢ়ভাবে আকড়ে থাকার তাওফিক দান করুন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই দ্বীনের উপর অবিচল রাখুন যার জন্য আমরা কুফুরের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

জিহাদের পথের নারীদের প্রতি ধর্মীয় দিকনির্দেশনা

মাওলানা আসেম উমর হাফিজাহুল্লাহ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبى بعده- اما بعد:

فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

قال رسول الله صل الله عليه و سلم : ان الله يحب كل قلب حزين

و قال رسول الله صل الله عليه و سلم : لن يبرح هذا الدين قائمًا حتى تقوم الساعة يقاتل عليه عصابة من المسلمين -او كما قال عليه الصلوة و السلام-.

অবতারণাঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালার লক্ষ কোটি অনুগ্রহ এবং একমাত্র তারই অনুকম্পা যে, এ ফেতনার যুগে আমাদেরকে দুনিয়াবী সকল প্রকারের ফেতনা থেকে নিরাপদ রেখে আখেরাতের দিকে ধাবিত করেছেন। দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে বের করে আখেরাতের প্রশস্থতার দিকে অগ্রসর হবার আগ্রহ তৈরি করে দিয়েছেন। দুনিয়ার ঝামেলা থেকে মুক্ত থেকে আখেরাত অর্জনের দিকে উৎসাহী বানিয়েছেন। এসবই আল্লাহর মেহেরবানী ছাড়া ভিন্ন কিছু নয়। তাই প্রত্যেকের জন্য উচিৎ হলো আল্লাহ্ তা'য়ালার কৃতজ্ঞতা আদায়ে সচেষ্ট থাকা। কেননা, আমরা এসকল অনুগ্রহ পাবার যোগ্য ছিলাম না।

আমরা আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্য, আল্লাহ্ তা'য়ালার ভালোবাসার জন্য, আল্লাহ্ তা'য়ালার দ্বীনের জন্য - আমাদের ভালোবাসাকে, নিজের আত্মীয়-স্বজনকে, প্রিয় ব্যক্তিদেরকে ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্ তা'য়ালার দ্বীনের দিকে এসেছি। বাস্তবে

এটা অনেক বড় ও কঠিন একটা পদক্ষেপ। এর জন্য না আমাদের কোন যোগ্যতা ছিলো, আর না আমাদের কোন হিম্মত বা সাহস ছিলো - যার দ্বারা এ কঠিন বিষয়ে আমরা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম! বরং আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের জন্য বিষয়টিকে সহজ করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ তা'য়ালাই দুনিয়ার এ ফেতনা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করে আখেরাতের দিকে দৌড়ানোর তাওফিক দিয়েছেন।

এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যে, বর্তমান সময়ে দুনিয়া তার সকল প্রকারের সৌন্দর্য প্রকাশ করার মাধ্যমে মানুষদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করছে। মানুষদেরকে তার ফাঁদে ফেলতে সব কৌশল অবলম্বন করছে। কিন্তু মোবারকবাদ তাদের জন্য যারা দুনিয়ার সকল জিনিসের ধোঁকা থেকে নিজেকে এবং অন্যকে বাঁচানোর চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'য়ালার আখেরাতকে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে আখেরাতের মোকাবেলায় কুরবানী করে দিয়েছে। তারা দুনিয়ার স্বাদকে বিসর্জন দিয়ে আখেরাতের স্বাদ গ্রহণ করার মানসে এই বিসর্জন দেয়। আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত এ ধরনের পবিত্র আত্মার (জীবনের) মাধ্যমেই এ দ্বীনকে হেফাজতের ব্যবস্থা করেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন এ দাওয়াত নিয়ে আসেন এবং লোকদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে শুরু করেন, তখন সে দাওয়াতকে গ্রহণ করতে যেভাবে সম্মানিত পুরুষেরা লাব্বাইক বলে ছুটে এসেছিল। সেসময় সম্মানিতা মহিলাগণ একটুও পিছনে ছিলেন না। আল্লাহ্ তা'য়ালা এ দ্বীনের ঝান্ডাকে উঁচু করার জন্য যেখানেই পুরুষের খুনকে গ্রহণ করেছেন,

কুরবানীকে কবুল করেছেন বা হিজরতের তাওফীক দান করেছেন, সেখানে মহিলাদেরকেও হিজরত থেকে জিহাদের ময়দান পর্যন্ত ছুটে বেড়ানোর সুযোগ দান করেছেন।

মানব সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন যে উদ্দেশ্যে মানুষকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন যার বর্ণনা কুরআনে কারীমে এভাবে এসেছে-

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে। [সুরা তাওবা ৯:৩৩]

এবং অন্যত্র ব্যাপকভাবে ঘোষণা দিয়েছেন এভাবে-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি। [সুরা যারিয়া'ত ৫১:৫৬]

অর্থাৎ মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল - তার আল্লাহ্ তা'য়ালার জমিনের উপর সকল ভ্রান্ত ধর্মকে নির্মূল করে দিয়ে আল্লাহর বিধানকে সবার উপরে তুলে ধরবে। আল্লাহর দেওয়া বিধানকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করবে, তার অবধারিত ফয়সালাকে কায়েম করবে - যাতে করে মানুষের চব্বিশ ঘন্টার জিন্দেগী আল্লাহ্ তা'য়ালার বিধানমতো হয়ে যায়। এ উদ্দেশ্যকে অর্জন করতে যেখানে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন পুরুষের উপর জিম্মাদারী ও দায়িত্ব অর্পন করেছেন,

সেখানেই মহিলাদের উপরেও জিম্মাদারীর গুরুত্বারোপ করেছেন।

দায়িত্ব পালনে নারী-পুরুষের কুরবানীঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালা যে জিম্মাদারী অর্থাৎ জিন্দেগীর সকল ক্ষেত্রে ইসলামী বিধি-বিধান, কুরআনী অনুশাসন বা সুন্নতী ত্বরিকা মোতাবেক বানানোর দায়িত্বকে যেভাবে পুরুষের উপর ন্যস্ত করেছেন, তেমনিভাবে মহিলাদের উপরেও উক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। কেননা এসব ক্ষেত্রে পুরুষেরা যেমনিভাবে ভূমিকা পালন করে থাকেন, তেমনিভাবে মহিলাগণও বড় ভূমিকা পালন করে থাকেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন-

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

অর্থাৎ তোমাদের সকলেই দায়িত্বশীল এবং কিয়ামতের দিন প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। [বুখারী ও মুসলিম]।

যেখানেই অনেক জিম্মাদারী আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন পুরুষের উপরে ন্যস্ত করেছেন, সেখানেই মহিলাদের উপরেও অনেক জিম্মাদারী অর্পণ করেছেন। সাহাবীদের সাথে সাথে সাহাবিয়া (রা.) প্রমূখেরাও দ্বীনের জন্য অনেক কুরবানী আর ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এক্ষেত্রে মহিলাগণ পুরুষদের থেকে একটুও পিছিয়ে ছিলেন না। ইতিহাসের দিকে তাকালে এমন অনেক ঘটনা নজরে পড়বে যে, যখনই জান্নাতের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য, আখেরাতে অগ্রসর হওয়ার জন্য পুরুষেরা দৌড়ে দৌড়ে সামনে অগ্রসর হয়েছেন, সেখানে মহিলাগণকেও আল্লাহ্ তা'য়ালা এমন হিম্মত এবং সাহস যুগিয়েছেন যাতে করে তারাও পুরুষদের থেকে পিছনে পড়েন নি। এটা আল্লাহ্ রাব্বুল

আলামিনের বড় মেহেরবানী এবং অনুগ্রহ ছিলো। আল্লাহ্ যাকে দ্বীনের জন্য কবুল করে নেন, সেটা তার জন্য বড়ই সৌভাগ্যের কথা।

সাহাবী ও সাহাবীয়া (রা.) দের কুরবানীঃ

আমার সম্মানিত মা ও বোনেরা!

মহিলা সাহাবীগণ এ দ্বীনের জন্য অগণিত কুরবানী করেছেন। তাদের স্বামীকে কুরবানী করেছেন, কুরবানী করেছেন তাদের কলিজার টুকরা সন্তানদেরকে। নিজ ভাইদেরকে নিজ হাতে সাজিয়ে গুছিয়ে জিহাদের ময়দানে পাঠিয়েছেন। এতটা কুরবানী করা সত্ত্বেও কোন একজন সাহাবিয়া কখনো তাদের এই কুরবানীর জন্য আত্মতৃপ্তিতে ভুগতেন না। অথচ তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত জান্নাতের ফয়সালা ও স্বীয় সন্তুষ্টির বানী শুনিয়ে দিয়েছিলেন। একারণে তারা কি আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছিলেন? না-কি তারা আত্মভোলা হয়ে ছিলেন? না-কি দুনিয়ার কোন ফেতনা থেকে উদাসীন ছিলেন?

এমনটি কখনো হয়নি। বরং তারা নিজেদের দ্বীন ও ঈমানকে হেফাজতের জন্য স্বীয় মাতৃভূমি পবিত্র মক্কাকে ছেড়েছেন, স্বীয় আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছেন। কখনো বা মেয়ে তার বাবা থেকে আলাদা হয়েছে, মায়েরা তার প্রিয় সন্তানকে পৃথক করেছেন। এভাবে দ্বীনের জন্য সব ধরনের কুরবানী করেছেন আকুণ্ঠভাবে। কিন্তু কখনো তারা একটি মুহুর্তের জন্যও দ্বীন থেকে গাফেল হয়ে দুনিয়াবী কোন ফেতনায় জড়িয়ে যাননি। কখনো তারা স্বীয় নফসের ধোঁকা থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করতেন না।

কখনো এমনটি হয়নি যে, স্বীয় আত্মার উপর নিশ্চিতভাবে বসে ছিলেন এ কথা ভেবে যে, আমরাতো হিজরতের মতো অনেক বড় এক কুরবানী করেছি, অথবা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ্ এর মতো আমলের আঞ্জাম দিয়েছি এবং জিহাদের ময়দানে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছি! তাই এখন আমরা একটু ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে উপার্জন করে নেই বা বসবাসের জন্য একটি ঘর বানিয়ে নেই, অথবা ঘরের সাজ-সরঞ্জামের যোগাড় করে নেই। ইতিহাসে এমন কোন স্বাক্ষ্য পাওয়া যাবে না।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাঃ এর অবস্থাঃ

এমনকি উম্মুল মু'মিনীন, রাসুলুল্লাহর পবিত্রতমা স্ত্রী (রা.) দের জীবন-যাপন পদ্ধতি ও আদর্শের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তেকালের পর তাদের আমলে কোন পরিবর্তন আসেনি। অন্যান্য সাহাবা ও সাহাবীদের আমলের মধ্যেও কোন পরিবর্তন আসে নি। যদিও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র জবানে অনেকেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তেকালের পরে হযরতে আয়েশা রা. প্রায় ৩২ বছর জীবিত ছিলেন। কিভাবে তিনি জীবন অতিবাহিত করেছিলেন?

আম্মাজান আয়েশা ঘরের মধ্যে কোন প্রকারের সম্পদ জমা করে রাখেননি। এ দুনিয়ার ভালোবাসা ও মহব্বতকে অন্তরে স্থান দেননি। একটি মূহুর্তের জন্যও এ কথা চিন্তা করেননি যে, জীবনে তো অনেক ত্যাগ স্বীকার বা কুরবানী দিয়েছি, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সর্বদা

সবখানে ছিলাম, এ দ্বীনের জন্য সর্বপ্রকারের কুরবানী করেছি, অনেক গাযওয়াহ বা যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেছি, এমনকি হিজরতের সময়ও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে শরীক ছিলাম। তাই এখন একটু আরাম করে নেই। এমন চিন্তা কখনো অন্তরে স্থান দেন নি। অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ দুনিয়া থেকে এমন অবস্থায় গিয়েছেন, যখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আম্মাজান আয়শার প্রতি রাজী বা খুশি ছিলেন। তথাপি দুনিয়ার একটু স্বাদ আস্বাদন করে নেওয়া বা গ্রহণের কথা তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করেননি।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাঃ এর তালি/পট্টি যুক্ত কাপড় পরিধান করাঃ

একবার এক তাবেয়ী (যিনি হযরত আয়েশা রা. এর দুধ ভাই ছিলেন) আয়েশা রা. এর ঘরে আসেন। তখন তিনি নিজের কাপড়ে তালি বা পট্টি লাগাতে ব্যস্ত ছিলেন। এ অবস্থা দেখে তিনি আয়েশা রা. কে জিজ্ঞেস করেলেন যে, উম্মুল মু'মিনীন! আপনার প্রতি আল্লাহ্ তা'য়ালা অনেক প্রশস্থতা দান করেছেন, তাই আপনি তো নতুন কাপড় পরিধান করতে পারেন? তখন আয়েশা রা. জবাব দিলেন, যে ব্যক্তি পুরাতন কাপড় পরিধান করেনা, তার জন্য নতুন কাপড় পরিধান করার কোন অধিকার নেই।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাঃ এর বদান্যতাঃ

একবার উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রা. এর নিকট আশি হাজার দিরহাম হাদিয়া আসলে তিনি তার খাদেমাকে ঐ দিরহাম বন্টনের নির্দেশ দিলেন। খাদেমা সন্ধ্যা পর্যন্ত বন্টন করতে করতে সম্পূর্ণ দিরহাম শেষ করে

দিলেন। এমনকি একটি দিরহামও অবশিষ্ট রাখলেন না। সেইদিন আয়েশা রা. রোযা রেখেছিলেন তাই ইফতারের সময় খাদেমাকে বললেন যে, ইফতারের জন্য ঘরে কিছু আছে?

তখন খাদেমা বলতে লাগলেন আপনি তো ইফতারের জন্য দু'টি দিরহাম রেখে দিতে পারতেন! যার দ্বারা গোস্ত/রুটি ইত্যাদি ক্রয় করতে পারতাম। এ কথা শুনে আয়েশা রা. বলতে লাগলেন যা হওয়ার তা-তো হয়েই গেছে। এখন ঘরে যা আছে তা নিয়ে এসো। অথচ, চাইলেই তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তেকালের পরে ভালো খাবার খেয়ে নিতে পারতেন, ভালো ভালো দামী পোষাক পরিধান করতে পারতেন, কিন্তু তিনি এমনটি করেননি।

হযরত আবু দারদা রা. এর ঘটনা-

হযরত আবু দারদা রা. এর দুনিয়া ত্যাগের ব্যাপারে অনেক প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে। তিনি অনেক গরীবি অবস্থায় জীবন-যাপন করতেন। একবার কোথাও থেকে কিছু টাকা পয়সা হাদিয়া আসে। তখন উম্মে দারদা রা. বললেন যে, আমার অমুক জিনিসটির অনেক প্রয়োজন তাই সেটির ব্যবস্থা করে দিন। আবু দারদা রা. বললেন যে, এ টাকা পয়সাকে আমি জমা করে রাখবো। উম্মে দারদা রা. বললেন যে, আমাদের কাছে সঞ্চয় করার কোন জায়গা বা ব্যাংক আছে? আবু দারদা রা. বললেন, হ্যা! আমাদের কাছে আখেরাতের ব্যাংক আছে সেখানে আমি এটাকে জমা করে দিচ্ছি। একটা প্রয়োজন ছিলো এবং অত্যন্ত গরিবী অবস্থায় জীবন-যাপন করছিলেন তারপরেও এ কথা শুনে উম্মে দারদা রা. বললেন যে, ঠিক আছে!

আখেরাতের ব্যাংকে জমা করে দিন।

সাহাবী ও সাহাবিয়্যাদের দুনিয়ার ব্যাপারে সতর্কতা

এই ছিলো সাহাবী ও সাহাবিয়াদের আমল, যদিও তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়ে সূরা তাওবার ১০০ নং আয়াতে বলেছেন

رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ।

আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। [সুরা বাইয়্যেনাহ ৯৮:৮]

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়া থেকে চলে গেলে ওহীর দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তারপরেও

رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

উক্ত আয়াতে কারিমা শুনে তারা কখনো নফস থেকে বেখবর বা গাফেল হননি। কখনো এ ধারণা করেননি যে, আমরাতো দ্বীনের জন্য অনেক কুরবানী করেছি, এখন দুনিয়া আমাদের উপর কোন প্রকারের প্রভাব বিস্তার করতে পারবেনা, আমাদের নফস এখন বাঁকা পথে চলতে পারবেনা! তারা জানতেন যে, নফস এমন এক বস্তু - যে ব্যক্তি এর থেকে ক্ষণিকের জন্যও বেখবর বা গাফেল হয়ে যায় সে তাকে ধোঁকা দিয়ে ছাড়ে এবং তার উপর বিজয়ী হয়ে ওঠে।

এ জন্য আমার মা ও বোনেরা!

এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের অনেক বড় অনুগ্রহ ও অশেষ দয়া হলো - বর্তমানের ফেতনার যুগে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত যাকে ইচ্ছা তাকে দ্বীনের জন্য সবকিছু বিসর্জন দেওয়ার তাওফিক দান করেন। যারফলে নিজের ঘর-বাড়ি ছেড়ে দেয়, নিজের অবস্থানকে ছেড়ে দেয়। আপন পিতা-মাতা ও ভাই-বোনকে ছেড়ে দিয়ে দ্বীনের উপর পাহাড়ের মতো অবস্থান করাটা অনেক বড় কুরবানী, অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। এর বিনিময়ে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন তার জন্য অগনিত নিয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছেন।

আর যদি ঐ সকল নিয়ামতের জ্ঞান আমাদের অর্জিত হয়ে যায় এবং সেগুলো দেখে নেই, তাহলে আমরা সেগুলো হাসিল করার জন্য পাগল হয়ে যাবো। এবং আকাঙ্ক্ষা করতে থাকবো যে, হায়! যদি পুরা দুনিয়া শতবার আমার হতো আর প্রত্যেকবারই সবকিছু কুরবানী করে দিয়ে এ সকল নিয়ামত পেয়ে যেতাম! এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা এই পথে প্রতিটি কদমের বিনিময়ে, এক একটা কষ্টের বদলায়, প্রতিটি চিন্তা-ফিকিরের বিনিময়ে, এমনকি ঐ দুঃখ ও পেরেশানী যা দ্বীনের জন্য আমাদের চেহারায় ফুটে ওঠে, আপনার কপালে চিন্তার রেখা ভেসে ওঠে - এ সবকিছুর বিনিময়ে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত কিয়ামতের দিন এমন এমন নিয়ামত দান করবেন যা দেখে অন্তর খুশিতে আত্মহারা হয়ে যাবে।

নফস ও শয়তান: আমাদের দুই শত্রু:

কিন্তু এতকিছুর পরেও আমাদের নফস ও শয়তান আমাদের জান্নাতের পথে বাকা হয়ে বসে পথ আটকে আছে। এ দুনিয়া তাদের থেকে পালাতে থাকে -

যে তাকে পেতে চায়। আর দুনিয়া নিজের দিকে তাকেই টেনে নেয়, যারা দুনিয়া থেকে পালিয়ে বেড়ায় বা দুনিয়াকে লাথি মারে। তাইতো সম্ভাবনা আছে যে, যদি একটা মূহুর্তের জন্য আমরা অসর্তক থাকি তাহলে দুনিয়া আমাদের কাছে চলে আসবে এবং এ দুনিয়া তার চক্রান্তের ফাঁদে আমাদেরকে গ্রেপ্তার করে নিবে। এ জন্য সর্বদা আমাদেরকে নফস সম্পর্কে সতর্ক থাকা, সদা জাগ্রত থাকা, দুনিয়ার ফেতনা থেকে বেঁচে থাকা খুবই জরুরী।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দুনিয়া ত্যাগঃ

সাহাবী ও সাহাবীয়া (রা.) এর জিন্দেগী আমাদের সামনে রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - যার ব্যাপারে কুরআন কারীম ঘোষণা করেছে যে, 'আপনার অগ্র ও পশ্চাতের গোনাহ্ মাফ করে দেওয়া হয়েছে', তারপরেও তিনি কিভাবে জীবন যাপন করেছেন? এ দুনিয়ার ব্যাপারে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চিন্তা-ভাবনা কেমন ছিল?

সাহাবী ও সাহাবীয়াগণ (রা.) একথা মনে করেননি যে, এ দুনিয়া আমাদের উপরে তার প্রভাব বিস্তার করবেনা! আমরা হিজরত করেছি, আমাদের ঘর-বাড়ি ছেড়েছি, ভালো ভালো খাবার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছি! সুতরাং দুনিয়া কিভাবে আমাদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে?

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো নিষ্পাপ ছিলেন, তাকে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছিলো, কিন্তু কেমন অবস্থায় দিন কাটিয়েছেন? হাদিসে এসেছে-

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة

(خاتم النبيّين صلى الله عليه وسلم282 ص:1ج:)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা (দ্বীন ও উম্মতের জন্য) পেরেশান ও চিন্তিত থাকতেন, তাঁর কোন বিশ্রাম ছিলনা। (খাতামুন নাবিয়্যিন:খণ্ড-১ পৃঃ২৮২)

অর্থাৎ সর্বদা তিনি পেরেশানীর মধ্যে নিমজ্জিত থাকতেন, চিন্তার মধ্যে ডুবে থাকতেন, চেহারার মধ্যে চিন্তার রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠতো। এমন কোন মূহুর্ত অতিবাহিত হয়নি যখন নিশ্চিত মনে সময় পার করতেন। সর্বদা চিন্তা করতেন, কপালে পেরেশানীর চিহ্ন লেগেই থাকতো। সর্বদা দারিদ্রতার মধ্যে কাটাতেন, কখনো শান্তভাবে থাকতেন না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রুমাল কেমন ছিলো? তার বিছানা কেমন ছিলো? তাঁর কাপড় কেমন ছিলো? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরিধেয় বস্ত্র কেমন ছিলো?

এমন সময়ও অতিবাহিত হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকটে পরিধান করার মতো কিছুই ছিলো না। সায়্যিদুনা হযরত বিলাল (রা.) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হুজরার বাইরে দাড়িয়ে আছেন, এবং অপেক্ষা করছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাতের জন্য বাহিরে আসবেন। তখন সালাতে আসার জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকটে একটি জামাও ছিলো না। অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর দুনিয়ার কি প্রভাব পড়তে পারতো?

একবার সায়্যিদুনা উমার (রা.) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে তাশরীফ আনলেন এবং তাঁর বিছানা ও শরীর মোবারকে বিছানার দাগ দেখে কাঁদতে লাগলেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন। 'হে উমার! কেন কাঁদছো'? হযরত উমার রা. বলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! এটা কেমন যে, কিসরা (পারস্য/ইরান) ও কায়সার (রোম বা ইটালি) এর সম্রাটগণ আল্লাহর দুশমন হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য আরামের সকল ব্যবস্থা বিদ্যমান। অথচ আপনি আল্লাহ্ তা'য়ালার বন্ধু, আল্লাহর দোস্ত, আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের অনুগত বান্দা'! নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "উমার! তুমি কি চাও যে, আমরা দুনিয়াতেই আখেরাতের প্রতিদান গ্রহণ করি"?

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সাহাবায়ে কেরামগণ এমন শিক্ষাই গ্রহণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কিরামগণকে দুনিয়ার হাক্বিকত ও বাস্তবতা এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। এবং পবিত্র স্ত্রীদেরও এমন শিক্ষা দিয়েছেন। সকল সাহাবাদেরকে শিখিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে কিভাবে/কি অবস্থায় জীবন কাটাতে হবে।

সায়্যিদুনা হযরত আবু বকর (রা.) দুনিয়ার ব্যাপারে কেমন ভীত ছিলেনঃ

সায়্যিদুনা হযরত আবু বকর (রা.) এর ঘটনা আপনারা শুনে থাকবেন। একবার তিনি পান করার জন্য পানি চাইলেন, তখন কেউ মধু মিশ্রিত পানি দিলেন। যখন মধু হাতে নিলেন তখন এটতাই ক্রন্দন করছিলেন যে, তার কান্না শুনে বাসার সকলেই কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর কান্না বন্ধ

করলেন এবং পুনরায় আবার কাঁদতে লাগলেন। এক সাহাবী (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, "হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কেন কাঁদছেন"?

তখন আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলতে লাগলেন, "একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে অবস্থান করছিলাম। তখন দেখলাম তিনি হাত দিয়ে কি যেন দূরে ঠেলে দিচ্ছেন এবং বলছেন, "দূর হয়ে যা, দূর হয়ে যা"। অথচ আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাই আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনি কাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছেন"? তিনি বললেন যে, "আমার নিকট দুনিয়া এসেছিল আর আমি তাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছিলাম। তারপরে দুনিয়া বলতে লাগলো যে, আপনি তো বেঁচে গেলেন, কিন্তু আপনার পরের লোকেরা কিভাবে বাঁচবে? তাই আমি আবু বকর ভয় পাচ্ছি যে, না-জানি আমি সেই দুনিয়ার ফাঁদে আটকে যাচ্ছি!

সায়্যিদুনা সাঈদ ইবনে আমির (রা.) এর দুনিয়ার বিমুখতাঃ

সায়্যিদুনা উমার (রা.) এর হাতে একবার এক ব্যক্তি মধুর শরবত দিলে তিনি তা ঘুরাতে ফিরাতে থাকেন। এরপর সেই শরবত পান না করেই ফেরত দিয়ে দেন। এরা তো ঐ সকল মহাপুরুষ যাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জান্নাতের খোশ-খবর দিয়েছেন!

একবার উমার রা. এর খিলাফতের সময় তার কাছে হিমস্ (সিরিয়ার একটি শহর) থেকে একটা দল গরিবদের তালিকাসহ আসলো। উমার (রা.) দেখলেন সেই তালিকায় তাদের গভর্নর সাঈদ বিন আমিরের নামও রয়েছে।

তাই উমার (রা.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, গরিবদের এই তালিকায় তোমাদের গভর্নরের নাম কেন? তিনি তোমাদের আমির! তারা বললেন যে, "আমাদের আমির আমাদের গরিবদের অন্তর্ভূক্ত অর্থাৎ তিনিও গরীব"। হযরত উমার (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, "তাকে বাইতুল মাল থেকে যে, ওযিফা বা সম্মানী ভাতা দেওয়া হয় তা দিয়ে তিনি কি করেন"? তারা বললেন, "তার কাছেই কিছুই রাখেন না বরং অন্যদেরকে দিয়ে দেন"।

ঐ দলটি যখন ফিরে যায়, তাদের কাছে উমার (রা.) সাঈদ বিন আমিরের জন্য কিছু দিরহাম দিয়ে দেন। তার স্ত্রীর ভাষ্যমতে ঐ দিরহাম সাঈদ বিন আমিরের হাতে গেলে তিনি এতটাই চিন্তিত ছিলেন যে, আমি (স্ত্রী) তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "হে আমীরুল মু'মিনীন কিছু হয়েছে না-কি?" তিনি উত্তর দিলেন, "অনেক বড় এক মুসিবত এসেছে"।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, "কিয়ামতের কোন আলামত দেখা দিয়েছে কি? তিনি বলনেন, "না, এর থেকেও বড় বিপদ এসেছে"। আমি বললাম, "তাহলে কি হয়েছে"? তিনি বললেন, " اتتنى الفتنة اتتنى الدنيا " **দুনিয়া এসেছে, আরে ফিতনা এসেছে। তোমার কাছে যদি কিছু থাকে নিয়ে আস! আমি এ ফিতনাকে দ্রুত দূর করতে চাই"।** এ কথা শুনে স্ত্রী একটি থলে নিয়ে আসলে সেই দিরহামকে থলেতে করে মানুষদের মাঝে বন্টন করতে লাগলেন।

দুনিয়ার হাক্বিকতঃ

আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত যাকে এ দুনিয়ার হাক্বিকত সম্পর্কে অবগত করেছেন

এবং সাথে সাথে অন্তরের মধ্যে আখেরাতের স্বাদ ও মজা আস্বাদন করার তাওফিক দিয়েছেন, আল্লাহর মহব্বত ও ভালোবাসা যেই অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন, আল্লাহর সাক্ষাতের তামান্না যেই অন্তরে স্থান করে নিয়েছে, সে কোন অবস্থাতেই এ দুনিয়ার পিছনে পড়তে পারে না। সে কখনো স্বীয় নফস থেকে গাফেল হতে পারে না। কখনো সে শয়তানের চক্রান্ত থেকে অসতর্ক থাকতে পারে না। সর্বদাই সে পেরেশান এবং চিন্তায় মগ্ন থাকে। যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বদা চিন্তা ও পেরেশানীর মধ্যে থাকতেন। এ চিন্তা ও পেরেশানীতে থাকাটা দুনিয়া অর্জনের জন্য নয় বরং দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকার জন্য।

মুজাহিদের অর্ধেক নেকি: আখেরাতের ফিকির-

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একজন সাহাবীয়া ছিল, যখনই তার স্বামী ঘরে আসতেন তখন বলে দিতেন যে, স্বাগতম আমার সর্দারকে, স্বাগতম ঘরের লোকদের নেতাকে। তারপর তিনি এই কথাটি বলতেন –

أن كان همك لاخرتك فزادك الله هما وإن كان همك لاخرتك فإن الله سيرزقك ويحسن إليك

অর্থাৎ যদি তোমাদের চিন্তা-পেরেশানী আখেরাতের জন্য হয়ে থাকে, তো আল্লাহ্ যেন তোমাদের চিন্তা ফিকির ও তার সন্তুষ্টিকে বাড়িয়ে দেন, আর যদি দুনিয়ার জন্য হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তা'য়ালা যেন সে পেরেশানীকে সহজ/কমিয়ে করে দেন এবং উত্তম রিযিকের ব্যবস্থা করে দেন।

ঐ সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট গিয়ে উক্ত

ঘটনার বর্ণনা করেন যে, যখনই আমি ঘরে আসি তখনই আমার স্ত্রী এ কথা বলতে থাকে। এ ঘটনা শুনে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমার স্ত্রীর জন্য মুজাহিদের অর্ধেক সওয়াব রয়েছে। সে আল্লাহর রাস্তায় আমলকারীদের একজন বা আল্লাহর মজদূরদের একজন হিসেবে গন্য হবে। **(ইবনে আবীদ্দুনিয়া-৯৪ পৃ.)**

আখেরাতে ফিকির এমনই এক আমল। আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের চিন্তা-ভাবনা এমনই এক আমল - যে এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে সে কখনো দুনিয়ার পিছনে পড়তে পারে না। এ দুনিয়ার স্বাদ তার কাছে কোন স্বাদ-ই মনে হয় না বরং তিক্ত মনে হয়। দুনিয়া যতই সুন্দর অবয়ব নিয়ে তার সামনে আসুক না কেন, সে দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ে না। আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত সূরা আনকাবূতে বলেন-

مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ اللّهِ فَإِنّ أَجَلَ اللّهِ لأتٍ وَهُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ

যে আল্লাহর সাক্ষাত কামনা করে, আল্লাহর সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। [সুরা আনকাবুত ২৯:৫]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশা পোষন করে,

আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের একটি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, আর সেটা হলো মওত।

فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

আল্লাহর সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

[সুরা আনকাবুত ২৯:৫]

সুতরাং তার জন্য উচিত হলো যে, সে যেন উক্ত বাঁধাকে দূর করে, উক্ত বাঁধাকে উপেক্ষা করে অথবা উহা দূর হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকে।

فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ

[সুরা আনকাবুত ২৯:৫ আল্লাহর সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে। [

আর আল্লাহর সে নির্ধারিত সময় বা ক্ষণ অবশ্যম্ভাবী। যার জান্নাতের স্বাদ অনুভূত হয়েছে, যার সামনে কুরআনে কারীমের নকশা খোলা রয়েছে, যে জান্নাতের ব্যাপারে কুরআনে কারীম বিস্তর আলোচনা করেছে সে ব্যক্তি এ দুনিয়ার পিছনে পড়তে পারে না। সে দুনিয়াকে ছাড়ুক বা না ছাড়ুক, তার কাছে দুনিয়া পছন্দ হোক বা না হোক, তার কাছে প্রশস্থতা থাকুক বা না থাকুক সে কখনো দুনিয়ার ফিতনায় পড়তে পারে না।

দুনিয়ার গোলামঃ

আর যার লক্ষ্য আখেরাত থেকে সরে যাবে, তার মধ্যে আল্লাহর সাক্ষাতের আশা থাকবে না, শাহাদাতের আকাঙ্খাও থাকবে না। হয়তোবা তার কাছে দুনিয়ার কিছুই নেই তবুও পুরা দুনিয়ার সব কিছুর ভালোবাসা তার অন্তরে স্থান করে নিয়েছে। হতে পারে তার কাছে কিছুই নেই, আশ্রয়ের মতো কোন বাসস্থানও নেই, পায়ের জুতাও নেই, তবুও এটা সম্ভব যে তার দিল দুনিয়ার

ভালোবাসায় ডুবে আছে।

আখেরাতের মেহমান!

আর যদি কেউ আল্লাহর সাক্ষাতের প্রত্যাশী হয়, দুনিয়ার হাক্বিকত যদি তার সামনে থাকে, আখেরাতের স্বাদ যদি তার সামনে থাকে, দুনিয়া বিমূখতা যদি তার সামনে থাকে - তাহলে তার সামনে যাই কিছু আসুক না কেন; যতই ধন-সম্পদ অর্জিত হোক না কেন; যতই দামি দামি বস্তু তার হোক না কেন, সে কখনো ঐগুলিকে অন্তরে স্থান দেয় না। সে কখনো এমন ভাবে না যে, এটা আমার নিকট খুব পছন্দের বা খুব শখের। তাই তার দিলে ঐ জিনিসের মহব্বত থাকে না।

আখেরাতের চিন্তাঃ দুনিয়ার ফিকির

আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত আমাদের প্রতি হাজার কোটি অনুগ্রহ করেছেন যে, আমাদের অন্তরকে দুনিয়ার মহব্বত থেকে খালি করে আখেরাতের ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছেন। এটা আল্লাহর অসীম দয়া ও কৃপা যে, আমাদের দিল থেকে দুনিয়া অর্জনের চিন্তা-ভাবনাকে দূর করে আখেরাতের চিন্তা ও ফিকিরকে ভরে দিয়েছেন। আর এটা ছোট কোন নিয়ামত নয়। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন-

إن الله يحب كل قلب حزين

নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রত্যেক চিন্তাশীল অন্তরকে ভালোবাসেন [মুসতাদরিক]

অর্থাৎ যে দিলের মধ্যে দ্বীনের জন্য চিন্তা থাকে সে দিলকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন। যে দিল দ্বীন কায়েমের জন্য সর্বদা অস্থির থাকে সে আল্লাহর নিকট

অতিপ্রিয়। অন্যত্র হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'য়ালা ঘোষণা করেন-

اناعند الكسرة قلوبهم من اجلى

আমি ঐ অন্তরে থাকি, আমি ঐ দিলকে মহব্বত করি যে দিল আমার ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। যে অন্তর আমার জন্য চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়, সে দিলের মাঝে আমি অবস্থান করি।

মালিক ইবনে দিনার রহ. বলেন, এ অন্তরের দৃষ্টান্ত হলো ঘরের মতো। যদি এ দিল চিন্তা থেকে খালি হয় অর্থাৎ আখেরাতের চিন্তা থেকে উদাসীন হয়, দ্বীনের চিন্তা থেকে মুক্ত থাকে, তবে সে দিল বিরান ঘরের ন্যায়। আসলে এটা ঘর হলেও লোকজন বসবাস না করায় তাকে বিরান ঘর বা অনাবাদী ঘর বলা হয়। আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত যেন আমাদের অন্তরে আরো বেশি পরিমাণ চিন্তা-ভাবনা ঢেলে দেন। আমাদের দিলের মধ্যে দ্বীনের পেরেশানী যেন অ-নে-ক বেশি পয়দা করে দেন।

দুনিয়ার দৃষ্টান্ত শায়িত সাপের ন্যায়!

আমার মা ও বোনেরা!

আমরা যেন কখনো নফস থেকে বেখবর বা অসতর্ক না থাকি। সর্বদা নফস সম্পর্কে সতর্ক থাকা খুব-ই জরুরী। নফস কোন সূরতে যেন আমাদের উপর আক্রমণ করে না বসে। এক বুযুর্গ বলেন- "নফস এর চরিত্র এমন – কেমন যেন মনে হয় যে নফস শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এটা শেষ হয় না"। আরেকটা দৃষ্টান্ত হলো – "শুয়ে থাকা সাপের মতো, যাকে দেখে মনে হয় সে মারা গেছে। কিন্তু যখনই ঐ সাপ থেকে অসতর্ক হয়, যখনই সে সুযোগ পায়,

তখনই সে দংশন করে ফেলে। নফস এর অবস্থাও এমন-ই”।

দুনিয়ার ভালোবাসা ﷺ আখেরাতের মহব্বত

আল্লাহর দরবারে শত সহস্র শুকরিয়া যে, তিনি অগণিত নেয়ামত আমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। তবুও আমরা যেন কখনো এটা মনে না করি যে - আমাদের উপর নফস বা আত্মা আক্রমণ করবে না, হামলা করতে পারবে না বা পুনরায় দুনিয়ার মহব্বত বা লোভ-লালসা আমাদের অন্তরে আসবে না। দুনিয়ার মহব্বত ও ভালোবাসা অবশ্যই আসতে পারে। এমনকি দুনিয়া ছেড়ে দেওয়ার পরেও আবার তার মহব্বত অন্তরে আসতে পারে।

দুনিয়ার মহব্বত অন্তরে আসার জন্য এটা জরুরী নয় যে, কোন দামী বা মূল্যবান বস্তুর জন্য আসতে হবে। বরং হতে পারে দুনিয়ার ভালোবাসা ছোট ছোট জিনিসের মধ্যেও আসতে পারে। যখন দিল আখেরাতের অর্জন থেকে বিরত থেকে দুনিয়া অর্জনের জন্য লেগে যায়, আর আল্লাহর সাক্ষাত থেকে দৃষ্টি অন্য দিকে চলে যায়, তখন মানুষটি সাধারণ মানুষে পরিণত হয়ে যায়।

হয়ত সে হিজরত করে থাকতে পারে অথবা জিহাদের জন্য বড় বড় ময়দান পাড়ি দিয়েছে। কিন্তু যখনই আল্লাহর সাক্ষাত থেকে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, আল্লাহ্ তা’য়ালার সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্খা অন্তর থেকে বের হয়ে যায় বা সাক্ষাত থেকে উদাসীন হয়ে যায়, তাহলে সে দুনিয়াদার হয়ে যায়। সেও তখন ছোট ছোট জিনিসের জন্য লড়াই করে থাকে। অতি নগন্য জিনিসের মহব্বত তার অন্তরে স্থান করে নেয়। পদ-মর্যাদার লোভ, প্রসিদ্ধিতার ভালোবাসা, দুনিয়ার ভালোবাসা তার দিলে ঢুকে যায়। মানুষেরা তার প্রশংসা

করুক – এই চাওয়া তার অন্তরে চলে আসে। আসবাবপত্র জমা করার মহব্বত, ভালো মনোরম পরিবেশে থাকার মহব্বত, স্থীরতার সাথে দুনিয়াতে থাকার মহব্বত অন্তরে জায়গা করে নেয়। যদি কেউ নফস থেকে উদাসীন হয়ে যায়, তবে তার অবস্থা এমনটাই হয়।

কে ইবলিসকে শয়তান বানালো?

এজন্য কোন অবস্থাতেই নফস নামক এ দুশমন থেকে অসতর্ক থাকা যাবে না। এ নফস এমন দুশমন যে, শয়তানের থেকেও ভয়ঙ্কর বা বিপদজনক। এটা এমন এক শত্রু যে, শয়তানকেও ধ্বংস করে দিয়েছে। সে শয়তানকে শয়তানে পরিণত করেছে।

মানুষ যখন নফসের কাছে পরাজিত হয়ে যায়, নফস এর গোলামী বা আনুগত্যতা করতে থাকে, তার সুবিধা মতো চলতে থাকে তখন সে মানুষটির আর কিছুই করার থাকে না। তারপর সে নিজেকে নিজে বড় মনে করতে থাকে। অতঃপর সে নিঃকৃষ্ট মানুষদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। তখন তার অনুভূতি শক্তিকে হারিয়ে ফেলে, যার ফলে সে তার আখেরাতকে বরবাদ করে ফেলে।

সুতরাং এ নফস থেকে বেঁচে থাকা খুব-ই জরুরী। এ নফস তো এমন জিনিস যে, হিজরত করা সত্ত্বেও, জিহাদের বড় বড় ময়দানে অংশ গ্রহণ করা সত্ত্বেও, অনেক কুরবানী করা সত্ত্বেও যে কারোর উপর আক্রমণ করে বসতে পারে।

নফসের ধোঁকাঃ টার্গেট অনুযায়ী

সাহাবায়ে কেরামগণ (রা.) যার থেকে সর্বদা সতর্ক থাকতেন, ভয়ে থাকতেন, কখনো উদাসীন হতেন না, সেটা হলো - নিজেকে নিজে বড় মনে করা। এটা স্মরণ রাখা দরকার যে, নফস সর্বদা মানুষের মেজাজ বা তবিয়ত অনুযায়ী গোমরাহ করতে থাকে। দুনিয়াদারদেরকে দুনিয়ার মাধ্যমে, দ্বীনদারকে দ্বীনি বিষয় দিয়ে গোমরাহ্ করে থাকে।

দ্বীনদারের সামনে যে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়ে থাকে সেটা মূলত দ্বীন-ই। আর সেটা হলো- আমিতো দ্বীনের জন্য অনেক কুরবানী করেছি, আমিতো হিজরত করেছি, আমার স্বামীতো অনেক বড় কুরবানী করেছে, সে-তো এই সেই আরো কত শত দ্বীনি কাজ করে! কত শত ময়দানে সময় দিয়েছে! এরপরে তার মধ্যে এমন খারাবী চলে আসে, যার কারণে সে অন্যের মধ্যে খারাবী দেখতে থাকে এবং সে ভুল ধরতে থাকে।

দ্বীনি দৃষ্টিকোন থেকে যখন নিজের বুলুন্দী চলে আসে, তখন সে অন্যকে তুচ্ছ মনে করতে থাকে, অন্যকে ছোট থেকে ছোট মনে করতে থাকে। অন্যকে কোন দাম-ই দেয় না। এটাই হলো সেই মোক্ষম সময় যে সময় নফস তাকে ধ্বংস করতে তৈরী থাকে। এটাতো সেই সময় যে সময়ে নফস তাকে ধোঁকা দিতে তৈরি থাকে। এজন্য বুযুর্গ বলেন-

কোন ব্যক্তি ঐ পর্যন্ত আল্লাহর ওলী হতে পারে না, যতক্ষণ না সে নিজেকে সবচে বড় গোনাহগার বা অপরাধী মনে না করে। নিজের আমলের ব্যাপারে ভয় করতে থাকে যে, এ আমল কবুল হবে কি হবে না।

আল্লাহর সামনে দাড়ানোর ভয়ঃ হযরত উমার রা.

উমর রা. এর অবস্থা দেখুন - যার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ জান্নাতের খোশখবরী দিয়ে বলেছেন- উমার জান্নাতী। উমার (রা.) তখন যখম অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছেন, রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। যখনই কোন সাহাবী তার নিকট আসেন, তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে, "উমরের কি অবস্থা হবে"? কান্না করছিলেন আর বলছিলেন, "উমারের কি হবে"?

সাহাবীগণ শান্তনা দিচ্ছিলেন যে, "আমীরুল মু'মিনীন! আপনার এ কুরবানী, আপনার এই ত্যাগের বিনিময়ে আল্লাহ্ আপনার সাথে উত্তম আচরণ করবেন"। তখন উমার (রা.) বলেন, "তোমরাতো আমাকে ধোঁকার মধ্যে ফেলে দিচ্ছো । কেননা আমার ভালো করেই জানা আছে, আমার আমলের অবস্থা কি?"

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. যখন আসলেন, (যাকে হযরত উমার রা. অত্যন্ত মহব্বত করতেন) তাকে বললেন, "ইবনে আব্বাস! উমারের কি অবস্থা হবে"? আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, "হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ আপনার প্রতি অনেক এহসান বা অনুগ্রহ করেছেন। আপনাকে অনেক বড় দৌলত দান করেছেন। আপনার হিজরতের মাধ্যমে দ্বীনকে শক্তিশালী করেছেন, আপনার ঈমানের বদৌলতে দ্বীনকে মজবুত করেছেন। আপনি হিজরত করেছেন এবং সকল যুদ্ধে আপনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়া থেকে বিদায় নেন এমন অবস্থায় যে, তিনি আপনার প্রতি রাজি ছিলেন। তারপরে তার খলীফা হযরত আবু বকর রা. এর সাথে ছিলেন এবং সকল

যুদ্ধে আপনি আবু বকর রা. এর সাথে শরীক ছিলেন। তিনিও এমন অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেন যে, তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তাই আল্লাহ্ আপনার সাথে উত্তম ব্যবহার করবেন ইনশা আল্লাহ"।

হযরতে উমার রা. জিজ্ঞেস করলেন যে, "হে ইবনে আব্বাস! তুমি কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে এ কথার স্বাক্ষ্য দিতে পারবে"? তখন ইবনে আব্বাস রা. বলেন যে, "হে আমিরুল মু'মিনীন! হ্যা! আমি কিয়ামতের দিন এ কথার সাক্ষ্য দিবো ইনশা আল্লাহ"। এই সেই উমার যার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাম ধরে জান্নাতের খোশখবরী দিয়েছেন।

কিয়ামতের দিনঃ প্রথমেই যাদের বিচার হবে!

একবার সায়্যিদুনা হযরত আবু হুরাইরাহ্ রা. এক মসজিদে নামায আদায় করেন। সেখানে একজন তাবেয়ী বসে ছিলেন। তিনি বললেন, "আপনার পক্ষ থেকে হাদিস বর্ণনা করুন যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যার হিসাব গ্রহণ করা হবে"? হযরত আবু হুরাইরাহ রা. উত্তর দিলেন, "কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম একজন আলিমকে হিসাবের জন্য আনা হবে। তাকে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত জিজ্ঞাসা করবেন, "আমি তোমাকে ইলম্ দিয়েছিলাম, সে ইলমের কি হক্ক আদায় করেছিলে"? সে বলবে, "আয় আল্লাহ্! আমি এত পরিমাণ দরস্ ও তাদরীসের কাজ করেছি। আপনার বান্দাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিয়েছিলাম। তাদেরকে হেদায়েতের পথে নিয়ে এসেছি। আমার সারা জীবন শিক্ষা-দীক্ষার কাজে ব্যয় করেছি, দ্বীনের খেদমত করেছি"। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বলবেন – "তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি তো এগুলো এ কারণে করেছিলে যাতে

লোকেরা তোমাকে আলিম বলবে”!

এরপর ফেরেস্তাদেরকে হুকুম দেওয়া হবে যে, তাকে টেনে হিছড়ে অধঃমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। হাদিসের এ অংশটুকু হযরত আবু হুরাইরাহ্ রা. শোনানোর পরে বেহুশ হয়ে পড়েন। আবার যখন হুশে ফিরে আসেন তখন পরের অংশ বর্ণনা করেন যে, “তারপর একজন শহীদকে ডাকা হবে এবং আল্লাহ্ তা’য়ালা তাকে বলবেন, “তোমার অবস্থা অর্থাৎ তুমি কেন শহীদ হয়েছিলে”? তখন সে উত্তরে বলবে, “হে আল্লাহ্! আপনার দ্বীনকে উঁচু করার জন্য, দ্বীনকে আপনার দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করতে আমি শহীদ হয়েছিলাম”। আল্লাহ্ বলবেন- “তুমি মিথ্যা বলছো, তুমি তো এ কারণে শহীদ হয়েছিলে যাতে লোকেরা তোমাকে বীর-বাহাদূর বলে”। অতঃপর তার ব্যাপারেও ফেরেস্তাদেরকে হুকুম দেওয়া হবে যে, তাকে টেনে হিছড়ে অধঃমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো।

হাদিসের এ অংশ বর্ণনা করার পরে হযরতে আবু হুরাইরাহ রা. এত পরিমাণ কান্না করেন যে, তিনি আবারো বেহুশ হয়ে যান। পুনরায় জাগ্রত হলে হাদিসের শেষ অংশ বা তৃতীয় অংশ শোনাতে গিয়েও কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে যান এবং বলেন, “এ তিন ব্যক্তির অবস্থা যদি এমন হয়, তাহলে আবু হুরাইরার অবস্থা কি হবে”?

রাসূল প্রীতিঃ হযরত সাহাবায়ে কেরামগণ!

এমন ছিলো সাহাবাদের জিন্দেগী! এই ছিলো সাহাবীয়াদের জীবন! তাদের কুরবানী অনুযায়ী আমাদের কুরবানীর অবস্থা কেমন? তাদের মহব্বতের

তুলনায় আমাদের মুহাব্বত কেমন? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হযরতে সাহাবাগণ যেমন মহব্বত করতেন সে ক্ষেত্রে আমাদের মুহাব্বত কোন পর্যায়ের? কতটুকু?

জঙ্গে ওহুদের ময়দানে যেখানে সাহাবায়ে কেরামগণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে হেফাজত করছিলেন, তেমনিভাবে মহিলা সাহাবীগণও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হেফাজতের খেদমতে ছিলেন। বর্ণিত হয়েছে যে, যেখানেই খালি জায়গা চোখে পড়েছে, যেদিক থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দিকে আঘাত আসতে পারে সেখানেই তারা ঢাল বা প্রাচীর হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আঘাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছেন। নিজের গায়ে আঘাত লাগার ভয় পাননি। নিজের জীবনের কোন চিন্তা করেননি, তীর ও তলোয়ারের পরওয়া করেননি। বরং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দিকেই খেয়াল ছিল।

ওহুদের ময়দানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বাঁচানোর জন্য যারা ঢাল হয়ে জীবন দেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন হযরত তালহা রা.। তার শরীরে সত্তরটির অধিক আঘাত পাওয়া গিয়েছিল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জন্য দোয়া করে বলছিলেন-

وجبت له الجنة

তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেলো।

জঙ্গে ওহুদের পরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদিনায় তাশরীফ

আনার পূর্বে - মদিনার মহিলাগণ এ খবর জানতে পারলেন যে, তিনি শহীদ হয়ে গেছেন। যখন তিনি মদিনায় ফিরে আসেন তখন সকল মহিলা সাহাবীগণ বাইরে চলে আসেন। সা'দ বিন মুআয রা. নবীজির ঘোড়ার লাগাম ধরে ছিলেন।

সা'দ বিন মায়ায রা. এর ঘরে আসলে তার সম্মানিতা মা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খবর পেয়ে তাকে দেখার জন্য নবীজির সামনে উপস্থিত হন। সা'দ বিন মা'য়ায রা. এর পুত্র এই যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে দেখে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে, "আপনার নাতী শহীদ হয়ে গেছে"। তিনি উত্তর দিলেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনাকে দেখার পরে আমার সকল দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে গেছে"।

অন্য এক মহিলা সাহাবী ওহুদের ময়দানে দৌড়াচ্ছিলেন। তাকে সংবাদ দেওয়া হলো যে, তোমার স্বামী শহীদ হয়ে গেছে। তিনি জানতে চাইলেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেমন আছেন? তাকে আবার সংবাদ জানানো হয় যে, তোমার সন্তান শহীদ হয়ে গেছে। তিনি জানতে চাইলেন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কি অবস্থা? যখন তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ভালো থাকার কথা জানতে পারলেন, তখন বললেন, "সকল মুসিবত হালকা মনে হচ্ছে। সব দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে গেছে"।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখার পর আর কোন কষ্টই থাকতে পারে না। এই ছিলো সাহাবী ও সাহাবীয়াদের (রা.) অবস্থা। যেখানেই কষ্টের কারণে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র দেহ থেকে

ঘাম বের হতো, সেখানে তারা শরীরের রক্ত ঢেলে দিতেন। কিন্তু তারপরেও তারা কিভাবে জীবন-যাপন করেছেন? এ দুনিয়াকে কেমন ভয় পেতেন? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তেকালের পরে কিভাবে দুনিয়াতে বসবাস করেছেন? সর্বদা ভয়ে ভীত থাকতেন।

স্বীয় আমলে গর্বিত হওয়াঃ মুনাফিকদের আলামত

নিজের আমলের উপর গর্বিত হওয়া ঈমানদারদের শান নয়। এটাকে কুরআনে কারীমের মধ্যে মুনাফিকদের আলামত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের আলামত হিসেবে আলোচনা করা হয়েছে, যাদের অন্তরে এখনো ঈমান পৌঁছেনি। কুরআর মাজীদ তাদের ব্যাপারে ঘোষিত হয়েছে- আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

তারা মুসলমান হয়ে আপনাকে ধন্য করেছে মনে করে। বলুন, তোমরা মুসলমান হয়ে আমাকে ধন্য করেছ মনে করো না। বরং আল্লাহ ঈমানের পথে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাক। [সুরা হুজুরাত ৪৯:১৭]

অর্থাৎ তারা বলতে থাকে যে, আমরা এটা করেছি, ওটা করেছি। আমরা ঈমান এনে ইসলামের অনেক উপকার করে ফেলেছি।

আমাদের চিন্তা করা দরকার যে, আমাদের কি এমন যোগ্যতা ছিলো? আমরাও তো তাদেরই মধ্যে ছিলাম, দুনিয়ার ফিতনায় নিমজ্জিত ছিলাম,

সকাল সন্ধ্যায় দুনিয়া অর্জনের চিন্তায় মগ্ন ছিলাম। দুনিয়া অর্জনের চিন্তা-ফিকির নিয়ে সারাক্ষণ দৌড়া-দৌড়ি করে বেড়াতাম। আমাদের সামনে দুনিয়া অর্জনের থেকে কোন কাজ ভালো বলে মনে হতো না। আমাদের দিল ও দেমাগ, নজর ও ফিকির এ দুনিয়ার বাইরে কোথাও যেতোনা। আমরাতো ইঞ্চি ইঞ্চি মাটির জন্য লড়াই করতাম।

আমরাতো সেই লোক যারা এক একটি লোকমার জন্য মারামারি করতাম। সে ভালো পরেছে আমি কেনো সেটা পড়তে পারবো না? তার জন্য ভালো কাপড়ের ব্যবস্থা হয়েছে আর আমার জন্য কেন হলো না? এসব বিষয়ের ফাঁদে আমরা আটকে গিয়েছিলাম। তারপর আমাদের প্রতিপালক আমাদের প্রতি মেহেরবানী করেছেন, অনুকম্পা দেখিয়েছেন। আমাদেরকে সংকীর্ণতা থেকে প্রশস্থতার দিকে নিয়ে এসেছেন। ঐ সকল ঝগড়া থেকে বের করে শান্তির পথে নিয়ে এসেছেন। দুনিয়ার মহব্বত থেকে বাঁচিয়ে আখেরাতের মহব্বতে লিপ্ত করেছেন। দুনিয়ার থেকে দৃষ্টিকে সরিয়ে আখেরাতের প্রতি ধাবিত করেছেন। তাহলে আমরা কি করে আল্লাহর দেয়া অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করবো? এটাতো আল্লাহর-ই অনুগ্রহ, তার-ই মেহেরবানী যে, তার পথে আমাদেরকে কবুল করে নিয়েছেন।

আসুন! কৃতজ্ঞ হই: আত্ম-অহমিকা থেকে বেঁচে থাকি

আমার সম্মানিতা মা ও বোনেরা!

আল্লাহর এ বিশেষ অনুগ্রহের মূল্যায়ন করা উচিত। এর গুরুত্ব বুঝা দরকার। এ দুনিয়াকে সামনে রেখে প্রথমবার যেমনিভাবে লাথি মেরেছিলাম এবং

কখনো এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করিনি। আল্লাহর ভালোবাসা অন্তরের মধ্যে এতটাই প্রবল হয়েছিলো যে, সকল মহব্বতের উপর আল্লাহর মহব্বত বিজয়ী হয়েছিলো।

হিজরত করার সময় এমন ধারণা এসেছিলো যে, মা-কে ছেড়ে, বাপকে ছেড়ে, নিজের পরিবার পরিজনকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি, আর এমন জায়গায় যাচ্ছি যেখানে কোন পরিচিতজন নেই। অপরিচিত স্থান, ঘরে ফিরে আসা হবে কি হবে না! আর কখনো ঘরের দৃশ্য দেখা হবে কি-না! কিন্তু আল্লাহর ভালোবাসা সবার উপরে বিজয়ী হওয়ার কারণে, আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের মহব্বত বিজয়ী হয়েছে। আল্লাহর দ্বীনের ইজ্জত সকলের উপরে উথলে উঠায়, আল্লাহ্ তা'য়ালা ইহসান ও অনুগ্রহে ময়দানে কদম রাখার পর, রাব্বুল ইজ্জতের স্বাদ আস্বাদনের পরে, আখেরাতের জন্য এ দুনিয়াকে ছেড়ে দেওয়ার পরে তুমি পুনরায় দুনিয়ার দিকে, দুনিয়া অর্জনের দিকে ফিরে যাবে?

দুনিয়ার মহব্বত যখন একবার অন্তর থেকে বের করে দিয়েছি, দুনিয়ার স্বাদকে যেহেতু একবার মুখের থেকে ফেলে দিয়েছি, তাই দ্বীনের উপরে চব্বিশ ঘন্টা থাকার জন্য, নিজের অঙ্গীকার ঠিক রাখার জন্য সতর্ক থাকা অপরিহার্য। এমন যেন না হয় যে, শয়তান আবার আমাদেরকে দুনিয়ার ফাঁদে ফেলে দেয়। বড় বড় জিনিসকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে এখন ছোট ছোট জিনিসের ফাঁদে আটকে যেন না পড়ি। দুনিয়াকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি আর আখেরাতও যদি হাত থেকে ফসকে যায় তাহলে এটা অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। তখন দুনিয়ার মধ্যে আমাদের থেকে বড় আহম্মক, বেওকুফ কে হবে? আমাদের থেকে নিম্মমানের সৃষ্টি কি হতে পারে? যারা দুনিয়াকেও ধ্বংস করেছে,

আবার আখেরাতকেও সুন্দর করে সাজাতে পারেনি?

আমাদেরতো আরো অনেক সতর্ক থাকা দরকার। আমাদেরতো অন্যান্য লোকদের থেকে আরো বেশী ভীত থাকা দরকার। চলার পথে দেখেশুনে কদম ফেলা প্রয়োজন। আমাদের কোন কথার মাধ্যমে, কোন কাজের দ্বারা আল্লাহ্ তা'য়ালা অসন্তুষ্ট হয়ে যায় কি-না, আমাদের কোন পদক্ষেপের দ্বারা দ্বীনের কোন ক্ষতি হয়ে যায় কি-না, আমাদের আখেরাত বরবাদ হয়ে যায় কি -না - এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বল করা চাই।

অনেক বিষয় এমন আছে যা দেখতে ক্ষুদ্র মনে হয়, বাস্তবে তা ছোট নয়, আমাদের নজরে ছোট বলে মনে হয়। আর যদি সেগুলোর গুরুত্ব না দেই তাহলে আমাদের আমলকে নষ্ট করে দেয়। শয়তান এ রাস্তায় আমাদেরকে আক্রমণ করতে ওৎ পেতে বসে আছে। নফস যে রাস্তা দিয়ে আমাদেরকে ধোঁকা দিতে পারে, সেদিকেই আমরা দৌড়াচ্ছি এমন যেন না হয়। আমাদের হিজরত ও জিহাদের পরে এমন মনে করে বসে থাকা যাবে না যে, আল্লাহর এ হুকুম বা বিধান আমাদের জন্য নয়, এটা দুনিয়াদারদের জন্য প্রযোজ্য!

হিজরত ও জিহাদ করা যেমন আল্লাহর হুকুম, তেমনিভাবে বাকি হুকুমগুলোও আল্লাহ্ তা'য়ালার হুকুম। আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত ঐ সকল খারাবী থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন, যেগুলো সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বয়ান করেছেন, কুরআনে মাজীদে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত ঘোষণা করেছেন এবং যেগুলো থেকে বাঁচার জন্য আদেশ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের দিলের মধ্যে যেন উজব বা স্বীয় আমলের প্রতি আত্মতৃপ্তি না আনেন। আমি অনেক বড় হয়ে গেছি আর অন্যদেরকে হাক্বীর বা তুচ্ছ মনে করা – এমন হওয়া থেকে আল্লাহর পানাহ চাই। এটা ইবলিস এবং শয়তানের বড় একটা মাধ্যম যা দিয়ে মানুষকে ঘায়েল করে বরবাদ করে দেয়। যদি নিজেকে মুখাপেক্ষী মনে করা হয়, নিজেকে দুর্বল এবং অপরাধী মনে করা হয়, তাহলে বড়ত্বের রোগ থেকে বাঁচাকে আল্লাহ সহজ করে দিবেন। নতুবা শয়তান আমাদেরকে বড়াই করার রোগের ব্যাপারে উদাসীন করে দিবে।

আমরা কুরআন পড়বো, দরস্ শুনবো, কিন্তু শয়তান এর দ্বারা অন্যকে সংশোধনের পিছনে ফেলে নিজেকে ভুলিয়ে রাখবে। এভাবে এ রোগ বাড়তে বাড়তে মানুষের এ অনুভূতি থাকে না যে, এ খারাবীতো তার নিজের মধ্যেও বিদ্যমান। তার কাছে মনে হতে থাকে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত যে সম্বোধন করেছেন, এর দ্বারা আমাকে নয় বরং অমুক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অমুকের মধ্যে এই দোষ রয়েছে, অমুকের মধ্যে এই খারাবী রয়েছে, কিন্তু নিজেকে সে ভুলে যায়। সফল ব্যক্তিতো সেই, যে ব্যক্তি নিজের সংশোধনের চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। নিজেকে নিজে গোনাহগার মনে করে, নিজের জন্য সর্বদা আখেরাতের প্রতি মনোনিবেশ করে। এবং ঐ সকল জিনিস থেকে বেঁচে থাকে, যা আলমকে বিনষ্ট করে দেয়।

উপহাস: আমল বিনষ্টকারী

যেমনিভাবে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত বলেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ
أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ
ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরকে উপহাস করো না। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। (সুরা হুজুরাত ৪৯:১১)

এখানে পুরুষের সাথে সাথে নারীকেও সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে ‘এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে’। উক্ত আয়াতে কারিমায় মানুষের একটি খারাব অভ্যাসের কথা তুলে ধরা হয়েছে। আর তা হলো উপহাস করা। উপহাসতো সেই করতে পারে যে, নিজেকে বড় এবং ভালো বা উত্তম মনে করে থাকে। অন্যকে ছোট মনে করে থাকে। তাই বলা হয়েছে, হতে পারে যাকে উপহাস করা হচ্চে সে ব্যক্তি উপহাসকারী বা উপহাসকারীনির চেয়ে উত্তম। তাই একে অপরের উপহাস করা উচিত নয়। একজন অন্য জনের দোষ-ত্রুটির আলোচনা করা উচিৎ নয়।

আল্লাহ্ তা’য়ালা এখানে পুরুষ ও মহিলাদেরকে ভিন্ন ভিন্নভাবে সম্বোধন করেছেন। যাতে করে মহিলাগণও এর থেকে বাঁচতে পারে। বিষয়টি যদিও ছোট মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে তা অনেক বড়। যদি আল্লাহর দৃষ্টিতে ঐ বোন

অনেক বড় ইজ্জতের অধিকারীনি হয়, তার মর্তবা অনেক উঁচু হয় এবং তার অন্তরে কেউ দুঃখ দেয়, তাহলে এটা আল্লাহর অসন্তুষ্টি কারণ হয়ে দাড়ায়। আর যদি আল্লাহর অসন্তুষ্টি নেমে আসে তাহলে বলেন এর থেকে কিভাবে বাঁচবো? তাহলে আমাদের আমল আমাদের কি কাজে আসবে?

তাইতো আমাদেরকে ঐসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা খুব-ই প্রয়োজন, যার কারণে আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। নফস গাফলতের মধ্যে ফেলে দেয়। এ জন্যই তো সাহাবায়ে কেরামগণ এবং বুযুর্গানে দ্বীন এ গাফলত থেকে পানাহ্ চেয়ে বলতেন, আয় আল্লাহ্! আমাদেরকে অবসাদ বা গাফলত থেকে হেফাজত করুন। এই দোয়া পড়তেন-

اللهم إني أعوذ بك أن أكون من الجاهلين

হে আল্লাহ্ আমি আপনার কাছে গাফেলদের অন্তভূক্ত হওয়া থেকে পানাহ্ চাইছি।

একটি মূহুর্তের জন্য যদি কেউ উদাসীন হয়ে যায়, তাহলেই মানুষ খুব খারাব হয়ে যায়। তার মধ্যে অনেক খারাবী ঢুকে যায়।

এভাবে এ কুরবানী করা, হিজরত করে চলে আসা এবং জিহাদে অংশগ্রহণ করা সত্যিই অনেক বড় নিয়ামত। কিন্তু আমাদের নফস চেষ্টা করতে থাকে যে, আমাদের মধ্যে নিজের কাজ-কর্মকে নিজের চোখে সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলে উযব সৃষ্টি করতে। আত্মতৃপ্তি পয়দা করে দেয় যে, তুমিতো হিজরত করেছো, তুমিতো জিহাদ করেছো - অথচ অমুকতো হিজরত বা জিহাদ করেনি; এই অনুভূতিকে নফস এবং শয়তান অন্তরে ঢেলে দেয়। তাই এ

দৃষ্টিকোন থেকে এমন চিন্তা না করা যে, অমুকতো এটা করেনি, সে-তো সেটা করেনি! বরং আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে যে তাওফিক দিয়েছেন এর জন্য কৃতজ্ঞতা আদায় করা চাই এবং যাকে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাওফিক দেননি তার জন্য অন্তরে ব্যথা নিয়ে দু'য়া করতে থাকা যাতে তাকেও আল্লাহ্ তা'য়ালা তাওফিক দান করেন।

উযব বা আত্ম-অহমিকা থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্যঃ

উযব সৃষ্টি করা বা নিজেকে নিজে ভালো মনে না করা চাই। যদি উযব পয়দা হয়ে যায়, বুঝতে হবে আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের অবস্থা ঐ দুনিয়াদারের মতো হয়ে যায়, আমাদের বোনদের অবস্থা, মুহাজির বোনদের অবস্থা দুনিয়াদার মা-বোনদের মতো হয়ে যায়। ফলে তারা যেমন কাপড়ের জন্য লড়াই বা ঝগড়া করে, তেমনি আমাদের বোনেরাও কাপড়ের জন্য লড়াই করে। যেভাবে দুনিয়াওলারা সামানা বা আসবাবপত্রের জন্য লড়াই করে, আমাদের বোনেরাও তার জন্য লড়াই করে। যেমনিভাবে তারা ঘরকে সাজানোর জন্য লড়াই করে, তেমনী আমাদের বোনেরাও ঘর সাজানোর জন্য বিভিন্ন জিনিসের আবদার করে বসে। যেমন করে দুনিয়াবী লোকেরা আরাম ও আয়েশের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে, সেভাবে আমাদের বোনেরাও চেষ্টা করতে থাকে। বস্তুতো একটাই শুধু জাতের ভিন্নতা।

বিষয়টা এমন নয় যে, সে দুনিয়ার জীবনে রয়েছে আর দুনিয়ার ধোঁকায় পতিত হয়েছে। বরং সে দুনিয়ার পিছনে দৌড়ায় আর দুনিয়া তার থেকে পালাতে থাকে।

ভোগে নয়; ত্যাগেই প্রশান্তি

তাই এ সকল জিনিসের মহব্বত দিলের মধ্যে না আনা চাই। এ সকল বস্তু ব্যাবহার করা বা অর্জন করা নিঃসন্দেহে বৈধ। অবশ্যই এ সকল বস্তুকে গ্রহণ করা আপনার জন্য বৈধ, কিন্তু যদি আপনি এগুলোকে কুরবানী করতে পারেন, অন্যকে দিয়ে দিতে পারেন তবে সেটা উত্তম। সম্পদ বা কোন বস্তু অন্যকে দিয়ে দেওয়ার মধ্যে যে স্বাদ অনুভূত হয়, ব্যাবহার বা ভোগ করার মধ্যে সে স্বাদ পাওয়া যায় না।

আপনার সত্যিকারের ভালোবাসার পাত্র স্বীয় রবের সাথে ব্যক্তির যে সম্পর্ক তা প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে নিজেই বুঝতে পারে। এটা অন্যরা বুঝতে পারে না। ত্যাগের মাধ্যমে রবের সাথে সম্পর্কের স্বাদ কতটা বেড়ে যায়, এ সম্পর্কের মধ্যে কতটা গভীরতা বেড়ে যাবে সেটাকেও ব্যক্তি নিজেই অনুভব করতে পারবে।

পক্ষান্তরে যদি কোন বস্তুকে নিজের কাছে রেখে দেন বা ব্যবহার করেন, তাহলে নিঃসন্দেহে তা বৈধ ছিলো। আর হয়তো মুহাজির বোনের জন্য এ জিনিসের প্রয়োজনও ছিলো। কিন্তু এ বোন নিজের প্রয়োজনের দিকে খেয়াল করে যখন রেখে দিলো, তখন আস্তে আস্তে এটা জমা করার খারাব অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। যে বোনের প্রয়োজন সেওতো মুহাজির, একজন মুজাহিদের ঘরওয়ালী। কিন্তু দিলের মধ্যে যখন একবার দুনিয়ার মহব্বত চলে আসে, তারপর সে অন্তর বলতে থাকে যে, এটার প্রয়োজন, সেটার প্রয়োজন আরো কত কী!

এরপর এ নফস বলতে থাকে যে, হয়তো আজকে এ জিনিসের প্রয়োজন নেই কিন্তু কালতো প্রয়োজন হতে পারে। আজকে অন্যকে দিয়ে দিলে কাল তোমার কি অবস্থা হবে? তাই আজকে জমা করে রাখো! আর এভাবেই আখেরাত থেকে দুনিয়ার দিকে দৃষ্টি ফিরতে থাকে।

এজন্যে আমার মা ও বোনেরা!

দৃষ্টিকে সর্বদা আখেরাতের দিকে রাখা উচিত। মুজাহিদ কেন দৃষ্টি আখেরাতের দিকে রাখবেন না? আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের সকলের আমলের হেফাজত করুন!

ছোট বয়স থেকে বৃদ্ধা হওয়া পর্যন্ত জিহাদের ময়দানে ছুটে বেড়িয়েছেন এমন অনেক বড় বড় লোকদেরকে দেখেছি। তাদের পুরা জীবন জিহাদের ময়দানে কাটিয়েছেন। কিন্তু যখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশা অন্তর থেকে বের হয়ে গেছে, আল্লাহর সাক্ষাতের বিশ্বাস অন্তর থেকে নিঃশেষ হয়ে গেছে, পরকাল বরবাদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে - তখন অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত চলে এসেছে, দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে গেছে।

তাদেরকে আমরা দেখেছি যে দুনিয়াকে সে লাথি মেরেছিলো। আবার তারাই মুর্দা দুনিয়াকে পুনরায় জমা করছে। এতটাই জমা করতে শুরু করেছে যে – যে ব্যক্তি দ্বীনের জন্য জীবনবাজী রেখেছিলো, সে দ্বীনকে দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রি করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়ে গেছে। দ্বীনকে বিক্রি করে দিয়েছে, দ্বীনকে সওদা বানিয়ে নিয়েছে। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দ্বীনের সাথে গাদ্দারী করে দুনিয়ার সম্পদ অর্জন করেছে। নিজের দুনিয়াকে

সাজিয়েছে, নিজের সন্তানদের জন্য মনোরম মহল তৈরী করেছে। আখেরাতকে বিক্রি করে দুনিয়াকে ক্রয় করে নিয়েছে। অথচ এ লোকতো সেই ব্যক্তি যে, আখেরাতের জন্য দুনিয়া এবং নিজের সম্পদকে লাথি মেরেছিলো। এ দুনিয়াকে অন্যদের হাতে সোপর্দ করেছিলো আর আখেরাতকে গ্রহন করেছিলো। কিন্তু বেচাকেনার এ চুক্তিকে ধরে রাখতে পারেনি।

নিছক চুক্তি বা ওয়াদা নয়, তার বাস্তবায়নও করা চাই:

চুক্তি করা এটা হলো অর্ধেক ক্রয় করা। কেননা আল্লাহর বাণী-

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহেঃ অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য।

[সুরা তাওবা ৯:১১১]

উক্ত আয়াতে কারীমাতে প্রথমে যে চুক্তির কথা বলা হয়েছে এভাবে -

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।

[সুরা তাওবা ৯:১১১]

এটাতো একটা চুক্তি, চুক্তি যে কেউ করতে পারে। কিন্তু সফলকাম তো সেই ব্যক্তি-

وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ

আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক?

[সুরা তাওবা ৯:১১১]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই চুক্তিকে পুরা করে। অর্থাৎ এখানে যে চুক্তি করেছিলো যে, হে আল্লাহ্! জান আপনার আর জান্নাত আমার। আমি জান দিয়ে দিবো আর আপনি জান্নাত দিবেন। যখন এই জান্নাতের থেকে দৃষ্টি সরে গিয়ে দুনিয়ার প্রতি নিবন্ধ হয়ে যায় তখন সে ভাবতে থাকে যে, আমার নিকট দামি দামি গাড়ি থাকা চাই, সুন্দর সুন্দর বাড়ি হওয়া চাই, আমার সন্তানের নিকট এটা ওটা থাকা দরকার, আমার এই সেই আসবাবপত্র হওয়া দরকার। তখন সে এ চুক্তিকে আর পূর্ণ করতে পারে না। আর যখন সে এ চুক্তিকে পুরা করতে পারে না, তখন সে কামিয়াবীও হতে পারে না। কামিয়াবী ও সফলতা তার জন্য সে ব্যক্তি চুক্তি করেছে এবং সে চুক্তিকে পূর্ণ করতে পেরেছে।

وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য।

[সুরা তাওবা ৯:১১১]

অর্থাৎ যে এ চুক্তিকে পুরা করবে সুসংবাদ তার জন্য। খোশখবরী আর মোবারকবাদ ও সফলতা তার জন্য। দুনিয়াকে বিসর্জন দিয়ে যে আল্লাহকে বলে, আল্লাহ্ দুনিয়া আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি তাই আপনি আমাকে আখেরাত দিয়ে দিন এবং এর উপর অটল থাকে সেই সফলকাম। আর যে চুক্তি করেছে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়েছে - অর্ধেক রাস্তায় চলার পর বলে, "আল্লাহ্! আমাকে আমার দুনিয়া ফেরত দিয়ে দিন" – সে ব্যর্থ। এখন বলুন - যখন দুই পক্ষ কোন চুক্তি করে বা ওয়াদা করে এবং মাঝপথে কোন পক্ষ এ চুক্তিকে ভঙ্গ করে তাহলে অপর পক্ষের নিকট কেমন লজ্জাকর মনে হয়? আল্লাহ্ তা'য়ালাতো মহা পবিত্র সত্ত্বা, তিনিতো সবচে' বেশি সম্মানিত সত্ত্বা! তার সাথে কেউ একটা চুক্তি করে আর সে মাঝপথে চুক্তিকে ভেঙ্গে দিয়ে চলে যায়, সে চুক্তিকে পূর্ণ না করাটাতো অনেক বড় বরবাদীর কারণ।

আল্লাহর মহব্বত; কতটুকু আছে?

সুতরাং আমার মা ও বোনেরা!

সর্বদা এ বিষয়ে ভয় করা উচিৎ। প্রত্যেক মানুষ তার নিজের অবস্থা ভালো করেই জানে, অন্যকে বলে দিতে হয়না। প্রত্যেক বোনেরা তার নিজের

সম্পর্কে খুব ভালো জানে যে, আল্লাহ্ তা'য়ালার সাথে তার সম্পর্ক কি পরিমাণ! যখন সে ربى الله এবং সেজদার মধ্যে سبحان ربى الاعلى বলতে থাকে তখন আল্লাহর মহব্বতের স্বাদ কতটুকু অনুভূত হয়?

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন-নামায মু'মিনের জন্য মে'রাজ। মে'রাজ কাকে বলে?

মে'রাজতো এমন যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় মাহবুবে হাক্বিকীর সাথে সাক্ষাত করেছেন। তাই আল্লাহ্ তা'য়ালা ঈমানওলাদেরকে তার সাথে সাক্ষাতের এক মাধ্যম দিয়েছেন। এখন একটু চিন্তা করে দেখুন তো! অন্তরে যদি কারোর মহব্বত থাকে, উদাহরণ স্বরূপ: সন্তানের ভালোবাসা, ভাই ও বোনের ভালোবাসা, স্বামীর ভালোবাসা। আর যদি কখনো তাদের সাক্ষাতের জন্য যাওয়া হয় অথবা সে সাক্ষাতের জন্য আসে তাহলে তো সাক্ষাতের পূর্বেই তার মহব্বত ও ভালোবাসা সকলেই অন্তরে অনুভব করে থাকে। এটাই হলো মহব্বত ও ভালোবাসা যা সাক্ষাতের পূর্বেই তার স্বাদ আস্বাদন করিয়ে দেয়।

যেহেতু আমাদের দাবী হলো দুনিয়াতে আমাদের সবচেয়ে ভালোবাসা ও মহব্বতের পাত্র হলো আল্লাহ্ তা'য়ালা। তাই যখন আল্লাহ্ তা'য়ালার সাথে সাক্ষাত করতে যাই এবং নামাযে দাড়াই তখন আমাদের অবস্থা কেমন হয়?

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- বান্দা সেজদার মধ্যে আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়। অথচ সেজদার মধ্যে সত্যিকারের প্রিয় সত্ত্বার সাথে যখন আমাদের সাক্ষাত হয় এবং ' سبحان ربى الاعلى ' কখনো

তিনবার, কখনো পাঁচবার বা সাতবার পড়ছি কিন্তু একবারও স্বাদ অনুভব করতে পারি না। হওয়া দরকার ছিলো এমন, যখন سبحان ربی এই "ربی" (আমার প্রতিপালক) বলার সময় এতটাই মজা বা আনন্দিত হওয়া যাতে করে 'রব্বী' বলাকে দিল শেষ করতে না চায়। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা করা প্রয়োজন যে, 'ربی' কে? 'ربی' তো সেই সত্ত্বা যার সাথে সবচেয়ে বেশি মহব্বত রয়েছে। এমনকি আমার জীবনের চাইতেও বেশি। নিজের সন্তান, পিতা-মাতার থেকেও বেশি মহব্বত রয়েছে। سبحان ربی الاعلی বলার সময় স্বাদ অনুভব করা উচিত। এমন মজা ও স্বাদ অনুভব করা যে, অন্তর বা দিল সেজদাহ থেকে উঠতেই চায় না। আমাদের পূর্বসূরীদের সেজদাহ্ তো এমন-ই ছিলো। 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা' বলার সময় স্বাদ অনুভব করা উচিত।

আমার মা ও বোনেরা!

এই স্বাদ কিভাবে অর্জন করতে পারি? এ স্বাদতো তখনই অর্জিত হবে যখন সর্বদা দিলের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে থাকবো। আর যদি আমরা আমাদের দিলের প্রতি সর্বদা খেয়াল রাখতে পারি, তাহলে যদি কখনো গাফলত সামনে চলে আসে তো সে গাফলত সম্পর্কে অবগত হতে পারবো।

উদাসীনতা ত্যাগ করা চাই;

আর আল্লাহর ওলী তো সেই ব্যক্তি-ই হতে পারে যে উদাসীনতাকে মরণের চাইতে বেশি ভয় করে। মরণ তাদের জন্য অনেক সহজ কিন্তু উদাসীনতা তার থেকে অনেক যন্ত্রনাদায়ক। যদি সে উদাসীনতা আল্লাহর জিকির থেকে হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য অন্তর ছটফট করতে থাকে, কান্না করতে

থাকে। এত বেশি কান্না করেন যে, নিজেকে শেষ করে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। আল্লাহ্ যেন আমাদের সকলকে গাফলত বা উদাসীনতা থেকে হেফাজত করেন। সর্বদা নিজের দিলের অবস্থা পর্যবেক্ষন করা চাই, কখনো যেন উদাসীন না হয়ে থাকি।

'ইসার' তথা নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অন্যের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেওয়াঃ

যেখানেই কোন আসবাবপত্র বা জিনিস সেখানেই 'ইসার' চলে আসে। 'ইসার' বলা হয় এমন প্রয়োজনকে যাহা একদিকে আমার নিজের প্রয়োজন, অন্যদিকে আমার বোনেরও প্রয়োজন। কোন বিষয়ে আমার আরামের বা প্রশান্তির দরকার, কিন্তু আমার বোনেরও সে প্রশান্তির দরকার। এক্ষেত্রে আল্লাহর ভালোবাসার তাকাজা বা দাবি হলো, 'ইসার' এর দাবী হলো নিজের আরাম বা প্রশান্তিকে, নিজের প্রয়োজনকে কুরবানী করে দেওয়া। কেননা আপনি যে হিজরত করেছেন, সেটা নিছক নিজের জন্য করেননি। আমাদের এ জিহাদ ফি-সাবীলিল্লাহ্ শুধুমাত্র আমাদের জন্যই নয়। জিহাদের উদ্দেশ্য হলো সমস্ত উম্মতে মুসলিমাকে হেদায়েতের পথে নিয়ে আসা, সকল মানুষকে হেদায়েতের উপর নিয়ে আসা।

অর্থাৎ মুজাহিদ (আল্লাহর সৈনিক) নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে, স্বীয় দুনিয়াকে বিসর্জন দিয়ে সকল উম্মাহর ফিকির করছে। আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত এ জন্যই মুজাহিদের অধিক পরিমাণ সুযোগ সুবিধার কথা বর্ণনা করেছেন। তাই আপনার হিজরত শুধুমাত্র আপনার জন্য নয়, বরং পুরা উম্মতের জন্য।

আপনি পুরা উম্মতের জন্য নিজের সবকিছুকে ত্যাগ করেছেন। হিজরত করতে গিয়ে অনেক তিক্ততা আস্বাদন করেছেন! তাহলে আপনার মুহাজির বোনের সাথে দুনিয়াবী বিষয়ে কেন মিলেমিশে থাকবেন না। আপনি মুহাজির বোনের সাথে এ সকল বিষয় নিয়ে চিন্তা-ফিকির করবেন। ছোট কোন বিষয় নিয়ে তার সাথে লড়াই করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়, এটা ভালো কাজ নয়। এ জন্য অত্যন্ত জরুরী হলো যে, আমাদের মাঝে 'ইসার' তথা অন্যের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি করা। সাথে থাকা বা বরাবর থাকা এটা এক একিনী মাসয়ালার বিষয়। কিন্তু যেখানে আখেরাতে সবকিছু পাওয়ার বিষয়ে অবগত হয়েছি, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করাই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, উম্মাহর উপকার পৌঁছানোই উদ্দেশ্য, নিজের কষ্টের বিনিময়ে উম্মতের আরামের ব্যবস্থা করা উদ্দেশ্য, সেক্ষেত্রে এ মুহাজির বোনতো আপনারই এক বোন - যে আপনার সাথে হিজরত করেছে। এখনতো হক্ক ও দাবী হলো যে, তার সাথে উত্তম আচরন করা। তার সাথে মুহাব্বতের ব্যবহার করা, বোনের সাথে ক্ষমা-সুন্দর ব্যবহার করা। এরাই আপনার উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক দাবীদার।

আর আল্লাহ্ তা'য়ালা যে বিষয়টি 'ইসারের' মাঝে রেখেছেন তা হল - আল্লাহ্ তা'য়ালা এর অনের ফজিলত বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা মহব্বতের আলোচনায় সবার উপরে স্থান দিয়েছেন 'ইসার' এর ভালোবাসাকে। যার মধ্যে দানশীলতার বৈশিষ্ট্য থাকবে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত তাকে মহব্বত করবেন।

সাধারণত যে সকল বিষয় মানুষকে নষ্ট করে দেয়, সেগুলোর ব্যাপারে

মানুষের খবর থাকেনা। মূল বিষয় হলো নফস থেকে উদাসীন হয়ে যাওয়া। নফস এর খারাবী থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করা। এর থেকে আমাদেরকে উদাসীন না হওয়া চাই। এক মূহুর্তের জন্য অন্তরে এ খেয়াল না করা চাই যে, আমিতো হিজরত করেছি। তাই এখন আর নফস সম্পর্কে সতর্ক থাকার কোন প্রয়োজন নেই। এমনিভাবে চলতে চলতে ঐ সময় চলে আসবে যে, আমাদের জিন্দেগী দুনিয়াদার মহিলাদের মতো হয়ে যাবে। যেভাবে সে ঘরের সাজ-সজ্জার জন্য সবকিছুকে জমা করে, এগুলোর মহব্বত যেমন তার অন্তরে স্থান করে নিয়েছে – আমাদের অবস্থাও তেমন হয়ে যাবে।

এক তো হলো এমন কিছুকে জমা করা যার প্রয়োজন রয়েছে। নিঃসন্দেহে তা পরিমাণে বেশিও হতে পারে। হযরতে সাহাবায়ে কিরাম (রা.)দেরকে আল্লাহ্ অনেক কিছু দিয়েছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ: খায়বারের বিজয়ের পরে উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের ভাগে অনেক কিছু এসেছিলো, কিন্তু তারা সেগুলোকে কি করেছেন?

দুনিয়ার মহব্বতের নিশানাঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তেকালের পরে বিশেষতঃ উমার (রা.) এর যুগে মুসলিমদের অনেক প্রশস্ততা আসে। কিন্তু সেগুলোর মহব্বত তাদের অন্তরে স্থান পায়নি। ধনী সাহাবাদের মতো ধনী সাহাবীয়াও ছিলেন, কিন্তু সে ধনের মহব্বত তাদের দিলের মধ্যে ছিলো না। আসল কথা হলো- এগুলোর মহব্বত দিলের মধ্যে না আনা উচিত। আর মহব্বত এসে

যাওয়ার নিদর্শন হলো- সম্পদকে জমা করতে থাকা এবং আখেরাতের জন্য ব্যয় না করা। নিজের প্রয়োজনকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়, অথচ ভাই বোনের খবর না নেওয়া। সে নিজের আরামের ব্যবস্থা করে, কিন্তু অন্যের আরামের চিন্তা করে না। এগুলোই হলো দুনিয়ার মহব্বত অন্তরে স্থান দেওয়ার আলামত বা নিশানা।

এমন অবস্থা হয় যে, হিজরত এবং জিহাদ করা সত্ত্বেও পুনরায় দুনিয়ার ভালোবাসা অন্তরে স্থান করে নেয়, আমরা দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ে যাই। স্মরণ রাখা দরকার যে, পূর্ব থেকে পশ্চিম এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত আমরা মুসলিমরা যতটা ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছি অন্য কেউ হয়নি। এতটা নির্বোধ কেউ নেই আমরা যতটা নির্বোধ। আমরা না আল্লাহকে পেলাম আর না মূর্তিকে। আমরা না এদিকে না ওদিকে। যদি দুনিয়ার মহব্বতই রাখতে হয়, তাহলে দুনিয়া ছেড়ে দেওয়ার কি প্রয়োজন ছিলো? কিন্তু আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'য়ালা অনেক বড় করুনা আর মেহেরবানী যে, তিনি আমাদেরকে নির্বাচিত করেছেন।

আমার বোনেরা!

এটা কোন চিন্তার বিষয় নয় যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা আপনার এক একটা কুরবানীর বিনিময়ে, এক একটা কদমের বিনিময়ে, প্রতিটি দুঃখ-বেদনার পরিবর্তে, এক একটা পেরেশানীর জন্য জান্নাতের মাঝে এমন সব নিয়ামত রেখেছেন, যা দেখে কিয়ামতের দিন তামান্না বা আকাঙ্খা করবেন যে, হে আল্লাহ্! যদি তুমি আমাকে দশটা জীবন দিতে! আমাকে দশটা দুনিয়া দিতে! আর আমি সবকিছুকে আপনার রাস্তায় কুরবানী করে আসতাম!

আমি কোন কাতারের লোক? দেখে নিন

এখন চিন্তা করা বিষয় যে, কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেখানে উপস্থিত থাকবেন, হযরতে সাহাবায়ে কেরামগণ থাকবেন, আরো থাকবেন উম্মুল মু'মিনীন ও উম্মাহাতুল মু'মিনীন, উপস্থিত থাকবেন সকলেই। কাতার বা লাইনে দাড়াবে সকলেই। প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ আমল অনুযায়ী লাইনে দাড় করানো হবে। এ দুনিয়াতে যে যার সাথে ছিলো কিয়ামতের দিন তার সাথেই তাকে উঠানো হবে। যদি আমরা এ দুনিয়াকে গ্রহন করে নেই, এ দুনিয়াকে অর্জন করে নেই বা পছন্দ করি, দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ে যাই, তাহলে চিন্তা করুন- কিয়ামতের দিন কি ধরনের অপমানিত হতে হবে?

সেখানে ভাই কি কাজে আসবে? আর স্বামী কি উপকারে আসবে? কোন সন্তান উপকারে আসবে? না-কি কোন জাতি তার উপকারে আসবে? সে কেউ কোন উপকারে আসবেনা।

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ﴿٣٤﴾ وَ اُمِّهٖ وَ اَبِيْهِ ﴿٣٥﴾ وَ صٰحِبَتِهٖ وَ بَنِيْهِ ﴿٣٦﴾
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ﴿٣٧﴾

সেদিন পলায়ন করবে মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে, তার মাতা, তার পিতা, তার পত্নী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে। সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। [সুরা আ'বাসা ৮০:৩৪-৩৭]

কিন্তু আমার বোনেরা!

একটাই তো জিন্দেগী, আল্লাহ্ এ জিন্দেগীকে কবুল করে নেন। এ আমলকে কবুল করে নেন। চিন্তা করুন তো! নিঃসন্দেহে আমরা অনেক পেরেশানীতে রয়েছি। নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই, হতাশার কোন কারণ নেই। নিজ বাড়িতে হাজারো রকমের নিয়ামত দেখেছি, কোন রকমের দুঃখ-কষ্ট অনুভব করিনি।

কিন্তু আমার বোন!

আপনার এই কুরবানি শুধুমাত্র আল্লাহর দ্বীনের জন্য এবং এমন সময় যখন আপনাকে আল্লাহর প্রয়োজন ছিলো। মানুষেরা আল্লাহর দ্বীনকে একাকী ছেড়ে দিয়েছিলো, পুরুষেরা শক্তি থাকা সত্ত্বেও, ইলম্ থাকা সত্ত্বেও, অর্থ-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সম্মানিত শরীয়তের জিহাদী ঝান্ডাকে ছেড়ে দিয়েছে। ঠিক সেই মূহুর্তে তোমরা এ ঝান্ডাকে আকড়ে ধরেছ, তোমরাই পুরুষকে সাহস যুগিয়েছ, তোমরাই নিজেদের সন্তানকে জিহাদের জন্যে উৎসাহ দিয়েছ। তোমরাইতো স্বামীকে জিহাদের ময়দানে পাঠিয়েছ। মহা শক্তিমান আল্লাহর শপথ! তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে স্বাগত জানাবেন। হাউজে কাউসারে তোমাদেরকে স্বয়ং স্বাগত জানাবেন।

তাই আমার বোনেরা!

এ দুনিয়ার পেরেশানী কোন পেরেশানী না। শীতের প্রকোপ অবশ্যই কষ্টের, গরমের প্রখরতাও অবশ্যই বেদনার। কিন্তু জাহান্নামের গরমের কথা একটু স্মরণ করুন। সে জাহান্নামের ঠান্ডার বিষয়টির চিন্তা করুন, কিয়ামতের বিভীষিকার কথা মনে করুন। সেখানে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের সামনে

দাড়াতে হবে। যার সাথে ভালোবাসার ওয়াদা হয়েছে, যার জন্য আমরা কালিমা পড়ি এবং একটি চুক্তি করেছি, لا اله الا الله এর অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই' বলে থাকি।

কারোর সাথে কারোর মহব্বত হলে কোন ভূলের কারণে সে তাকে মারবে এ ভয় থাকে না। বরং অপমানিত হওয়ার ভয় থাকে - যে কিভাবে তার সামনে উপস্থিত হবো? তার সাথে মহব্বতের ওয়াদা করেছি অথচ সে ওয়াদা অনুযায়ী কাজ করিনি। তার ভালোবাসার হক্ক আদায় করতে পারিনি এবং তার সাথে গাদ্দারী করে চলেছি। তাহলে কিয়ামতের দিন কিভাবে সে প্রিয় রবের সামনে দাড়াবো?

জান্নাত ও জাহান্নামের ফয়সালাতো পরের কথা। কোন ভদ্রলোক এটা কিভাবে মেনে নিতে পারে যে, তার কোন সম্মানিত আত্মীয় যার সাথে তার অনেক মহব্বত রয়েছে, আর সে তার আত্মীয়র সাথে গাদ্দারী করেছে। এরপর তার সামনে কিভাবে মাথা উঁচু করবে? কিভাবে তার সামনে দাড়াবে?

তাই আল্লাহর সামনে দাড়ানোর ভয় করা উচিত। আর যে ব্যক্তি এই দাড়ানোর ব্যাপারে ভীত থাকে, সে সফলকাম।

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ • فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।

[সুরা নাজিয়াত ৭৯:৪০-৪১]

আমার বোনেরা!

এ সকল কুরবানীর বিনিময়ে ইনশা আল্লাহ্ আল্লাহর রহমতের আশা করি। আমাদের আমল নিঃসন্দেহে ছিটা-ফাটা, ভূলে ভরা, আমরা এর হক্ককে ঠিকমত আদায় করতে পারিনি। আল্লাহ্ তা'য়ালা যে অনুগ্রহ আমাদের উপর করেছেন তার কৃতজ্ঞতা বা শুকরিয়া আদায়ে কমতি করেছি। কিন্তু আল্লাহ্ জানেন যে, আমরা দুর্বল, শক্তিহীন। আল্লাহ্ স্বীয় রহমতের দ্বারা আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন এবং হাশরের ময়দানে তিনি আমাদেরকে তার পছন্দের লোকদের সাথে উঠাবেন ইনশা আল্লাহ।

আল্লাহ্ সালেহীনদের সাথে আমাদের উঠাবেন, আল্লাহ্ সাহাবীয়াদের সাথে উঠাবেন, সাহাবীয়াদের সাথে হাশর করাবেন ইনশা আল্লাহ। যার হাশর সাহাবীয়াদের সাথে হবে তার জন্য দুনিয়ার এ ঠান্ডা গরম কি মনে হতে পারে? মাটির কাঁচা ঘরে থাকা কোন দোষনীয় নয়, দুনিয়ার মানুষের ভয় এটাও দোষনীয় কিছু নয়। যে ব্যক্তি নিজেকে আখেরাতের ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারলো তার থেকে বড় সফল কে? যিনি কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মেহমান হবে, হাউযে কাউসারে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে তাকে স্বাগত জানাবেন, তার থেকে বড় কামিয়াব কে হতে পারে?

জেগে উঠুন!

আমার বোনেরা!

নিঃসন্দেহে বড় কুরবানীর সময় এসেছে; আল্লাহ্ আপনাদের কুরবানীকে কবুল করে নিন। আপনাদের পুরুষদের তুলনায় এত বেশি কুরবানী করা

দরকার, যাতে করে পুরুষদের এ অভ্যাস হয়ে যায়, তারবিয়্যাত হয়ে যায়, যে মা ও বোনেরা যারা কি-না ঘর থেকে বের হয় না তারা যদি দ্বীনের জন্য, জিহাদের জন্য এতটা উজ্জীবিত হয়, তাহলে আমাদের কেমন হওয়া দরকার! এটাতো আল্লাহ্ তা'য়ার বিশেষ অনুগ্রহ যে, শক্তিহীন হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'য়ালা আপনাদেরকে দৃঢ় থাকার তাওফিক দিয়েছেন, আল্লাহ্ আপনাদেরকে এ রাস্তার মজবুতী দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা এজন্য পুরুষদের থেকে অনেক বেশী ফজিলত আপনাদের জন্য রেখেছেন। আপনাদের জন্য আল্লাহ্ অনেক কিছু রেখেছেন। সুতরাং সেগুলোকে সংরক্ষণ করা দরকার।

গোধুলী লগ্নে হৃদয়ের আকুতি!

পরিশেষে এ কথা বলতে চাই যে, আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত আমাদেরকে কবুল করে নেন। আল্লাহ্ তায়ালা এ জীবনকে এমনভাবে কবুল করে নেন, পুনরায় যেন দুনিয়ার ফাঁদে না পড়ে যাই, পুনরায় দুনিয়ার মহব্বত অন্তরে স্থান না পায়। আমাদের কারণে কোন বোনের যেন কষ্ট না হয়। দুনিয়ার ফিতনা আমাদের উপর আবার যেন পতিত না হয়। যদি এভাবে আমাদের হায়াত শেষ হয়ে যায় তাহলে দুনিয়াতেও সফল এবং কিয়ামতের দিনও সফল ইনশা আল্লাহ্! ছুম্মা ইনশা আল্লাহ্!! আল্লাহর রহমতে উম্মুল মু'মিনীন হযরতে আয়েশা রা. সহ সকল উম্মাতুল মু'মিনীনদের সাথে আপনার হাশর হবে।

একটি স্বপ্ন!

এ ব্যাপারে কয়েকজন বোন স্বপ্নে দেখেছেন যে, তার ঘরে একটি বাচ্চা এসে

বললো যে, নিচে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রা. আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সেখানে গিয়ে দেখে গাড়ির ড্রাইভিং সিটে হযরত আয়েশা রা. বসে আছেন এবং সে বলছেন যে, আমি আপনার নিকট এসেছি জনৈক শহীদের আহলিয়ার সাথে সাক্ষাত করতে তার বাড়িতে যেতে। তারপরে সে বাচ্চাকে কাধে তুলে দিয়ে বললেন যে, বাচ্চাটিকে আপনার কাছে রাখেন। এমন আরো অনেক স্বপ্ন আছে।

আপনাকে খোদ আমদেদ!

এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে খোশখবরী যে, আপনার এ রাস্তা হক্ব বা সত্য। আর এটাতো সাহাবীওয়ালা রাস্তা যে পথে আপনি চলতেছেন। আপনি কোন নফসের খাহেশাত বা চাহিদা পূরণে এ কুরবানী দেননি, বিনা কারণে আপনি কুরবানী করেননি। এক একটা কষ্ট, এক এক কদম, এক একটা পেরেশানী, এক একটা বিচ্ছেদ আপনাকে সর্বদা এমন মিলনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যে মিলনের মধ্যে কখনো বিচ্ছেদ হবেনা। আর এ দুনিয়ার মিলন কিসের মিলন? দুনিয়ার বিচ্ছেদ কতটুকু? যেখানে মানুষ ধোঁকা দেয়, যেখানে মানুষ ঠকবাজী করে, মানুষ যেখানে একনিষ্ঠ বা মুখলিস হয়না। কিয়ামত এবং আখেরাতই হলো আসল বা বাস্তব। আখেরাতের মিলনই আসল মিলন, সেদিন যে মিলে যাবে সেটাই হবে আসল মিলন, সেদিন যে সাথী হবে, সেই হবে আসল সাথী। ঐদিন তার সাথে যার হাশর হবে সেই হবে সফলকাম।

তাই আমার বোনেরা!

এ কুরবানী আর ত্যাগ আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত অবশ্যই কবুল করে নিবেন।

আপনাদের কুরবানীর বিনিময়ে দুনিয়াতে ইসলামের পতাকাকে সমুন্নত করবেন। আপনাদের পেরেশানীর বিনিময়ে উম্মতের শান্তির ব্যবস্থা করবেন। উম্মতের নারীদের প্রশান্তি দান করবেন। এ জন্য শুকরিয়া আদায় করা দরকার এবং সর্বদা ভীত থাকা প্রয়োজন যে, শয়তান এবং নফস যেন আমাদের আমলকে বিনষ্ট করে না দেয়। আমাদেরকে আখেরাতের রাস্তা থেকে উদাসীন করে না দেয়।

একটি জরুরী মূলনীতি!

ইবাদাতের সাথে সাথে আমাদের লেনদেনও পরিষ্কার হওয়া জরুরী। বোনদের সাথে আমাদের লেনদেন সাফ হওয়া চাই। একে অপরের মঙ্গল কামনা করা চাই। যেহেতু আমরা সকলেই মানুষ, আর মানুষের উপর গাফলতী আসতেই পারে। যদি আমি মনে করি যে, আমার কাছে অনেক ইলম রয়েছে, আমিতো সবকিছুই জানি, আমিতো তাফসীরের কিতাব অধ্যয়ন করি তাই আমার কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই। এটা খুবই খারাব ধারণা।

সাহাবায়ে কেরামগণ এমন ছিলেন না। যেহেতু প্রত্যেকেই মানুষ, আর মানুষ উদাসীন হতেই পারে। এক্ষেত্রে জরুরী হলো যদি কোন বোন কোন বিষয়ে গাফেল থাকে বা ভূলে যায়, তাহলে অন্য বোনেরা তাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। কিন্তু স্মরণ করিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এ উসূলটি সর্বদা প্রযোজ্য যে, যিনি দায়ী হবেন অর্থাৎ যিনি দাওয়াত দেন, সে কখনো রাগ হয় না। সে দিলের মধ্যে এমন ব্যথ্যা নিয়ে দাওয়াত দিবে, যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'য়ালা এরশাদ করেন-

﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

যদি তারা এই বিষয়বস্তুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তাদের পশ্চাতে সম্ভবতঃ আপনি পরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করবেন।

[সুরা কা'হফ ১৮:৬]

যদি তারা ঈমান আনয়ন না করে তবে আপকি কি এদের পিছনে নিজেকে হালাক করে দিবেন? ধ্বংস করে দিবেন?

এমন ব্যথা বা দরদ থাকা চাই, এমন জ্বালাপোড়া থাকা চাই। যদি কোন বোনের মধ্যে অবসাদ বা উদাসীনতা দেখা যায়, যদি কোন বোনের মধ্যে কোন বিষয়ে অসতর্কতা পরিলক্ষিত হয়, তবে তাকে এমন ভাবে সতর্ক না করা যা দাওয়াতে উসূলের খেলাপ এবং তার কাছে কষ্টের মনে হয়। বরং দিলে ব্যথা নিয়ে উত্তম থেকে উত্তম পন্থায় ঐ বোনকে বোঝানো যে, হে বোন এটাতো শরীয়তের খেলাপ আর আমিতো বিষয়টিকে এভাবে শুনেছি। মহব্বতের সাথে দাওয়াত দেওয়া চাই, উত্তম পন্থায় দাওয়াত হওয়া চাই। দ্বীনতো হীত কামনার নাম, দ্বীনতো মঙ্গল কামনার নাম। একে অপরকে যখন এভাবে সতর্ক করতে থাকবো তাহলে যদিও কোন ভূল হয়ে যায় সেটাও দূর হয়ে যাবে। আর আল্লাহ্ তা'য়ালার সাথে সম্পর্ক করা খুব-ই জরুরী।

জান্নাতের কোথায় থাকতে চান!

হিজরত এবং জিহাদের ময়দানে পা রাখার পরে জান্নাতের কোন নিচের স্তরের উপর রাজি যাওয়া এটাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বুখারীর এক হাদিসে

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-

إنّ في الجنّةِ مائَةَ درجةٍ أعدّهَا اللّه للمُجَاهِدينَ في سبيلِ اللّه مَا بيْن الدّرجَتَينِ كَمَا بيْنَ السّمَاءِ والأَرْض

জান্নাতে একশত স্তর রয়েছে যা মুজাহিদীনদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। প্রতিটি স্তরের দুরুত্ব আসমান ও জমীনের মতো ব্যবধান।(বুখারী)

তাই যখন তোমরা জান্নাতের দোয়া কর, তখন জান্নাতের উচ্চ স্তরের জন্য দোয়া কর যেখান থেকে নহর সমূহ প্রবাহিত হয়।

বোনেরা আমার!

যেহেতু এতটাই করেছি, এত পেরেশানীতে সাতার কেটেছি, এতটা কুরবানী করেছি তাই জান্নাতের নিচু স্তরের উপর সন্তুষ্ট না হওয়া চাই। স্বামীকে আগে যেতে না দেওয়া, তার সাথে সাথে দৌড়ানো। সূরা মুতাফ্ফিফীনে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন-

وَ فِیۡ ذٰلِکَ فَلۡیَتَنَافَسِ الۡمُتَنَافِسُوۡنَ ﴿۲۶﴾

এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত।

(সুরা মুতাফফিফীন ৮৩:২৬)

প্রতিযোগিতার ময়দানতো এটাই, একে অপরের আগে যাওয়ার ময়দানতো এটাই। সাহাবীয়া রা. কখনো তাদের স্বামীদের থেকে পিছনে থাকার চিন্তা করতেন না। এ জন্য ইতিহাসে এমন ঘটনা দেখা যায় যে, একদিন

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে এক সাহাবীয়া হাজির হয়ে বললেন যে, “হে রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! পুরুষেরা তো জিহাদে গিয়ে আখেরাতের দিকে আগে চলে যাচ্ছে আর আমরা পিছনে থেকে যাচ্ছি”। এই ছিল তার চিন্তা।

আসলে আমাদেরও এমন ফিকির থাকা চাই। আল্লা হ্ রাব্বুল ইজ্জতের জান্নাতের দরজার দিকে দৌড়ের প্রতিযোগীতা করুন।

আল্লাহ আপনাদের উচ্চ দরজার দিকে দৌড়ানোর তাওফিক দান করেন। নিচু দরজার উপর যেন আমাদেরকে রাজি না বানান।

আল্লাহ আপনাদের উপরের দিকে দৌড়ানেওয়ালা বানিয়ে দিন। ফেরদাউসে আ’লা-র স্থানে আমাদেরকে যাওয়ার তাওফিক দান করুন।

আল্লাহ্ তা’য়ালা আমাদের এ কুরবানীকে কবুল করে নিন। রিয়াকারী হওয়া থেকে আল্লাহ্ আমাদের হেফাজত করুন। আত্ম-অহমিকা থেকে আমাদের হেফাজত করুন। শুধুমাত্র তার সন্তুষ্টির জন্যই আমাদের এবং আমাদের ঘরের লোকদের আল্লাহ্ কবুল করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামিন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

ইসলাম প্রতিষ্ঠায় নারীর অবদান

শাইখ ইউসুফ আল উয়াইরি রহিমাহুল্লাহ্

সকল প্রশংসা আল্লাহ তালার জন্য, দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসুল ﷺ এবং তার সকল সাহাবীর (রাঃ) প্রতি।

প্রিয় বোন!

নিশ্চয়ই তোমার বিরাট গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা রয়েছে। তোমার উচিত এই দায়িত্বকে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ইসলামের এই নতুন যুদ্ধে পেশ করা, যে যুদ্ধে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রগুলি এক হয়ে গেছে। বোন! আমি তোমাকে এ পৃষ্টাগুলিতে সম্বোধন করে কিছু বলতে চাই। আর তা কিছুটা দীর্ঘ হবে। কিন্তু এ দীর্ঘতা বিষয়বস্তুর গুরুত্বের কারণেই। যার জন্য এর কয়েকগুণ বেশি পৃষ্টার প্রয়োজন। সুতরাং শোন, আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করুন।

বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ বিভিন্ন ধরণের লাঞ্চনা-বঞ্চনার শিকার, যার কোন সীমা নেই। আর তা এতো ব্যাপকভাবে অতীতে কখনো হয়নি। আর এ লাঞ্ছনা-বঞ্চনা এজন্য নয় যে, এ জাতি সংখ্যায় কম বা আর্থিকভাবে দুর্বল। বরং এ জাতিকে পুথিবীর সংখ্যাগরিষ্ট জাতি হিসেবে গণ্য করা হয়। আর একমাত্র এ উম্মতই আল্লাহ প্রদত্ত বিপুল ধনভান্ডারের অধিকারী। যা তার শত্রুদের কাছে নেই। কিন্তু বিবেকের কাছে প্রশ্ন হল, সেটি কোন কারণ যার দরুণ এ জাতি ধনে-জনে সমৃদ্ধ হওয়ার পরেও আজ চরম লাঞ্চনার শিকার।

আমরা বলি, সেই কারণটি নবী করীম ﷺ আমাদের জন্য চিহ্নিত করে দিয়েছেন। যেমন, মুসনাদে আহমদ ও আবু দাউদে হযরত সাওবান (রাঃ)

হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেনঃ "শীঘ্রই জাতিগুলো চতুর্দিক হতে তোমাদেরকে গ্রাস করবে। যেভাবে খাবারের লোকমাকে পাত্রের চতুর্দিক হতে গ্রাস করা হয়"। তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল ﷺ! এটা কি আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে? তিনি বললেনঃ তোমরা তখন সংখ্যায় অধিক হবে। কিন্তু তোমরা স্রোতে ভেসে যাওয়া খড়কুটার ন্যায় হবে। তোমাদের শত্রুরদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় চলে যাবে এবং তোমাদের অন্তরে ওহান সৃষ্টি হবে"। তিনি বলেন, আমরা বললাম, ওহান কী? তিনি বললেনঃ "বেঁচে থাকার প্রতি লোভ ও মৃত্যুকে অপছন্দ করা।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'জিহাদকে অপছন্দ করা। এটাই হল সেই কঠিন প্রশ্নের উত্তর যা নবী করীম ﷺ তা সংগঠিত হওয়ার প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে দিয়ে গেছেন। আর সেই ব্যাধি যা উম্মতকে ধ্বংস করে দিয়েছে তা হল, দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা ও মৃত্যুকে ভয় করা। উম্মত যখন দুনিয়াকে ভালবাসতে লাগলো ও মৃত্যুকে অপছন্দ করতে শুরু করলো, তখন তাকে চেপে বসলো সেই মন্দ গুণ যা দ্বারা আল্লাহ তাআলা ইহুদিদেরকে গুণান্বিত করেছেন। তুমি তাদেরকে জীবনের প্রতি সবচেয়ে লোভী পাবে"। -আল কোরআন

হায়াত শব্দটি এখানে নাকেরা (অপরিচিত) হিসেবে এসেছে যা যে কোনো ধরণের জীবনকে বোঝায়। তা অপমানের জীবনই হোক বা হাইওয়ান তথা জানোয়ারের জীবনই হোক। ফলে উম্মত এক নিকৃষ্টমানের জীবনকে আঁকড়ে ধরেছে। যা তার ও দ্বীনের জন্য লজ্জাজনক। আর এগুলো সবই দুনিয়ার

প্রতি লোভ ও ভয়ের কারণে।

দুনিয়ার প্রতি আমাদের ভালবাসা ও মৃত্যু বা জিহাদের প্রতি ভয়ের অনিবার্য ফল হল এ যে, জিহাদ ছেড়ে দেওয়া। যাকে মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ লোক বিশেষ করে নারীরা এটাকে অবধারিত মৃত্যুও দুনিয়া ছাড়ার পথ মনে করে। ফলে মুসলিম উম্মাহ যখন জিহাদকে ছেড়ে দিল, তখন তাদের দুশমনরা তাদের উপর চড়াও হল এবং তারা লাঞ্চনা ও চরম অপমানে নিপতিত হল। আর রাসুল ﷺ এর সেই পবিত্র বাণী বাস্তবায়িত হল, যা আহমদ ও আবু দাউদে ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি রাসুল ﷺ কে বলতে শুনেছিঃ "যদি তোমরা ইনা বিক্রি কর, ষাড়ের লেজ ধরে থাক এবং কৃষি কাজে লিপ্ত থাকার কারণে জিহাদ পরিত্যাগ কর তবে আল্লাহ তোমাদের উপর এমন অপমান চাপিয়ে দেবেন যে, যতক্ষণ না তোমরা দ্বীনের উপর পূর্ণরূপে প্রত্যাবর্তন করবে ততক্ষণ আল্লাহ তোমাদের থেকে ঐ অপমান দূর করবেন না।

উপরে বর্ণিত হাদিসগুলো দ্বারা আমাদের কাছে সেই ব্যাধি বা কারণ স্পষ্ট হয়ে গেছে যা রাসুল ﷺ চিহ্নিত করেছেন। আর তা হল ওহান এবং এর পরিণামও স্পষ্ট হয়ে গেছে। আর তা হল বিশ্বের সকল জাতির পক্ষ থেকে আমাদের উপর লাঞ্ছনা ও অবমাননা। বর্ণিত ভাষ্যের মাঝে মনোনিবেশ করলে আমরা মুক্তির পথ সম্পর্কে জানতে পারি। আর তা হল, লাঞ্ছনা থেকে

মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে জিহাদে ফিরে যাওয়া এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাকে ভালবাসা এবং দুনিয়া ও তার চাকচিক্যকে পরিহার করা।

নারী জিহাদের পথে কখনো অন্তরায় আর কখনো চালিকাশক্তি হয়

কিন্তু আমরা একথা আত্মস্থ করার পরও জিহাদই হল একমাত্র ব্যবস্থাপত্র যা রাসুল ﷺ আমাদের জন্য সমস্যার সমাধান হিসেবে চিহ্নিত করে দিয়েছেন, আমরা তার উপর আমল করতে পারছিনা। তাই আমাদের কর্তব্য হল সে ব্যবস্থাপত্রের উপর আমল করার পথে অর্থাৎ জিহাদের পথে ব্যক্তি পর্যায়ে যে অন্তরায় রয়েছে তা খুঁজে বের করা। জিহাদের পথে বাঁধা বা অন্তরায়ের মূল কারণসমূহ যা আল্লাহ তা'আলা সূরা তওবার এক আয়াতের মধ্যে বলেছেন তা হল, বল তোমাদের নিকট যদি তোমাদের সন্তান, পিতা, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর - আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত; আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।

এগুলো হল জিহাদের পথের অন্তরায়সমূহের মৌলিক বিষয়াবলী যা থেকে অসংখ্য শাখাপ্রশাখা বের হয়। চিন্তার বিষয় হল, এ প্রিয় বস্তুগুলোর

ভালবাসা কিভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের এবং সেই জিহাদের উপর জয়ী হয় যা উম্মতের মর্যাদার পথ। কেননা যখন একথা আমাদের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস হবে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ এবং জিহাদের ভালবাসা এসব প্রিয় বস্তু হতে বড় ও জরুরী, তখন অনিবার্যভাবেই আমরা তা বাস্তবে আমলে আনার চেষ্টা করব যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ ও জিহাদের মর্যাদা এসকল বস্তু থেকে বেশি। আর এটাই উম্মতের সন্তানদেরকে তাদের জীবন ইসলাম ও মুসলমানদের মর্যাদার জন্য উৎসর্গ করতে প্রস্তুত করবে। আর এর দ্বারা ওহানের ময়লা দূর হবে। অতঃপর কুফফার জাতি কখনো এ উম্মতের উপর চড়াও হতে পারবেনা। তাদের এ কথা জানার কারণে যে, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এমন পুরুষরা রয়েছে যারা মৃত্যুকে এমনভাবে ভালবাসে যেমন ভালবাসে বাচঁতে এবং এ উম্মতের মাঝে এমন ব্যবসায়ীরা রয়েছে যারা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যে সকল সম্পদ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত যেভাবে আবু বকর (রাঃ) প্রস্তুত ছিলেন এবং তাদের মধ্যে এমন মায়েরা রয়েছে যারা নিজেদের সন্তান জিহাদ থেকে পিছপা হওয়াতে সন্তুষ্ট নয়।

এসকল খ্যাতিগুলো যখন এ উম্মতের অর্জন হয়ে যাবে তখন আল্লাহর দুশমনরা হাজারবার হিসাব কষবে এ উম্মতকে প্রাধান্য দেবার জন্য। এ পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা সেই অন্তরায়গুলোকে বিস্তারিতভাবে টেনে আনবো না। তবে আমরা একটি অন্তরায় সম্পর্কে আলোচনা করবো যেটিকে এ উম্মত থেকে দ্রুত দূর করা জরুরী বলে আমরা মনে করি। আর সেই অন্তরায়টি হল যে, নারী হয়তো মা হবে বা স্ত্রী বা মেয়ে বা বোন হবে। আর এরা সবাই

আয়াতের উল্লিখিত অন্তরায়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর নারীরা অন্তরায় হওয়ার প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনা এ থেকে অপ্রাসঙ্গিক নয়। বরং আমরা এখানে নারীকেই সম্বোধন করবো এবং তাকে অবগত করবো যে সেও ইসলামের বিজয়ের পথে বড় একটি অন্তরায়। আমরা যখন বলেছি যে, নারী ইসলামের বিজয়ের পথে বড় একটি অন্তরায় পক্ষান্তরে আমাদেরকে এটাও বুঝতে হবে যে, নারী ইসলামের বিজয়ের জন্য বিরাট এক প্রভাবক শক্তিও বটে। তবে এ শর্তে যে, সে তার ভূমিকাকে বীরত্বের সঙ্গে পেশ করবে। যেমনটি আমরা সামনে কতিপয় অনুস্মরণীয় মহিলাদের পবিত্র জীবনী বর্ণনা করবো।

এ পৃষ্ঠাগুলোতে আমাদের নারীদের সম্বোধন করার কারণ হলঃ আমরা দেখেছি নারী যখন কোন বিষয়ে যত্নশীল হয় তখন পুরুষের জন্য তা সম্পাদন করা সহজ হয়ে যায়। আর যখন সে কোন বিষয়ে বিরোধী হয় সেটা বিরাট বাঁধা হয়ে যায়। বিশেষ করে সে নারীটি যখন কোন মা বা দাদি হন তখন তো তাঁর সেবা ও সন্তুষ্টি জরুরি।

নারীরা যেহেতু পুরুষের আশ্রয়স্থল এবং মাল ও আওলাদের হেফাযতকারীনী। এজন্য আমরা নারীকে পৃথকভাবে বিশেষ করে আহ্বান করছি যাতে ইসলাম ও কুফর শক্তির মাঝে সংগঠিত যুদ্ধে তারা নিজেদের সক্রিয় ভূমিকাটি রাখতে পারেন। পক্ষান্তরে নারীরা যখন নিজের ভূমিকা (দায়িত্ব) হতে পিছপা হবে, তখন তাই হবে যা এই উম্মতের পরাজয়ের

প্রথম ধাপ ও ধ্বংসের কারণ। যেমনটাতে বর্তমানে এ উম্মত নিপতিত হয়েছে।

ইসলামের গৌরবময় যুগগুলোতে কাফেরদের দেশসমূহে ইসলাম বিজয়ী হয়েছে অথচ কাফেররা ধনে জনে অধিক ছিল। আর তা এজন্যই সম্ভব হয়েছিল যে, তখন নারীগণ দায়িত্বশীল ছিলেন। এবং তারা নিজ সন্তানদেরকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের তরবিয়ত দিতেন এবং পুরুষেরা জিহাদে বের হলে তাঁরা নিজ চরিত্র সম্ভ্রম ও সম্পদের হেফাজত করতেন। নিজে ধৈর্য ধরতেন এবং নিজ সন্তান ও স্বামীকে ধৈর্য ধারণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। ফলে তা জনৈক ব্যক্তির কথার ন্যায় হল, "প্রত্যেক মহান ব্যক্তির পিছনে একজন নারী রয়েছেন।" বর্তমানে তা মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোয্য হয়। সুতরাং আমরা বলবোঃ প্রত্যেক মহান মুজাহিদের পিছনে একজন নারী ছিলেন। এবং সেই নারীগণ নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে জানতেন ও সেই গুণ অর্জন করেছিলেন যা নবী করীম ﷺ বর্ণনা করেছিলেন। যেমনঃ মুসনাদে তিনি আহমদ ও তিরমিযীতে হযরত ওমর রাঃ হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ কে প্রশ্ন করেছিলেন যে, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমরা কোন সম্পদ গ্রহণ করবো? তিনি বলেনঃ তোমাদের কেউ যেন কৃতজ্ঞ হৃদয়, যিকিরকারী জিহ্বা এবং আখেরাতের কাজে সাহায্যকারী স্ত্রী গ্রহণ করে।"

আর বর্তমান যুগের নারীদের সম্পর্কে কি বলবো! তাদেরকে কোন গুণে ভূষিত করবো? আর তাদের দায়িত্ববোধই বা কি? আখেরাতের কাজে স্বামীদের প্রতি তাদের কি কোন সহযোগিতা আছে? আর তারা কি বর্তমান সময়ে ইসলাম ও কুফর শক্তির মাঝে সংগঠিত যুদ্ধ সম্পর্কে কোন ধারণা রাখে? নাকি তারা কুফরি রাষ্ট্রগুলোকে চিনে?

আর তারা কি জানে প্রতিটি দেশে মুসলমানরা কি বিপদে রয়েছে? এখন তারা ব্যস্ত। কিসের জন্য ব্যস্ত? ফ্যাশনের আর সাজসজ্জার পিছনে ব্যস্ত। বরং তাদের একদল নিয়োজিত রয়েছে হারামের মাঝে এবং তারা বিভিন্নভাবে ইসলামের বিপরীতে তাঁর শত্রুদেরকেই সাহায্য করছে।

তদুপরি আমরা উম্মতের মুক্তির জন্য তাদের অংশগ্রহণের আশাবাদী। তাই আমরা নিয়োজিত হয়েছি ইসলামের ক্ষতি ও ধ্বংসাত্মক কার্য থেকে নারীদের হাতকে রুখতে। শত্রুরা ভালো করেই বুঝেছে যে, নারীগণ উম্মতের মেরুদন্ড, যখন এরা নষ্ট হবে তো তাদের প্রজন্মও নষ্টই হবে এবং আশপাশের পরিবেশও নষ্ট হবে। তাই তারা নারীদের স্বাধীনতার নামে অশ্লীলতার দিকে আহ্বান করছে। আর তারাও তাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছে। আহ! আল্লাহ ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই আর আল্লাহর শক্তি ছাড়া কোন শক্তি নেই।

বর্তমান এই প্রতিযোগিতামূলক লড়াইয়ে তোমার অনুপস্থিতিই থাকে, যদি শুধু তোমার একার অনুপস্থিতিই থাকত তাহলে বিষয়টি ততটা জটিল হতনা। তখন আমরা পুরুষের ক্ষেত্রে আশাবাদী থাকতাম। কিন্তু বর্তমানের এই প্রতিযোগিতা থেকে তোমার অনুপস্থিতির সাথে পুরো উম্মতই অনুপস্থিত থাকছে। সুতরাং কে যুবককে সেই যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করবে? পুরুষের পাশে কে দাঁড়াবে সেই যুদ্ধে তাঁকে সাহস যোগানোর জন্য?

তোমার পর সেই পথ অতিক্রম করার জন্য সামনে আগমণকারিণী মায়েদের কে প্রস্তুত করবে? এ প্রশ্নের ও এরকম আরো দশটি প্রশ্নের উত্তরে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, নারী বর্তমান এই প্রতিযোগিতায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁর উপস্থিতি অতি জরুরি। নারী এ প্রতিযোগিতায় সম্পূরক নয় বরং তাঁর উপস্থিতি সাহায্যের আশ্রয়সমূহ হতে একটি ও পথের পাথেয়।

এজন্যই হে মুসলিম বোন!

তোমার বোঝা উচিত যে, তোমার গুরুত্ব তোমার ধারণা থেকে অনেক বেশি। বর্তমানে ইসলামের পরাজয়ের বড় একটি দায় তোমার উপরও বর্তাবে। কেননা তুমি যদি তোমার দায়িত্ব আদায় করতে তাহলে উম্মত এ লাঞ্চনার শিকার হতনা। বলতে পারো যে, কেন এ দায় আমার উপর বর্তাবে। আমরা বলবো তোমার প্রথম দায়িত্বটা যদি তুমি সঠিকভাবে আদায় না কর, তাহলে পরবর্তী চেষ্টাগুলো সাধারণত ফলপ্রসূ হয়না। শিশু তোমার কোলেই বেড়ে

উঠে আর তোমাকে ছাড়া তার আর কোন ভালবাসা আছে কিনা তা সে জানেনা। সুতরাং তুমি যখন তার কোমল হৃদয়ে আল্লাহ ও তার রাসুল ﷺ এবং তার পথে জিহাদের বীজ বপন করবেনা তখন পূর্ণবয়সে তার হৃদয়ে কেউ অতি কষ্ট ছাড়া সেই বীজ বপন করতে পারবেনা। সুতরাং বোন তুমি নিজ ভূমিকা সম্পাদন কর এবং দুই দশক পর তার ফলাফল দেখ।

বর্তমানে ইসলাম ও অন্যান্য কুফরি ধর্মগুলার মধ্যে সংগঠিত যুদ্ধে বিশেষ করে নতুন এই ক্রুসেড যুদ্ধে যাতে আমেরিকার নেতৃত্বে পূর্ণ বিশ্ব এক হয়েছে। এতে নারীর ভূমিকা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আমরা ইসলামের স্বর্ণযুগের কতিপয় মুজাহিদা নারীর ভূমিকা বর্ণনা করব। আর মুসলিম মহান নারীগণের যে দৃষ্টান্তগুলো বর্ণনা করবো এ বিষয়ে এগুলোই যে সকল দৃষ্টান্ত তা নয়। বরং এগুলো হল সেই বীর মুজাহিদদের মা, বোন ও স্ত্রীদের একটি দিক মাত্র। পূর্ববর্তী মুসলিম নারীদের ন্যায় যদি বর্তমান মুসলিম নারীদের মধ্যেও সেরকম ত্যাগ, সততা ও দ্বীনের জন্য ভালবাসা থাকতো তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় ইসলাম সাহায্যপ্রাপ্ত ও বিজয়ী হত।

পূর্ববর্তী কতিপয় মুজাহিদা নারীদের দৃষ্টান্ত।

প্রিয় বোন!

এখন যাদের অবস্থা বর্ণনা করবো, আশা করি তুমি তাদের অনুকরণ করবে,

যেন সেই মঙ্গল অর্জন করতে পারো যা তাদের ও তাদের সময়ে দ্বীনের অর্জন হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তারাই হলেন অনুকরণের যোগ্য। প্রিয় মুসলিম বোন! তোমার জন্য ঐসব বেহায়া, কুলাঙ্গার ও দেহব্যবসায়ী নারীদের মাঝে কোন আদর্শ নেই। তুমি যদি জানতে চাও যে, তুমি কে? তাহলে উনাদের দিকে তাকাও যাদেরকে তুমি অনুসরণ করছো। আর তুমি যদি উম্মতের অবস্থা জানতে চাও, তাহলে উম্মতের নারীরা যাদের অনুকরণ করছে তাদের দিকে তাকাও। তারা যদি মহান মুজাহিদা, সত্যবাদী, আনুগত্যকারিণী, এবাদতকারিণী, ধৈর্যশীলা, রোজাদার নারীদের অনুকরণ করে তাহলে উম্মত বিজয় লাভ করবে। আর তারা যদি লম্পট, অবিশ্বাসী, মিথ্যাবাদী, পথভ্রষ্টা নারীদের অনুকরণ করে তাহলে এটা হবে উম্মতের জন্য অনিবার্য ও চরম ক্ষতি।

আর বর্তমানে আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা ও আশ্রয় চাচ্ছি। ইসলামের প্রথম যুগে নারীরা যুদ্ধের ময়দানে প্রবেশ করেছেন। এটা তখন পুরুষের স্বল্পতার জন্য নয়। বরং তা দ্বীনের উত্তম প্রতিদান এবং দ্বীনের মহব্বত ও আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ হওয়ার তামান্নায়ই হয়েছিল। আর এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় সে বর্ণনা অনুযায়ী যা ইমাম আহমদ রঃ হাশরজ বিন আল আশজায়ী থেকে এবং তিনি তার দাদি থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেনঃ আমি ও আরো পাঁচজন নারী রাসুল ﷺ এর সঙ্গে খায়বর যুদ্ধে বের হলাম। এ খবর রাসুল ﷺ এর নিকট পৌঁছল যে তার সঙ্গে নারীরা রয়েছে। রাসুল ﷺ আমাদেরকে ডেকে পাঠালেন ও বললেনঃ

কোন জিনিস তোমাদেরকে বের করেছে? আর কার আদেশে তোমরা বের হয়েছ? আমরা বললামঃ আমরা তীর সংগ্রহ করে দিব, লোকদেরকে পানি, ছাতু পান করাবো। আমাদের সঙ্গে আহতদের চিকিৎসার উপাদান রয়েছে তা দ্বারা চিকিৎসা করবা এবং কবিতা আবৃত্তি করে আল্লাহর রাস্তায় সাহায্য করবো। তিনি বললেন, উঠ! এবং ফিরে যাও। অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা খায়বরের বিজয় দান করলেন, তখন পুরুষদের ন্যায় আমাদের জন্যও গণীমতের অংশ বের করলেন। আমি বললামঃ দাদি! আপনাদের জন্য কী বের করেছিলেন? তিনি বলেনঃ খেজুর। এভাবে জিহাদের প্রতি নারীর প্রগাঢ় ভালবাসা ও দ্বীনের জন্য উৎসর্গ হওয়ার যজবাই তাদের সেই পর্যন্ত পৌছিয়েছিল যে, এক পর্যায়ে তারা রাসুল ﷺ এর নিকট জিহাদে বের হওয়ার আবেদন পেশ করলেন।

যেমন বুখারী ও সুনানে নাসায়ীতে হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেনঃ ওহে আল্লাহর রাসুল! আমরা কি আপনার সঙ্গে বের হয়ে জিহাদ করবোনা? কেননা কুরআন মাজীদে জিহাদের চেয়ে উত্তম কোন আমল দেখিনা। তিনি বললেনঃ না, তবে তোমাদের জন্য উত্তম জিহাদ হল আল্লাহর ঘরের হজ্জ করা, হজ্জে মাবরুর। তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে যে, পূর্বসূরী নারীগণ দ্বীনের প্রতি তাদের অধিক ভালাবাসার কারণে নিজেরা জিহাদে যাওয়ার অনুমতির আশা করতেন।

আর আমরা বর্তমান নারীদের দেখছি যে, তারা চায় আল্লাহ তাআলার বাণী (তোমাদের উপর জিহাদ ফরয করা হয়েছে) যদি নাযিল না হতো, বিশেষ

করে যখন তারা জানে যে, নিজের ছেলে, ভাই, পিতা বা স্বামী আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে দ্বীনের সাহায্যার্থে জিহাদের পথে বের হচ্ছে। এটাই বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি করেছে পূর্বসূরী নারী ও বর্তমান যুগের নারীদের মাঝে। পূর্বসূরী নারীগণ পুরুষদের বের করে দিতেন যাতে তারা সকল কুফরি ধর্মগুলোর উপর বিজয় লাভ করতে পারে আর বর্তমান যুগের নারীরা তাদের পুরুষদেরকে বের করে দেয় যাতে তারা গরু, পাথর, বৃক্ষ পূজারী ও খৃস্টানদের দাস হতে পারে। এমনকি তারা অপমানজনক জিযিয়া (কর) দিতেও প্রস্তুত। আহ! আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন আশ্রয় নেই।

প্রিয় বোন!

আমরা প্রথমেই তোমার সামনে সেই মহান নারীর দৃষ্টান্ত পেশ করবো যার মর্যাদা হাজারো পুরুষের চেয়ে বেশি। যাতে তুমি তাদের সুন্দর আদর্শে সজ্জিত হতে পার। সেই গুণাবলীর এক দশমাংশও যদি বর্তমান মহিলাদের মাঝে থাকতো তাহলে আমাদের একটি অধিকারও নষ্ট হত না। সেই বীর মুজাহিদা হলেন **উম্মে আম্মারাহ নাসীবাহ বিনতে কাব আল আনসারী রাঃ** শিয়ারে আল'আমিন নুবালাতে তার জীবনীতে এসেছে। তিনি বলেনঃ উম্মে আম্মারা বাইয়াতে আকাবা, উহুদ, হুনাইন ও ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং জিহাদের ময়দানে বিরাট ভূমিকা রেখেছিলেন। জিহাদে তার হাত কাঁটা গিয়েছিল।

ওয়াকিদী বলেনঃ তিনি নিজ স্বামী গুযাইয়া বিন আমর এবং তার ছেলের সঙ্গে উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি পানি পান করাতেন, তার সঙ্গে অস্ত্র ছিল। তিনি যুদ্ধ করেছেন এবং আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। যুমরা বিন সাঈদ আল মাযিনী তার দাদি যিনি উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তার থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (দাদি) বলেনঃ আমি রাসুল ﷺ কে নাসীবা বিনতে কাবের অবস্থান সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, সে আজ অমুক অমুক হতে উত্তম অবস্থানে আছে। এবং তিনি তাঁকে কোমরে কাপড় বেঁধে কঠিন যুদ্ধ করতে দেখেছেন। এমনকি তিনি তেরটি আঘাতপ্রাপ্ত হন।

তিনি বলতেন আমি দেখছিলাম যে, ইবনে কিময়া তার গায়ে আঘাত করছিল। আর এটাই তার বড় আঘাত ছিল। তিনি এক বছর পর্যন্ত সেটির চিকিৎসা করেন। অতঃপর যখন রাসুল ﷺ হামবাউল আসাদের দিকে যাওয়ার নির্দেশ দেন তখন তিনি রক্ত ক্ষরণের জন্য উঠতে পারছিলেন না। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং রহম করুন। উম্মে আম্মার (রাঃ) বলেনঃ আমি উহুদ যুদ্ধে নিজে দেখেছি যে লোকেরা রাসুল ﷺ এর কাছ থেকে সরে পড়েছে। দশজনের একটি দল ছাড়া কেউ অবশিষ্ট নেই, আমি ও আমার দু ছেলে এবং আমার স্বামী তাঁর সামনে থেকে আঘাত প্রতিহত করছিলাম আর লোকেরা পলায়ন করছিল। তিনি ﷺ দেখলেন আমার কাছে কোন ঢাল নেই, অতঃপর তিনি পলায়নরত এক ব্যক্তির কাছে ঢাল দেখতে পেলেন এবং তাকে বললেনঃ যে যুদ্ধ করছে তাকে তোমার ঢালটি দিয়ে দাও। ফলে সে তার ঢালটি নিক্ষেপ করলো আর আমি তা উঠিয়ে আনলাম এবং রাসুল ﷺ

হতে আক্রমণ প্রতিহত করছিলাম। অশ্বারোহীরা আমাদের উপর কঠিন আক্রমণ করেছিল। তারা যদি আমাদের ন্যায় পদাতিক হতো তাহলে ইনশা আল্লাহ তাদেরকে ঠিকভাবেই পাকড়াও করতাম।

অশ্বারোহী এক ব্যক্তি আমার দিকে অগ্রসর হয়ে আমার উপর আঘাত করল, আমি তা প্রতিহত করলাম। ফলে আমার কোন ক্ষতি হয়নি। অতঃপর আমি তাকে ধাওয়া করলে সে পালিয়ে যেতে লাগল। আমি তার ঘোড়ার পায়ের গোছায় আঘাত করলে সে মাটিতে পড়ে যায়। তখন রাসুল ﷺ চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলেনঃ (হে উম্মে আম্মারার ছেলে! তোমার মা, তোমার মা) অর্থাৎ তাকে সাহায্য কর।

তিনি বললেনঃ তারা আমাকে সাহায্য করেছে। এমনকি কাবু করে ফেলেছি অতঃপর আমি তার মৃত্যুর ঘ্রাণ পেয়েছি। ওয়াবিদী উম্মে আম্মারার ছেলে আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি উহুদের যুদ্ধের দিন আমি একটা আঘাত প্রাপ্ত হয়েছি, তখন রক্ত বন্ধ হচ্ছিলনা। তখন রাসুল ﷺ বলেনঃ তোমার জখমটাতে পট্টি বেধে নাও। তখন আমার মা আমার দিকে আসলেন। তার সঙ্গে কিছু পট্টি ছিল। আর নবী কারীম ﷺ দাঁড়ানো। তিনি বললেনঃ হে উম্মে আম্মার! তুমি যা করতে সক্ষম হয়েছ কে তা করতে সক্ষম হবে? অতঃপর আমার ছেলের আঘাতকারী অগ্রসর হল। তখন রাসুল ﷺ বললেনঃ এই লোকটি তোমার ছেলের আঘাতকারী। তিনি

বললেনঃ অতঃপর আমি অগ্রসর হয়ে তার পায়ের গোছায় আঘাত করলাম। এতে সে হাঁটু গেড়ে পরে গেলো। তখন রাসুল ﷺ কে মুঁচকি হাসতে দেখলাম এমনকি আমি তাঁর দাঁত দেখেছি। অতঃপর আমি তাঁর নিকট আসলাম। তখন রাসুল ﷺ বললেনঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি তোমাকে বুদ্ধিমত্তার অধিকারী করেছেন।

বিন ইয়াহইয়া বিন হিব্বান হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মুহাম্মাদ উম্মে আম্মারা উহুদ যুদ্ধে বারটি আঘাত প্রাপ্ত হন এবং ইয়ামামার যুদ্ধে তার হাত কাঁটা যায়। আর হাত ছাড়াও তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি এগারটি আঘাত প্রাপ্ত হন। এসব জখম নিয়ে তিনি যখন মদিনায় আসলেন তখন আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) কে দেখা গেছে। (তখন তিনি খলিফা ছিলেন)। তার কাছে এসে তিনি ও তার ছেলে সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। তার ছেলে হাবিব বিন যায়েদ বিন আসেম যাকে মুসায়লামা শহীদ করেছিল। তার আরেক ছেলে আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ আল মাযিনী যিনি রাসুল ﷺ এর ওযু বর্ণনা করেছেন, তরবারি দিয়ে মুসায়লামাতুল কা্যাবকে হত্যা করেছিলেন।

তিনি তার সিফাতুস সফওয়া নামক কিতাবে তার সম্পর্কে এসেছে যে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) রাসুল ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেনঃ উহুদ যুদ্ধের দিন আমি যে দিকেই দৃষ্টি দিয়েছি সে দিকেই তাকে আমার কাছে থেকে যুদ্ধ করতে দেখেছি। আল ইসাবা নামক কিতাবে (৪/৪১৮) তার

সম্পর্কে এসেছে। ওয়াকীদী উল্লেখ করেছেন, যে নাসীবা বিনতে কাবের কাছে যখন মুসায়লামার হাতে তার ছেলে হাবিব বিন যায়দ এর হত্যার খবর পৌঁছেছে তখন তিনি আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করলেন যে, হয় তিনি মুসায়লামাকে হত্যা করবেন না হয় তার কাছেই মরবেন। অতঃপর তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে খালেদ বিন ওয়ালিদ রাঃ এর সঙ্গে আপন ছেলে সেই আব্দুল্লাহ রাঃ সহ অংশগ্রহণ করেন ও মুসায়লামাকে হত্যা করেন, যুদ্ধে তার হাত কাটা যায়।

ইবনে হিশাম তার 'যিয়াদাত উম্মে সাঈদ বিন কবির সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ আমি উম্মে আম্মারার নিকট গেলাম ও তাকে বললাম হে খালা! আমাকে কিছু শুনান। তিনি বলেনঃ আমি (উহুদ যুদ্ধের দিন পানির মশক নিয়ে বের হলাম এবং একবারে রাসুল ﷺ এর নিকট চলে গেলাম, তখন যুদ্ধের পরিস্থিতি মুসলমানদের অনুকুলে ছিল। অতঃপর যখন পরিস্থিতি প্রতিকুল হয়ে গেল, আমি রাসুল ﷺ এর সামনে থেকে সরাসরি যুদ্ধ করতে লাগলাম এবং রাসুল ﷺ এর উপর যে আক্রমণ আসছিল তা তরবারি দ্বারা প্রতিহত করছিলাম। উম্মে সাঈদ বিনতে সাআদ বিন রাবীকে বলেনঃ আমি তাঁর গায়ে গর্ত দেখতে পেলাম অতঃপর বললাম, আপনাকে আঘাত কে করেছিল? তিনি বলেনঃ ইবনে কিময়া।

এ হলেন সেই বীর বাহাদুর মুজাহিদাহ উম্মে আম্মারা। আসলেই তিনি যা

পেরেছেন কে তার ক্ষমতা রাখে? যেখানে পুরুষরাই রাসুল ﷺ এর সঙ্গে ধৈর্যশীল ও অটল থাকতে পারছিলেন না সেখানে নারীরা কিভাবে পারবে। কিন্তু হে বোন! আল্লাহর রাস্তায় তার এই বীরত্ব, ত্যাগ, অটলতা, সাহসিকতা ও ধৈর্য তোমার জন্য কখন আদর্শ হবে?

প্রিয় বোন!

তোমার কাছে একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত পেশ করছি, যা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যের পথে নারীরা ত্যাগ, কুরবানির প্রতি ইঙ্গিত করছে। তিনি মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন এবং যুদ্ধের ময়দানেও প্রবেশ করেছিলেন, পুরুষদেরকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করতেন, এগুলো সবই দ্বীনের ভালোবাসা ও ইসলামের সাহায্যের জন্য। আর এ উত্তম দৃষ্টান্ত হল হযরত উম্মে সুলাইম রাঃ এর। তার সম্পর্কে হায়াতুস সাহাবাতে (১/৫৯৭) এবং সিফাতুস সাফওয়াতে (২/৬৬) এসেছে যে তিনি আল্লাহর দ্বীনের প্রতি উৎসর্গ হয়ে হুনাইনের যুদ্ধের দিন ময়দানে প্রবেশ করেন, তার সাথে একটি খঞ্জর ছিল। উম্মে সুলাইম রাঃ কে এ অবস্থায় দেখে আবু তালহা রাঃ হেসে হেসে রাসুল ﷺ এর কাছে এসে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কি উম্মে সুলাইমকে দেখেছেন যে, তার সাথে খঞ্জর রয়েছে? তখন রাসুল ﷺ তাকে লক্ষ্য করে বললেনঃ হে উম্মে সুলাইম! তুমি এটা দ্বারা কী করবে? তিনি বললেনঃ আমি ইচ্ছা করছি তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি আমাদের কাছে আসে তাহলে তাকে এটা দ্বারা আঘাত করবো। অন্য রেওয়ায়াতে এসেছে আমি এটা নিয়েছি মুশরিকদের মধ্য থেকে কেউ যদি আমাদের নিকট আসে

তাহলে আমি এটা দ্বারা তার পেট ফেরে দিব। তখন রাসুল ﷺ হাঁসতে লাগলেন।

আমার দ্বীনী মুজাহিদা বোন!

এখানে আরেকটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি। এতে রয়েছে রুহের খোরাক, যা আমাদের মহিলাদের খুবই প্রয়োজন। আমরা মনে করিনা যে কোন পুরুষ তার পিছনে এমন নারী আছে জানার পর জিহাদ থেকে পিছপা হবে। আর দৃষ্টান্তটি হলঃ রাসুল ﷺ এর ফুফু সুফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব, আল ইছাবাতে (৭/৭৪৪) তার সম্পর্কে এসেছে যে, তিনি বলেনঃ "রাসুল ﷺ যখন খন্দকের যুদ্ধে বের হন, তখন নারীদেরকে 'উতম' নামক দূর্গে রেখে যান। এটাকে ফারাও বলা হয়। হাসসান বিন ছাবিত রাঃ কে তাদের দেখাশুনার দায়িত্ব দেন। তিনি বলেনঃ অতঃপর একটি ইয়াহুদি দুর্গে আরোহণ করে ও আমাদের দিকে উকি দেয়। তখন আমি হাসসান বিন ছাবিত রাঃ কে বললামঃ উঠ, এই ইহুদিকে হত্যা কর। তিনি বলেন যদি তা (ক্ষমতা) আমার মাঝে থাকত তাহলে তো আমি নবী করিম ﷺ এর সঙ্গেই (যুদ্ধে) থাকতাম। কেননা তিনি অতি বৃদ্ধলোক ছিলেন। তিনি বলেনঃ তখন আমি উঠে একটি খুঁটি নিলাম এবং দূর্গ থেকে নেমে সেই ইয়াহুদিকে হত্যা করলাম এবং তার মাথা কেটে নিলাম ও তারপর হাসসান বিন ছাবিত রাঃ কে বললাম এটা ইয়াহুদিদের মাঝে নিক্ষেপ করুন। তারা ছিল দূর্গের নিচে। তিনি বললেনঃ আল্লাহর শপথ, এটা কী? তিনি বলেন, অতঃপর আমি তা

নিয়ে ইয়াহুদিদের মাঝে নিক্ষেপ করলাম। তখন তারা বললোঃ জানতে পারলাম যে, এ ব্যক্তি তার পরিবার বর্গের মাঝে কাউকে না রেখেই ছেড়ে যায় নি। অতঃপর তারা বিভক্ত হয়ে যায়। ইনিই প্রথম কোন মুশরিককে হত্যাকারী মহিলা। ইবনে সাআদ তা আবু উসামা হতে বর্ণনা করেছেন। আর পুরুষদের তিনি শুধু যবান দ্বারাই জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন নাই এবং পুরুষদের যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করে নাই তাদেরকেই উদ্বুদ্ধ করেন নাই বরং গাজীদেরকেও উদ্বুদ্ধ করেন যারা শত্রুর উপর বিজয়ী হতে পারেন নাই। তার সেই উদ্বুদ্ধকরণ ছিল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা। আল ইসাবাতে হাম্মাদের সূত্রে এসেছে, তিনি শিহাব ও তার পিতা হতে যে, উহুদ যুদ্ধের দিন মুসলমানরা ছুটাছুটি করছিল, তখন সুফিয়া হাতে বর্শা নিয়ে এলেন, তা দিয়ে তিনি তাদের মুখে মারছিলেন, তখন নবী করীম ﷺ বললেনঃ হে যুবাইর! সাবধান! মহিলা। তার ধৈর্য্য ও সহনশীলতা পাহাড়ের ন্যায়। আল ইসাবাতে এসেছে যে, হযরত হামযা রাঃ যখন শহীদ হলেনঃ তখন সুফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব তার ভাইকে দেখার জন্য আসলেন, তখন যুবাইর রাঃ এর সঙ্গে তার সাক্ষাত হল। তিনি বলেন, হে মহিলা! রাসুল ﷺ তোমাকে ফিরে যেতে বলেছেন। তিনি বলেন কেন? আমি জেনেছি তাকে বিকৃত করা হয়েছে। আর আল্লাহর জন্য এর থেকে অধিক কোন জিনিস আমাদেরকে অধিক সন্তুষ্ট করাবে? অবশযই আমি ধৈর্য্যধারণ করবো এবং সন্তুষ্ট হব ইনশাআল্লাহ। তখন যুবাইর রাঃ এসে নবীজীকে জানালে তিনি বলেন তাকে আসতে দাও। তখন তিনি আসলেন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। অতঃপর তাঁকে দাফন করা হল।

হে আমার দ্বীনী বোন!

এটা তোমার জন্য আরেকটি আদর্শ। তাই আমাদের নারীরা সেখানে কখন পৌঁছাবে, যেখানে তারা পৌঁছেছেন? ত্যাগ ও উৎসর্গের ক্ষেত্রে। এ আদর্শটি হল আসমা বিন্তে ইয়াযিদ বিন সাকানের যিনি মুয়াজ বিন জাবাল রাঃ এর ফুফু ছিলেন। তার সম্পর্কে সিআরে আ'লামিন নুবালাতে (২/২৯৭) এসেছে যে, তিনি বায়াত গ্রহণকারী মুজাহিদা নারী। তিনি ইয়ারমুকের দিন তার তাঁবুর খুঁটি দিয়ে ৯ জন রোমক কাফেরকে হত্যা করেছিলেন।

প্রিয় বোন!

এভাবে নিয়ে উল্লেখিত মুজাহিদা নারীকেও তোমার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। বিশেষ করে আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যের ক্ষেত্রে সেই বাহাদুরনী হলেন মুসা লাখসিয়্যার মা, যিনি নাসির লাখসিয়্যার স্ত্রী, যার ছেলে স্পেন বিজেতা ছিলেন। আল ইসাবাতে (৪/৫০১) এসেছে যে তিনি তার স্বামীর সঙ্গে ইয়ারমুক যুদ্ধে উপস্থিত হন এবং এক আফ্রিকানিকে হত্যা করে তার সালব (সামানা বা জিনিসপত্র) গ্রহণ করেন।

আব্দুল আজীজ তার কাজে তা জানতে চাইলে তিনি তা বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ আমরা মহিলাদের একটি দলের মাঝে ছিলাম। তখন কতিপয় পুরুষ এসে ঘোরাফেরা করছিল, আমি এক আফ্রিকানিকে দেখলাম সে একজন

মুসলমানকে টানছে, আমি তাঁবুর একটি খুঁটি নিয়ে তার নিকটে গিয়ে তার মাথায় সজোরে আঘাত করলাম এবং তার সালব (সামানা বা জিনিসপত্র) ছিনিয়ে আনলাম। এতে পুরুষরা আমাকে সাহায্য করেছেন।

প্রিয় বোন!

তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কতবার তোমার ভাইদের আহত, নিহত ও নির্যাতিত অবস্থায় দেখেছ? কোন একদিনও কি তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করেছ? তুমি দেখনি মূসার মা কী করেছেন? শুধু একবার যখন সেই দৃশ্য দেখলেন, তখন আর সহ্য করতে পারেননি। তাঁবুর খুঁটি নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে প্রবেশ করেন, অথচ তার শত্রুর কাছে ছিল তরবারি। এই দ্বীনের প্রতি তাঁর গায়রত ও ভালবাসাই তাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে।

বোন!

তোমার গায়রত কোথায়? নাকি তোমার গায়রতকে মুজাহিদদের সম্পদ আটকানো ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ থেকে নিজ স্বামী ও ছেলেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে খরচ করেছ?

প্রিয় বোন!

তোমার জন্য আবু জাহলের ছেলে ইকরেমার স্ত্রী উম্মে হাকিম বিনতে হারিছের মাঝে শিক্ষা রয়েছে। তিনি কিভাবে তাঁর নিজ স্বামীকে তার বিপদের সময় আল্লাহর রাস্তায় উদ্বুদ্ধ করতেন। আল ইসাবাতে (৪/৪৪) এসেছে যে, তিনি নিজ স্বামী ইকরিমার সঙ্গে রোম যুদ্ধে বের হন। অতঃপর তাঁর স্বামী শাহাদাত বরণ করেন। পরে খালেদ বিন সাঈদ তাঁকে বিবাহ করেন। অতঃপর যখন তিনি তাঁর সঙ্গে বাসর করতে চাইলেন তিনি বললেন, আল্লাহ তা'লা এই বাহিনীকে পরাজিত করা পর্যন্ত বিলম্ব করবেন কি? তিনি বললেন, আমার মনে হচ্ছে আমি নিহত হব, তখন তিনি বললেন, তাহলে আপনার ইচ্ছা। অতঃপর খালেদ বিন সাঈদ এক পুলের নিকট বাসর করলেন। পরে সে পুলের নাম হয়ে যায় উম্মে হাকিম পুল।

অতঃপর সকাল বেলা ওলীমা করলেন। তারা যখন খানা থেকে অবসর হলেন, তখন রোমানরা আক্রমণ করলো এবং যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল ও তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। এদিকে উম্মে হাকিমও কাপড় বেঁধে নিলেন এবং বেরিয়ে পড়লেন। অথচ তাঁর শরীরে তখনও মেহেদীর চিহ্ন ছিল। সেদিন উম্মে হাকিম যুদ্ধ করেছেন এমনকি যে তাঁবুতে তিনি বাসর করেছিলেন সেই তাঁবুর খুঁটি দ্বারা সাতজন রোমানকে হত্যা করেছিলেন।

প্রিয় বোন!

এখানে আরেকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি যাতে তোমার জন্য শিক্ষা রয়েছে এবং

তাঁর জীবনী তোমাকে জিহাদকে ভালবাসার দিকে উদ্বুদ্ধ করবে, যেভাবে মহিলা সাহাবিয়াতরা একে ভালবাসতেন ও এর প্রতি আগ্রহী ছিলেন। কোন জিনিস আমাদের নারীদেরকে জিহাদের ভালবাসা থেকে দূরে রেখেছে বরং তাদেরকে জিহাদ বিরোধিতার নিকটবর্তী করে দিয়েছে? তা একমাত্র ঈমানের দুর্বলতার কারণেই।

যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ এর ভালবাসা সবকিছুর উর্ধ্বে হত তাহলে আমাদের নারীরা উম্মে হারামের ন্যায় হত। আলা ইসাবাতে (৪/৪৪১) এসেছে যে, রাসুল ﷺ উম্মে হারাম বিনতে মিলহানের ঘরে দুপুর বেলায় কায়লুলা করলেন অর্থাৎ ঘুমালেন। অতঃপর হেসে হেসে জাগ্রত হলেন আর বললেনঃ আমার উম্মতের একদল লোককে আমার সামনে পেশ করে হয়েছে, তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতেছে। আর তারা এই সমুদ্রের উপর দিয়ে রাজা বাদশাহের ন্যায় সিংহাসনে বসে ভ্রমণ করতেছে। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল ﷺ! আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন আমিও যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হই। তিনি তাঁর জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর আবার মাথা রেখে ঘুমালেন। অতঃপর আবার হেসে হেসে জাগ্রত হলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! কোন জিনিস আপনাকে হাসাল? রাসুল ﷺ বললেনঃ আমার উম্মতের একদল লোককে আমার সামনে পেশ করে হয়েছে। তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতেছে যেভাবে প্রথমবার বলেছেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন আমি যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হই। তিনি বললেনঃ তুমি প্রথম সারির

অন্তর্ভুক্ত হবে। অতঃপর উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রাঃ সেই সমুদ্রে ভ্রমণ করেছেন এবং সমুদ্র হতে বের হওয়ার সময় সওয়ারী হতে পড়ে আহত হন এবং শাহাদাত বরণ করেন। (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন) ইবনে আছীর বলেন, সেই যুদ্ধটি ছিল কবরসের যুদ্ধ'। সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। সেই যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রাঃ। উসমান রাঃ এর খেলাফতের যুগে ও সাঁতাশ হিজরি সনে।

প্রিয় বোন!

এ হলেন উম্মে হারাম। যিনি আখেরাতের ক্ষেত্রে অল্পে তুষ্ট হননি। বরং ইসলামের শৌর্য-বীর্যদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগ্রহী হলেন এবং রাসুল ﷺ এর কাছে দোয়া চাইলেন, যেন তিনি সেই সেই যোদ্ধাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। তাঁর অন্তর আল্লাহ, তাঁর রাসুল ﷺ ও দ্বীনের ভালবাসায় ভরপুর ছিল বিধায় তিনি এ প্রশ্ন করেছিলেন এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য নিজেকে পেশ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁকে জান্নাতের মাঝে স্থান দান করেছেন।

প্রিয় বোন!

নারীদের ধৈর্য এবং সন্তানদেরকে আল্লাহর রাস্তায় উদ্বুদ্ধকরণের ক্ষেত্রে তোমার জন্য আরেকটি উদাহরণ পেশ করছি। আর তিনি হলেন দুই পিতা বিশিষ্টা নারী আসমা বিনতে আবু বকর রাঃ। 'সিয়ারো আলআমিন নুবালাতে

(২/২৯৩) এসেছে যে, উরওয়া রাঃ বলেনঃ আমার ভাই আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের শহীদ হওয়ার দশ রাত পূর্বে, আমি এবং তিনি আম্মাজানের নিকট গেলাম। তখন তিনি মারাত্মক ব্যাথায় আক্রান্ত ছিলেন। তখন আব্দুল্লাহ বললেন, আপনার কি অবস্থা? উত্তরে তিনি বললেন, ব্যাথায় আক্রান্ত। তিনি বলেন, মৃত্যুতে মুক্তি পাবেন। উনার মা হেঁসে দিয়ে বলেন, সম্ভবত তুমি আমার মৃত্যুর ব্যাপারে আগ্রহী। এমন করোনা। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি মৃত্যুর ব্যাপারে আগ্রহী নই যে যাবত না তুমি একপাশে অবস্থান নিবে। অর্থাৎ হাজ্জাজের সঙ্গে যুদ্ধে হয় তুমি শহীদ হয়ে যাবে, তখন আমি সবর করবো ও পরিতৃপ্ত হব আর না হয় তুমি বিজয়ী হবে, তখন আমার চক্ষু শীতল হবে। তখন তাঁর বয়স একশত বছর ছিল। আব্দুলাহ ইবনে যুবায়ের শহীদ হওয়ার পর ইবনে ওমর রাঃ তাঁর মা আসমা রাঃ এর কাছে যান তাঁকে শান্তনা দেবার জন্য। এসে তাঁকে মসজিদের কিনারায় পেলেন। তিনি তখন তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, এই দেহ তো কিছুই না। নিশ্চয়ই আত্মাসমূহ আল্লাহর কাছে। সুতরাং তাঁকে ভয় করুন এবং ধৈর্যধারণ করুন। তখন তিনি বললেন, কেন আমি তা করবোনা? অথচ ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া আঃ এর মাতাকে বনি ইস্রাঈলের জনৈক বেশ্যা নারীর নিকট উপহার হিসেবে পাঠানো হয়েছিল।

আল্লাহ তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করুন। তিনি আল্লাহর নবীর মুসিবত হতে শান্তনা গ্রহণ করেছেন। আর বিপদকে ছোট করে দেখেছেন। কেননা আল্লাহর দ্বীন তাঁর কাছে নিজ ছেলে হতে অধিক প্রিয়। তাই যখন আল্লাহর নবীর উপর

অর্পিত বিপদের কথা স্মরণ করেন যিনি তাঁর ছেলে থেকে আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানী ছিলেন। তখন তাঁর বিপদ সহজ হয়ে যায়।

প্রিয় বোন!

তোমার জন্য আরেকজন মহান নারীর আদর্শ পেশ করছি, যিনি আপন ছেলে শহীদ হওয়ার পরও রাসুল ﷺ এর সুস্থতাকে সবকিছুর উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা তিনি দৃঢ়ভাবে জানতেন যে, তাঁর ছেলের মৃত্যুতে দ্বীনের কোন ক্ষতি হবেনা, কিন্তু রাসুল ﷺ এর ইন্তিকালে দ্বীনের বিরাট ক্ষতি হবে।

তারিখে ইসলামী (২/২৪৬) তে এসেছে, যখন রাসুল ﷺ উহুদ যুদ্ধ থেকে মদিনার দিকে ফিরলেন, তখন মদিনায় যারা ছিলেন তারা সবাই রাসুল ﷺ কে স্বাগতম জানানোর জন্য বেরিয়ে আসলেন। তাদের মধ্যে আনসারদের নেতা সাআদ বিন মায়াযের মাতাও ছিলেন।

তিনি ঘোড়ার উপর আরোহণ করে আসছিলেন। তাঁর ছেলে সা'আদ রাঃ তাঁর লাগাম ধরলেন, সা'আদ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসুল ﷺ। ইনি আমার মা। রাসুল ﷺ বললেনঃ মারহাবা, অতঃপর তিনি যখন নিকটে আসলেন রাসুল ﷺ তাকে সান্তনা দিলেন। তাঁর ছেলে আমর বিন মায়ায শহীদ হওয়ায়, তিনি বললেন, আমি যখন আপনাকে সুস্থ দেখছি তখন আমার মুসিবত দূর হয়ে গেছে। রাসুল ﷺ তখন তাঁর জন্য দোয়া করলেন এবং বললেনঃ

সুসংবাদ নাও, শহীদদের পরিবার জান্নাতে তাদের সাথেই থাকবে এবং পরিবারের সকলের ক্ষেত্রে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।

এমনিভাবে আরেকজন সাহাবিয়াহ রাসুল ﷺ সুস্থ থাকায় নিজের বিপদকে কিছুই মনে করেন নাই। বর্তমানে আমাদের নারীদের ন্যায় নয়, যারা নিজের প্রেমিককে ছাড়া অন্যের জন্য কাঁদেনা। আর দ্বীনের বা পরিবারের বিপদে তাদের গায়ে লাগেনা। বোন! নেককার নারীদের অন্তর্ভুক্ত হও যদি জান্নাতে যেতে চাও।

আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৪/৪৭) গ্রন্থে এসেছে ইবনে ইসহাক সাআদ রা: বনী দিনার গোত্রের জনৈক মহিলার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর সে মহিলার স্বামী, ভাই, ছেলে এবং পিতা আহত হয়েছিলেন। যখন লোকেরা তাকে সেই দুঃসংবাদ জানালো, তিনি বললেন, রাসুল ﷺ কেমন আছেন? তারা বলল, আলহামদুলিল্লাহ তিনি ভাল আছেন। তিনি বললেন: আমাকে দেখাও, যাতে আমি তাকে একবার দেখতে পারি, তখন রাসুল ﷺ এর দিকে ইঙ্গিত করা হল, এবং তিনি দেখে নিলেন,অতঃপর তিনি বললেন : আপনাকে দেখার পর সকল বিপদ মুছিবতই তুচ্ছ।

প্রিয় বোন!

তুমি যদি আল্লাহর রাস্তায় বিপদ মুছীবতে ধৈর্য ধারণ করার আদর্শ চাও

তাহলে তুমি নিচের আদর্শটি গ্রহণ করতে পার। সিয়ারে আলামিন নুবালা (৪/৫৮) গ্রন্থে এসছে যে, মুয়ায বিনতে আব্দুল্লাহ যিনি উম্মে সাহল নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং সালত বিন আশআমের স্ত্রী ছিলেন। যখন তাঁর স্বামী সালত এবং ছেলে কোন এক যুদ্ধে শহীদ হলেন, তখন মহিলারা তার (শান্তনা দেওয়ার জন্য) কাছে আসলেন, তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা যদি আমাকে স্বাগতম জানানোর জন্য এসে থাক তাহলে তোমাদেরকে মোবারকবাদ, আর অন্য উদ্দেশ্যে এসে থাকলে ফিরে যাও। আর তিনি বলতে লাগলেন: "আল্লাহর শপথ আমি বেঁচে থাকাকে পছন্দ করছিনা তবে ছওয়াব অর্জন করে আমার প্রভুর নৈকট্য অর্জন করব যাতে তিনি জান্নাতে আমাকে আবু শাআছা ও তাঁর পুত্রের সঙ্গে একত্রিত করে দেন।

প্রিয় বোন!

এখানে আরেকজন মহিলার কথা তোমাকে শুনাব। আল্লাহ তাআলা তাকে নারীদের মাঝে সম্মানিত করেছেন, এবং শহীদ সন্তানদের জননী বানিয়েছেন। তিনি-ই একমাত্র সৌভাগ্যবান সেই মহিলা যার সকল সন্তানরা বদর যুদ্ধে রাসুল ﷺ এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল-ইসাবা (৮/২৬) গ্রন্থে এসেছে আফরা বিনতে উবাইদ বিন ছালাবার দুই পুত্র মায়ায ও মুআওয়্যায শহীদ হওয়ার পর তাদের মা, রাসুল ﷺ এর নিকট এসে বললেন: হে আল্লাহর রাসুল! এটি কি আওফ বিন হারিছের বংশের শেষ জন? আমি বলি এই আফরা রা: এর একটি বৈশিষ্ট আছে যা অন্যদের মাঝে পাওয়া যায়না। আর তা হল তিনি হারেছের পর বাকির বিন ইয়ালাইল

লাইছি কে বিবাহ করেছিলেন। তার ঐরসে উনার চারটি সন্তান হয়েছিল। তারা হল ইয়াস, আকিল, খালেদ ও আমের এরা সবাই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহন করেছিলেন। সুতরাং সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইনি একমাত্র মহিলা সাহাবী যার সাতটি ছেলে নবী করীম ﷺ এর সঙ্গে বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন।

হে পুরুষদের মাতা!

আপনার কয়জন ছেলে পাঠিয়েছেন? যেভাবে আফরা রা: পাঠিয়েছিলেন। আপনার একটি ছেলেও কি কোন জিহাদে অংশগ্রহন করেছে? আপনি লজ্জাবোধ করেন না! এত ছেলের মাতা হলেন কিন্তু তাদের কেউ আল্লাহর দ্বীনের জন্য এগিয়ে আসলোনা। বরং আপনি কি আল্লাহকে ভয় করছেন না! যে জিহাদের পথে আপনি কিনা তাদের জন্য বাঁধা হয়ে যাচ্ছ। আর পূর্বসুরীদের মাঝে আপনার জন্য কি কোন শিক্ষা, নসীহত নেই? বোন! পাঠাও তারা যা পাঠিয়েছেন, যাতে তাদের ন্যায় তুমিও সওয়াব অর্জন করতে পার।

এই আরেকজন বিখ্যাত মহিলা, যদি আমাদের নারীরা উনার মত হত তাহলে একজন পুরুষও জিহাদ থেকে পশ্চাতগামী থাকত না। বরং দলে দলে জিহাদে অংশগ্রহন করত। আল ইসাবা (৭/৬৪) ও তাবকাতে শাফিইয়্যাহ (১/২৬০) তে উনার সম্পর্কে এসেছে যে, খানছা বিনতে আমর আসসালিমিয়্যাহ, কাদিসিয়ার যুদ্ধে তাঁর চার ছেলেসহ উপস্থিত হলেন, এবং

তাদেরকে মূল্যবান কিছু নসীহত করলেন, দৃঢ় পদে যুদ্ধ করা ও পলায়ন না করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, হে ছেলেরা! তোমরা স্বেচ্ছায় আনুগত্যের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছ, এবং স্বেচ্ছায় হিজরত করেছ। আর তোমরা এক পিতা-মাতার সন্তান, আমি তোমাদের বাপ, চাচার মুখ কালো করিনি, তোমাদের মামাদেরকে লজ্জিত করিনি। অতঃপর বললেন: তোমরা জান যে, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাঝে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য কি ছাওয়াব রেখেছেন। আর তোমরা এটাও জানো যে, ক্ষনস্থায়ী বাসস্থান (দুনিয়া) অপেক্ষা চিরস্থায়ী (জান্নাত) বাসস্থান উত্তম। সুতরাং আগামী কাল যদি তোমরা সুস্থতার সাথে সকাল কর তাহলে তোমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে বুঝে শুনে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে।

অতঃপর যখন যুদ্ধের আগুন জলে উঠবে ও তার স্ফুলিঙ্গ উড়তে থাকবে তখন ময়দানে ঢুকে পড়বে এবং মাথা চেপে ধরবে। তাহলে তোমরা বিজয়ী হবে গণীমত দ্বারা এবং চিরস্থায়ী বাসস্থান (জান্নাত) এর সম্মানের দ্বারা। অতপর ছেলেরা মায়ের উপদেশাবলীর অনুসরণ করে অগ্রসর হল, যখন ভোর হল তারা যুদ্ধের ময়দানে অবস্থান নিল। এবং একের পর এক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে লাগলে। এমনকি সবাই শাহাদত বরণ করল। তারা প্রত্যেকেই শহীদ হওয়ার পূর্বে কিছু কবিতা আবৃত্তি করে ছিল নিচে তা উল্লেখ করা হল।

প্রথমজন বলল- হে ভাইগণ! নিশ্চয় বৃদ্ধা নসীহতকারীণী মা গত রাতে ডেকে আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেণ। কতিপয় সুস্পষ্ট কথা, যে তোমরা ভীষণ যুদ্ধে সকাল করো। আর তোমরা সকালে সাসান এলাকার কতিপয় কুকুরদের মুখোমুখি হবে। তারা তোমাদের দুর্যোগ-বিপদের ব্যাপারে দৃঢ় নিশ্চিত অথচ তোমরা এখনো সুস্থ জীবনের মাঝে রয়েছে। অতঃপর সে অগ্রসর হয়ে শত্রুদের মাঝে ঢুকে পড়ল এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুণ।

অতঃপর দ্বিতীয় ছেলে সামনে বাড়ল এবং আবৃত্তি করতে লাগল- নিশ্চয় বৃদ্ধা মা বিচক্ষণ, ধৈর্যশীল, মমতাময়ী এবং সিংহের ন্যায় হিম্মতের অধিকারী নারী। তিনি আমাদের মঙ্গল কামনা করে যথার্থ উপদেশাবলী প্রদান করেছেন। সুতরাং তোমরা ভোরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও নগদ বিজয়ের জন্যে অথবা শাহাদতের জন্যে যা তোমাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী বানাবে। উনিও যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করলেন: আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুণ।

তৃতীয় ছেলে সামনে বাড়ল এবং আবৃত্তি করতে লাগল- তিনি আল্লাহর শপথ আমি তাঁর এক অক্ষরও অমান্য করবনা, আমাদেরকে মমতার সঙ্গে নসীহত করেছেন। উত্তম সত্য ও ভালবাসাপূর্ণ নসীহতসমূহ। সুতরাং হামাগুড়ি দিয়ে যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হও।

অতপর চতুর্থ ছেলে অগ্রসর হল এবং আবৃত্তি করতে লাগল- আমি মা

খানছার বা আখরাম বা আমরের সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করবনা বরং নগদ বিজয় এবং গণীমতের জন্য অথবা আল্লাহর রাস্তায় শাহাদত বরণের জন্য যুদ্ধ করবে। তিনিও যুদ্ধ করে করে শহীদ হয়ে গেলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুণ।

অতঃপর যখন ছেলেদের শাহাদতের খবর তাঁর কাছে পৌছল, তিনি বললেন: সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি আমাকে এই সৌভাগ্য দান করেছেন। হযরত ওমর রাযি: খানাসাকে তাঁর চার ছেলের ভাতা দিতেন, প্রত্যেকের জন্য একশ দিরহাম করে।

মুসলিম বোন!

এ হল সালফে সালিহীন নারীদের কিছু দৃষ্টান্ত। তোমার সামনে তাদের ত্যাগ-কুরবানী ও মুজাহাদার কিছু অবস্থা পেশ করলাম। তাদের ন্যায় আরো অনেক রয়েছেন। প্রবন্ধ দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কায় আর বেশি উল্লেখ করতে চাচ্ছিনা। উল্লেখ্য যে, আমরা কেবল তাদের জীবনের একটি দিকই উল্লেখ করলাম। আমরা যদি তাদের এবাদত-বন্দেগী, খোদাভীতি, ইলম,দান খয়রাত ও সকল আমলের দিক উল্লেখ করতাম তাহলে কেমন হতো! আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যেত। কিন্তু আমরা যতটুকু উল্লেখ করছি, ইনশাআল্লাহ তা-ই যথেষ্ট।

এ যুগের কিছু মুজাহিদা নারীর উদাহরণ

প্রিয় বোন!

তুমি যখন এসব কাহিনী শুনো, কখনও হয়তো মনে হতে পারে যে এগুলো কোন কল্পকাহিনী কিনা! কিন্তু যখন তুমি জানবে যে, বর্তমান যুগের নারীদের মাঝেও কিছু নারীরা এমন রয়েছেন যারা পূর্বসুরীদের ন্যায় ঈমান ও আল্লাহর ভালবাসা রাখেন। তখন পূর্বসুরীদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা তোমার বিশ্বাস হবে। সাহসিকতা ও উৎসর্গের ক্ষেত্রে এ যুগের নারীদের মধ্য থেকে একজনের দৃষ্টান্ত পেশ পরছি। যিনি সমসাময়িক নারীদের সরদার, শাহাদতবরণকারিণী।

তিনি হলেন "হিওয়া বারাইফ একজন যুবতী নারী। শত্রুরা যখন তার শহরে প্রবেশ করে এবং শহরবাসীর প্রতি জুলুম-নির্যাতন চালায়, তখন থেকেই তার হৃদয়ে প্রতিশোধের আগুন জলে উঠে। তিনি সর্বত্মভাবে মুজাহিদদেরকে সাহায্য করতে থাকেন। অতপর তিনি যখন শুনলেন যে, শত্রুদেরকে ধ্বংস করার জন্য কোন ব্যাক্তি নিজেকে শত্রুদের মাঝে পেশ করা জায়েয। (অর্থাৎ তাদেরসহ নিজে মরা) তখন তিনি মনে মনে ঠিক করলেন যে, তিনি-ই সেই শহিদী হামলাকারিণী হবেন।

তাঁর এক চাচাতো ভাই যিনি কমান্ডার ছিলেন, তার কাছে বারবার নিজের ইচ্ছার কথা বলতে লাগলেন। বারবার তার পীড়াপীড়ির পর তিনি রাজি হলেন। তাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিলেন। যখন আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তার সাক্ষাতের সময় এসে গেল, তিনি সালাত আদায় করলেন, কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত করলেন এবং মাতা-পিতা ও আত্মীয়দের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। অতপর বিস্ফোরক বোঝাই করা একটি ট্রাকে আরোহন করলেন। এবং শত্রুদের একেবারে ভিতরে ঢুকে বিস্ফোরণ ঘটালেন। আর শহীদ হয়ে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। এটাই আমাদের ধারণা।

আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য সহযোগিতার ক্ষেত্রে এ যুগের আরেকজন নারীর দৃষ্টান্ত পেশ করছি। তিনি হলেন "উম্মে ওমর আল মক্কিয়াহ। এ মহিলাটি আল্লাহর সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন যে, তিনি নিজের সবকিছু দিয়ে আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যে আফগান জিহাদে যাবেন। তাই তাঁর ছেলেকে পাঠালেন আর নিজে মক্কাতে মহিলাদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত হলেন। এমনকি তিনি নিজের ঘরে তৈরী খাদ্য আফগান মুজাহিদদের জন্য পাঠাতেন। একদিন তিনি আফগানিস্তানের মুজাহিদা নারীদেরকে দেখার জন্য সংকল্প করলেন। আল্লাহর বান্দিকে আটকায় কে! তিনি এসে গেলেন আফগানিস্তান। আসার পর তিনি মুজাহিদদের ফ্রন্টে প্রবেশ করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। মুজাহিদরা তাকে ফিরানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু কাজ হলনা। বরং তিনি আল্লাহর রাস্তায় শত্রুর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করবেন বলে শপথ করে বসলেন। অবশেষে তারা সম্মত হলেন। তিনি নিজ ছেলের

সঙ্গে গাড়িতে আরোহন করলেন, এবং যুদ্ধের ফ্রন্টে প্রবেশ করলেন। এগুলো সবই তাঁর নেক আকাঙ্খা পুরণ, নিজ চোখে দুশমনকে দেখা, আল্লাহ তাআলার রাস্তায় শত্রুর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করা। তিনি নিজের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করলেন। এবং একটি রকেট লাঞ্চার শত্রুর প্রতি ছুড়লেন। শত্রুরা তাঁর দিকে রকেট ছুড়ল। তাঁর কাছ থেকে জানা গেল যে, তাঁর রকেটটি লক্ষ্যবস্তুতে ঠিকভাবেই আঘাত হেনেছে। এবং তার অন্তরের ব্যাথা কিছুটা লাঘব হয়েছে। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা তাকে অফুরন্ত ছাওয়াব ও দান করবেন।

এ যুগের আরেকজন সৎ সাহসী নারীর দৃষ্টান্ত পেশ করছি। যিনি হযরত আসমা এবং উম্মে সাআদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখেন, তিনি হলেন উম্মে সুরাকা। তাঁর কলিজার টুকরা ছেলে যখন জিহাদে শহীদ হলেন, মুজাহিদরা ইতস্তত: করছিলেন যে, কিভাবে তাঁর মাকে এ সংবাদ দিবেন। কিন্তু যখন শায়খ আব্দুল্লাহ আ'যযাম রাহ. তাঁর মাকে সংবাদ দিলেন তখন তার সকল বিপদ দুরীভূত হয়ে গেল। শায়খ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে ছেলে শহীদ হওয়ার সুসংবাদ দিলেন, এবং ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিলেন। কি আশ্চর্য ! উলটা তিনি পূর্বসূরী নেক নারীদের কথা স্বরণ করিয়ে দিলেন। আর বললেন: আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া যে, তিনি আমার ছেলেকে এই সৌভাগ্য দান করেছেন। এবং বললেন: ইনশাআল্লাহ! আগামী সপ্তাহে তাঁর ভাইকে আপনাদের কাছে পাঠাইতেছি তাঁর ভাইয়ের শুন্যস্থান পূরণ করার জন্য।

এ যুগের নারীদের মধ্যে আরেকজন সাহসী নারী। যিনি সুফিয়া রাযি: এর ন্যায় পুরুষদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি হলেন উম্মে গাজনাফার। তিনি একেবারে নিরক্ষর একজন মহিলা। একদিন এক মজলিসে বসলেন, সেখানে একজন মহিলা জিহাদের ফযীলত, শাহাদতের মর্তবা এবং পিতা-মাতাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য শহীদের সুপারিসের আলোচনা করছিলেন। উম্মে গাজনাফার তা ভালোভাবে শুনলেন এবং হৃদয়ের মাঝে গেঁথে নিলেন। অতঃপর ঘরে ফিরে তাঁর একমাত্র ছেলেকে ডাকলেন, এবং তাকে আফগান জিহাদে যাওয়ার প্রতি আহবান করলেন, যাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর শাহাদাত নসীব করেন। কিন্তু ছেলের পক্ষ থেকে তিনি আগ্রহ অনুভব করলেন না। ফলে ছেলে প্রতি রাগ করলেন, অসন্তুষ্ট হলেন। গাজনাফার তাঁর মাকে খুশি করার চেষ্টা করল। কিন্তু মা কোনভাবেই সন্তুষ্ট হচ্ছিলেন না। এক পর্যায়ে মা গাজনাফারের হাত ধরে এই বলে কাঁদতে লাগলেন যে, "কেয়ামতের দিন কে আমাদের জন্য সুপারিস করবে?" গাজনাফার বলেন, আমি সম্মত ও প্রস্তুত হওয়ার আগ পর্যন্ত মা, সন্তুষ্ট হন নি। আমি যখন তাকে জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছার কথা শুনালাম, তিনি বললেন সেখানে তুমি কত দিন থাকবে? আমি বললাম, চার থেকে ছয় মাস। তখন তিনি আমার মুখে থুথু দিয়ে বললেন, তুমি কি চার, ছয় মাসের জন্য তোমার নিজেকে বিক্রি করতে চাও। যাও আল্লাহ তোমাকে দুই কামিয়াবির একটি নসীব করা পর্যন্ত জিহাদ করতে থাক"।

দেখেছ? কিভাবে এ যুগের সৎ সাহসী নারীরা দ্বীনের জন্য ত্যাগ ও কুরবানীর উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তুমি কি মনে কর যদি এ যুগের সকল মুসলিম নারীরা ঐ মহিলাদের ন্যায় হতেন তাহলে কি শত্রুরা আমাদের দেশের নারীদের উপর চরাও হতে পারত? উত্তর নিশ্চয় সুস্পষ্ট নেতিবাচক হবে। তাহলে তুমি কেন সেই সফলকামী দলের সাথে যোগ দিচ্ছে না। বোন! তুমি সেই নারীদের একজন হও যারা ইতিহাসে নিজের উচ্চস্থান সৃষ্টি করে।

সারাংশ:

প্রিয় বোন!
আমরা তোমার হতে যা চাচ্ছি

প্রিয় বোন!

তোমার প্রতি আমাদের এ পত্রের শেষ দিকে এসে গেছি। তোমাকে বিদায় দেয়ার পূর্বে আমাদের উচিত তোমার কাছে আমরা যা চাচ্ছি এর সারমর্ম সংক্ষেপে পেশ করা। আমরা তোমার সামনে পূর্বসুরী ও এ যুগের কতিপয় নেককার নারীর অবস্থা উল্লেখ করেছি, এর দ্বারা তোমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সাহায্যে নারীর কত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রয়েছে। আমরা এটা চাচ্ছিনা যে, তুমি যুদ্ধের ময়দানে প্রবেশ কর কেননা এতে ফিতনা আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু আমরা চাচ্ছি যে, তুমি পূর্বসূরী নারীদের অনুসরণ করবে, জিহাদের প্রতি তাদের উদ্বুদ্ধ করণ, প্রস্তুত করণ, এ পথে ধৈর্যধারণ, এবং

শত্রুর মুকাবিলায় সবকিছু দিয়ে আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করার প্রতি আগ্রহের ক্ষেত্রে।

ইসলামের আর তুমি যদি নিজ দ্বীন ও জাতির অপমানের উপর সন্তুষ্ট থাক, তাহলে তোমার ব্যাপারে আমাদের কোন কথা নেই। কিন্তু আমরা তোমাকে আল্লাহর ক্রোধের ব্যাপারে সতর্ক করছি। আর তোমাকে বলছি, আল্লাহকে ভয় করো এবং জিহাদের পথে পুরুষের প্রতিবন্ধক হয়োনা। অন্তত তোমার কাছে আমরা এতটুকু আশা করি যে, পুরুষ জিহাদে বের হওয়ার সময় তুমি নিরব থাকবে এবং আল্লাহর নির্দেশের উপর সন্তুষ্ট থাকবে। জেনে রেখো তুমি যখন কোন পুরুষকে জিহাদে না যাওয়ায় প্রশংসা করবে চাই সে স্বামী হোক বা ছেলে অথবা ভাই, তো নিশ্চয় এটাও এক ধরণের আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিরত রাখার-ই অন্তর্ভুক্ত। তুমি যদি তাদেরকে জিহাদে বের করে ধ্বংস না কর তবে শরয়ী দৃষ্টিতে তাদেরকে জিহাদ থেকে বিরত রাখার অধিকার তোমার নেই। হয়তো তুমি এ কথায় আশ্চর্য হতে পার, এবং বলতে পার কিভাবে মায়ের অধিকার থাকবেনা, অথচ নবী করীম ﷺ বলেছেন: যা বুখারী ও অন্যান্য কিতাবে আব্দুল্লাহ বিন আমর রা: হতে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যাক্তি রাসুল ﷺ এর নিকট এসে জিহাদের অনুমতি চেয়েছে, তিনি বলেছেন: তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত? সে বলল: হ্যাঁ, নবীজী ﷺ বললেন: তুমি তাদের সেবা করো।

আমরা উত্তর দিব, যে এই হাদীছ বা এ ধরণের অর্থবোধক হাদীস আমাদের কাছে অস্পষ্ট নয়। কিন্তু এর বিরোধী হাদীস ও রয়েছে। সেক্ষেত্রে উভয় হাদীসের উপর আমল করতে হয়। যেমন আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন। যে হাদীসটি আবু দাউদের বর্ণনায় এভাবে যে, (তুমি ফিরে যাও এবং তারা উভয়ের অনুমতি নাও, তারা যদি অনুমতি দেন তাহলে জিহাদ করো অন্যথায় তাদের সেবা যত্ন করো)।

অধিকাংশ আলেমগণ বলেন: জিহাদ হারাম হয়ে যায় যখন পিতা- মাতা উভয় বা একজন নিষেধ করেন, এ শর্তে যে তারা উভয় মুসলমান, কেননা তাদের খেদমত করা ফরযে আইন, আর জিহাদ হল ফরয়ে কেফায়াহ। তবে জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যাবে তখন আর অনুমতি প্রয়োজন নেই। যা সমর্থন করে ঐ হাদীস যা ইবনে হিব্বান রাহ. অন্য সূত্রে আব্দুল্লাহ বিন আমর হতে বর্ণনা করেছেন। (এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর নিকট এসে উত্তম আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে, রাসুল ﷺ বললেন: সালাত, সে বলল: অতপর কোনটি? রাসুল ﷺ বললেন: জিহাদ, সে বলল: আমার মাতা-পিতা আছেন, রাসুল বললেন: আমি তোমাকে পিতা- মাতার সাথে ভালো ব্যবহারের উপদেশ দিচ্ছি। সে বলল: আমি ঐ আল্লাহর শপথ করে বলছি যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসাবে পাঠাইয়াছেন, আমি অবশ্যই পিতা-মাতাকে ছেড়ে জিহাদ করব, রাসুল ﷺ বললেন: তুমি ভাল জান)। এটা ফরযে আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দুই হাদীসের মাঝে সামাঞ্জস্য বিধান করতে।

হে মায়েরা!

আমাদের এ যুগে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেছে, সুতরাং আল্লাহর অবাধ্য হয়ে তোমার আনুগত্য করা যাবেনা। আল্লামা কুরতুবী তাঁর তাফসীরে

(৮/১৫১) লিখেছেন কখনো অবস্থা এমন হয় যে সবাই যাওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। আর তা হল যখন জিহাদ ফরয়ে আইন হয়ে যায়। শত্রুরা মুসলিম কোন ভুখন্ডে বিজয় লাভ করার দ্বারা, বা জবর দখলের দ্বারা। যখন তা হয়ে যাবে তখন এদেশের সকলের উপর জিহাদে বের হওয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে। হালকা ও ভারী অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে, জোয়ান বৃদ্ধা প্রত্যেকের সামর্থ অনুযায়ী। এমনকি যার পিতা মাতা জীবিত আছেন তাদের অনুমতি ছাড়াই। জিহাদে বের হওয়ার সামর্থ রাখে এমন কেউ বসে থাকতে পারবেনা। এ দেশ বা এলাকাবাসী যখন শত্রুদের মুকাবিলা করতে অক্ষম হয়ে যাবে তখন তার পার্শ্ববর্তী দেশবাসীর উপর ও তেমনি ফরয হয়ে যায়। যতক্ষণ না তারা জানবে যে, শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের যথেষ্ট ক্ষমতা এ দেশবাসীর রয়েছে। এভাবে ঐ ব্যক্তির উপরও ওয়াজিব যে মুসলিমদের দুর্বলতা ও শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার খবর জানে, এবং তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতাও রাখে। যতক্ষণ না আক্রান্ত এলাকার মুসলিমরা শত্রুর আক্রমন প্রতিরোধে রুখে দাড়াবে। কেননা মুসলমানগণ এক দেহের ন্যায়।

হে মা!

আমাকে উত্তর দিন, ফিলিস্তীন শত্রু কবলিত হয়েছে, এবং কাছের বা দুরের কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারছেনা, তবে কি এখনো জিহাদ ফরয়ে কেফায়া -ই থাকবে? এই মুসলমানদের স্পেন কয়েক শতাব্দী যাবত শত্রু কবলিত হয়েছে, এভাবে চেচনিয়া, কাশমীর, ফিলিপাইন, আরাকান ইত্যাদি। সেখানে ইসলামের নিশানাকে অবধমিত করেছে, মুসলমানদেরকে লাঞ্চিত করেছে এবং কঠিন শাস্তি দিয়েছে। এমনকি বর্তমানে আমরা আফগানিস্তানে

ক্রুসেডারদের নতুন আক্রমণ প্রত্যক্ষ করছি। এর পরও কি আপনি জিহাদকে ফরযে কেফায়া এবং বসে বসে আপনা সেবা করা বড় ওয়াজিব বলবেন?

হে মা!

ইবনে কুদামা "আল কাফী(৪/২৫৫) গ্রন্থে বলেন: জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যাবে তখন আর মা বাবার অনুমতির প্রয়োজন নেই।

যেমন ফরয হজ্জের ক্ষেত্রে, এমনিভাবে প্রত্যেক ফরয তরক করার ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করা যাবেনা। কেননা আল্লাহ তাআলা অবাধ্যতা করে কোন মাখলুকের আনুগত্য করা যাবেনা। কিন্তু আমরা বারবার দৃঢ়তার সাথে বলছি যে, কোন ক্রমেই তোমার জন্য পুরুষদেরকে জিহাদ থেকে বিরত রাখা জায়েয হবেনা, তবে যখন তার বের হওয়ার দ্বারা তোমার বা সন্তানদের ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা হয়। এছাড়া অন্য কোন কারণে যদি বাঁধা দাও তাহলে জেনে রেখো তোমার এই কাজ আল্লাহর রাস্তা হতে বাঁধা দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

আর কাফেরদের ক্ষেত্রে যে আয়াত নাযিল হয়েছে তুমি তার উপযুক্ত বলে গন্য হবে। আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে বলেন:

ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَ يَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ
أُولٰٓئِكَ فِي ضَلٰلٍ بَعِيدٍ

অর্থ: যারা পরকালের চাইতে পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে; আল্লাহর পথে বাঁধা দান করে এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করে, তারা পথ ভুলে দূরে পড়ে আছে।

সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং সেই দিনকে ভয় করো যে দিন তুমি আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হবে এবং তিনি তোমাকে প্রশ্ন করবেন তুমি কেন আমার পথ থেকে বাঁধা দিয়েছ? তখন কি উত্তর দিবে? তখন কি এ কথা বলবে যে দুনিয়া আমার কাছে দ্বীনের চেয়ে অধিক প্রিয়? নাকি বলবে যে, ছেলে ও স্বামী আমার কাছে আল্লাহ ও রাসুল ﷺ থেকে অধিক প্রিয়?

আর তুমি যদি নেককারদের অনুসরণ করতে অস্বীকার কর এবং মুখ ফিরিয়ে নাও এবং আল্লাহর পথ থেকে বাঁধা দেওয়ার মাধ্যমে তাঁর অবাধ্যতা কর, তাহলে আমরা তোমার কাছে আশা করব যে অন্তত তোমার মন্দ থেকে জাতিকে হেফাযত রাখবে। এবং এমন বস্তু হবেনা যার মাধ্যমে এ উম্মতের মেরুদন্ড ও আখলাক নষ্ট করা হয়। আমরা অবশ্যই তোমাদের হতে মঙ্গলের আশা করি। যদি না মান তাহলে আশা করি তোমার মন্দ থেকে আমাদেরকে নিরাপদ রাখবে। আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেন এ উম্মতকে ফাসেক -ফুজ্জারদের মন্দ থেকে হেফাযত করেন। নিশ্চয় তিনি এর উপর ক্ষমতা রাখেন।

আপনাদের ভাই ইউসুফ বিন সালেহ আল উয়াইরী

জিহাদে
নারীদের ভূমিকা

শাইখ সুলাইমান আর রুবাইশ (রহিমাহুল্লাহ)

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সমস্ত নবী ও রাসূলদের শ্রেষ্ঠ, আমাদের নবি মুহাম্মাদ (ﷺ) এর উপর, তার পরিবারবর্গ ও সাহাবাদের উপর এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা যথাযথভাবে তাদের অনুসরণ করবে তাদের উপর। আম্মা বাদঃ

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজীবকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের সৃষ্টি করেছেন একমাত্র ইবাদতের জন্য। তাদের অস্তিত্ব দান করেছেন শুধুমাত্র ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ সুবানাহু ওয়া তা'আলার অভিমুখী হওয়ার জন্য।

তাই মানুষকে ঘরের ব্যবস্থাপনা করা,সম্পদ ও স্ত্রী-সন্তানদের প্রাচুর্য অর্জন করার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। বরং তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর অভিমূখী হওয়ার জন্য। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য দুনিয়ায় ভোগ-সম্ভার, স্বাদ ও আরাম-আয়েশের নির্দিষ্ট একটা পরিমাণ বৈধ করেছেন। যতটুকু তাদেরকে আল্লাহর ইবাদত থেকে অমনোযোগী করে দিবে না।

মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এই হিকমতটি বুঝেছে,যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো। ফলে সে আল্লাহর ইবাদতে ব্যস্ত হয়েছে। আর দুনিয়া থেকে সামান্য পরিমাণ গ্রহন করেছে। যেমনটা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

"আর তোমার দুনিয়ার অংশও ভুলে যেও না।"

আর কিছু কিছু মানুষ সেই হিকমতকে ভুলে গেছে, যার জন্য তাদের সৃষ্টি করা হয়েছিল। ফলে তারা দুনিয়াকে তাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানিয়েছে। আল্লাহর আদেশ ছেড়ে তাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং তাদের

কাছে সত্ত্বাগতভাবে দুনিয়াই উদ্দেশ্য হয়ে গেছে।

ফলে তারা আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে দেয়, তার আদেশ বাদ দিয়ে দেয় এবং দুনিয়া ও তার যতটুকু আল্লাহ তাদের জন্য বৈধ করেছেন, তার মধ্যে ব্যস্ত হয়ে আল্লাহর দ্বীন ছেড়ে দেয়। এভাবে দুনিয়াকেই স্বয়ংসম্পূর্নভাবে উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয়।

দুনিয়ায় দোহাই দিয়ে ইবাদত ছেড়ে দেওয়া হয়। জিহাদ ছেড়ে দেওয়া হয় দেশের ভালোবাসার কারনে, জিহাদ ছেড়ে দেওয়া হয় স্ত্রী ও সন্তানদের কাছে থাকার জন্য, জিহাদ ছেড়ে দেওয়া হয় রিজিক সঞ্চয় করার জন্য, জিহাদ ছেড়ে দেওয়া হয় দুনিয়ায় স্বাদ-আয়েশ ভোগ করার জন্য।

আমরা যদি সেই বিষয়টি বুজতাম, আল্লাহ আমাদের যার জন্য সৃষ্টি করেছেন,তাহলে আমরা আল্লাহর আদেশের জন্য এ সকল জিনিস ছেড়ে দিতে পারতাম এবং আমাদের মন দুনিয়ার যে সমস্ত স্বাদ ও আরামের দিকে আমাদের আহ্বান করে, তার উপর আল্লাহর হুকুমকে প্রাধান্য দিতে পারতাম। এজন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন:

''তাই পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে প্র তারিত না করে এবং তোমাদেরকে যেন প্রতারিত না করে মহা প্রতারক।"

একজন শ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানী মুমিন, তথা যে ইবাদত ও সেই হিকমত বুজে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে চিন্তা করে কিভাবে সে তার প্রতিটি দিনকে, তার সমগ্র জীবনকে এবং তার সমগ্র দুনিয়াকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণের জন্য নিয়োজিত করতে পারে।

যেমনিভাবে দুনিয়াদাররা সকাল হলেই রিযিক সঞ্চয় ও ব্যবস্থা করা এবং

অধিক পরিমাণ দিনার ও দিরহাম জমা করার মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায় এবং দুনিয়া অন্বেষণে প্রচেষ্টা চালায়, তেমনিভাবে আখেরাত অন্বেষণকারীগণ- যারা আল্লাহর নিকট যা আছে তা কামনা করে এবং সেই হিকমত বুঝে, যার জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাদের

উপর আবশ্যক হল: তারা তাদের প্রতিটি দিনে, প্রতিটি ঘন্টায় ও প্রতিটি সেকেন্ডে চিন্তা করবে যে, সে কিভাবে তার সমস্ত দিনগুলো এবং সমস্ত জীবনটা আল্লাহর ইবাদতে কাটাতে পারে এবং কোনটা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার জন্য সবচেয়ে সহজ পথ। যাতে সেই হিকমায় উত্তীর্ণ হতে পারে, যার জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

যে লক্ষের দিকে তারা দৌঁড়াবে, তা হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা ও আখিরাতে তার নিকট যা আছে তা লাভ করা।

এজন্য মুমিন বান্দার উপর আবশ্যক হল এমন কোন দুনিয়াবী কাজে লিপ্ত না হওয়া, যা আল্লাহ থেকে অমনোযোগী করে দেয়। আর সেই ইবাদতের ভার বহন করা, যার প্রতি আল্লাহ আদেশ করেছেন, চাই তা যতই কষ্টকর ও বিপদসংকুল হোক না কেন।

নফসের উপর কঠিন ইবাদতসমূহে মধ্যে একটি হল আল্লাহর পথে জিহাদ। এটা কষ্টকর, আদম সন্তানের মনে অপছন্দনীয়। যেহেতু এর মধ্যে অনেক কষ্ট, বিপদ, ক্লান্তি ও কাঠিন্য রয়েছে, সম্পদ ও জীবনের কুরবানী রয়েছে, দেশের বিচ্ছেদ ও স্ত্রী-সন্তানদের ত্যাগ রয়েছে।

এ কারণে অনেক মুসলিম আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আমরাআল্লাহ তা'আলার নিকট এর থেকে

মুক্তি ও নিরাপত্তা কামনা করছি।

এ কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

" তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে। যদিও তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয়।"

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এর পরেই বলেছেন:

" হতে পারে কোন জিনিসকে তোমরা অপছন্দ করো, কিন্তু তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।"

তাই জিহাদ যদিও মানুষের মনে অপছন্দনীয়, কিন্তু এটাই কল্যাণকর।

এটা কল্যাণকর, যেহেতু তাতে রয়েছে মহা প্রতিদান।

এটা কল্যাণকর, যেহেতু তাতে রয়েছে উচ্চ মর্যাদা।

এটা কল্যাণকর, যেহেতু তাতে রয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহ ও গুনাহের মার্জনা।

এটা কল্যাণকর, যেহেতু তাতে রয়েছে আল্লাহর দ্বীনের সম্মান আর কুফরী দ্বীনের বিলুপ্তি, মুশরিকদের লাঞ্চনা আর মুমিনদের সম্মান। এতে রয়েছে তাদের ঐক্য এবং পরস্পরের পাশে দাঁড়ানোর শিক্ষা।

যদি মুসলিম উম্মাহ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর উপর একমত হত, তাহলে কখনোই মুসলিমদেরকে নিয়ে শত্রুরা খেলা করতে পারত না। আর আজ আমরা মুসলিমদের জখমের অভিযোগ করতাম না, সেই হত্যাযজ্ঞের অভিযোগ

করতাম না, যা ফিলিস্তীনে, ইরাকে, আফগানিস্তানে, চেচনিয়ায় ও অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি।

কিন্ত যখন মুসলমানগণ জিহাদ থেকে বিমুখতা অবলম্বন করল, তখন

আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তাদের শত্রুদেরকে চাপিয়ে দিলেন। আর যে সম্প্রদায়ই জিহাদ পরিত্যাগ করে, তারাই লাঞ্ছিত হয়। যদি মুসলিমগণ আল্লাহর হুকুমকে আকড়ে ধরতো এবং আল্লাহর সম্মানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করত, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়ার কর্তৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করতেন আর জান্নাতের সর্বোচ্চস্থানে তাদের মর্যাদা উন্নীত

করতেন।

কারণ আল্লাহ তাআলা মুজাহিদদের জন্য এমন জিনিস প্রস্তুত করে রেখেছেন, যা অন্যদের জন্য প্রস্তুত করেননি।যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদদের জন্য প্রস্তুত করেছেন একশ'টি মর্যাদার স্তর, যার একটি স্তরের সাথে আরেকটি স্তরের ব্যবধান হল আসমান-যমীনের ব্যবধানের সমান।

সুউচ্চ মর্যাদা আল্লাহ তা'আলা প্রস্তুত করে রেখেছেন তার পথের মুজাহিদদের জন্য।

চিন্তা করে দেখুন, যখন মুজাহিদদের জন্য এই মর্যাদা, তাহলে নারী মুজাহিদাদের কি হতে পারে? সেই নারীর কি মর্যাদা হতে পারে, যে জিহাদ করার ইচ্ছা করে! যে যুদ্ধ করতে চায়! যে ইস্তেশহাদী হামলা করতে চায়! যে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার পথে নিজেকে কুরবানী করতে চায়!

তাদেরও কি এই মর্যাদা লাভ হবে, নাকি এটা শুধু পুরুষদের জন্য বিশেষ?

প্রথমে আমরা বলবো: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অনুগ্রহ ব্যাপক, তার রহমত সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। তিনি তার কল্যাণ ও

দয়াকে তার বান্দাদের জন্য বন্ধ করে রাখেননি।

এর সমর্থনে রয়েছে রাসূল ﷺ এর হাদিস-

“যে আল্লাহর নিকট সত্য দিলে শাহাদাত কামনা করে, আল্লাহ তাকে শহীদদের মর্যাদায় পৌঁছে দেন, যদিও সে নিজের বিছানায় মারা যায়।”

যে আল্লাহর নিকট শাহাদাত কামনা করে, আর এ ব্যাপারে আন্তরিক হয়, আল্লাহ তাকে শহীদদের মর্যাদা দান করবেন। শর্ত হল এই শাহাদাত কামনার ক্ষেত্রে সে আন্তরিক হতে হবে।

তাহলে যে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য কষ্ট, বিপদ, পরিশ্রম ইত্যাদির সম্মুখীন হবে, তার মর্যাদা কতটুকু হতে পারে!?

আর মুজাহিদা নারীদের এমন শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, যা অন্য নারীদের নেই। কারণ যেহেতু আল্লাহ মুজাহিদের জন্য একশ’টি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত করে রেখেছেন, আর যখন মুজাহিদ এই সকল স্তরসমূহে প্রবেশ করবে ... যখন কোন মানুষ শহীদ হিসাবে নিহত হবে এবং সে জান্নাতের উচ্চস্তরে পৌঁছবে, সুউচ্চ ফেরদাউসে স্থান লাভ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার সাথে তার স্ত্রীকেও ঐ সকল স্তরসমূহে পৌঁছে দিবেন, যদিও সে নিজস্বভাবে এর থেকে অনেক নিম্নস্তরে থাকে।

এই ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

“ আর যারা ঈমান আনে, আর ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের বংশধররা তাদের অনুসরণ করে, আমি তাদের সাথে তাদের বংশধরকে অন্তর্ভুক্ত করবো, আর এতে তাদের সওয়াব থেকে কিছুও কমাবো না। প্রতিটি মানুষ নিজ আমলের সাথে আবদ্ধ।”

এটা আল্লাহ তা'আলার একটি রহমত, অনুগ্রহ, উদারতা ও মহান দান যে,

কোন মানুষ যখন জান্নাতের কোন উচ্চস্তরে থাকবে, আর তার স্ত্রী, তার সন্তান বা তার পরিবার ও বংশধরের কেউ তার থেকে নিম্নস্তরে থাকবে, তখন আল্লাহ তাআলা নিম্নস্তরের ব্যক্তিকে উচ্চস্তরের ব্যক্তির স্তরে পৌঁছে দিবেন। আর তাদের নেকিও কিছুমাত্র কমাবেন না। আর এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।

তাহলে মুজাহিদের স্ত্রীর এই মর্যাদা লাভ হবে! এমনকি যদি সে তাকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ না করে, তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য নাও করে।

তাহলে সে (স্ত্রী) যদি তার সাহায্যকারী হয়, তাহলে কি মর্যাদা লাভ হতে পারে?

অতএব আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অধিক মর্যাদা ও বিনিময় দান করবেন। এখানে আরেকটি বিষয় আছে, তা হল: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: যে কোন নেককাজের দিকে আহ্বান করে, তাকেও ঐ সকল ব্যক্তিদের সমপরিমাণ বিনিময় দন করবেন, যরা কিয়ামত পর্যন্ত তার উপর আমল করবে। আর এর কারণে তাদের বিনিময়ে সামান্যও ঘাটতি করবেন না।

কল্যাণের দিকে আহ্বানকারীরও সেই পরিমাণ বিনিময় লাভ হবে, যা তার ডাকে সাড়াদানকারীর লাভ হয়। যেকোন কল্যাণের দিকে আহ্বানকারীর।

উদাহরণ স্বরূপ, যেমন কোন ব্যক্তি যদি কাউকে সদকা করার বা সালাতুদ দুহা পড়ার বা অন্য কোন ইবাদত করার আদেশ করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা এই আমলকারীর জন্যও তার আমলের সওয়াব লিখবেন, আবার যে তাকে আদেশ করেছে, ডেকেছে এবং এই কল্যাণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে, তার জন্যও ঐ আমলকারীর সমপরিমাণ সওয়াব লিখবেন, শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগহ স্বরূপ।

এমনিভাবে কোন নারী তার স্বামীকে বা ভাইকে বা তার নিকটাত্মীয়কে বা অন্য কাউকে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ডাকলো, অতঃপর উক্ত ব্যক্তি তাতে সাড়া দিল, অথবা তাকে কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য আহ্বান করল বা তাকে কোন ইস্তেশহাদী হামলা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করল, অতঃপর উক্ত ব্যক্তি তাতে সাড়া দিল এবং সে যাতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তা পালন করল, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্যও ঐ ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব লিখবেন।

এটাই এই হাদিসের উদ্দেশ্য। বান্দা যে নেক আমলের নিয়ত করে, যেটাকে আগ্রহ সহ পালন করতে চায় এবং যেটা দাওয়াতের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে চায়, আল্লাহ তা'আলা তাকে তা পালন করার সওয়াব দান করেন।

ফলে অনেক সময় মানুষ জিহাদ করতে অক্ষম হয়, কিন্তু সে আল্লাহর নিকট দু'আ করে, মানুষকে এর উপর উদ্বুদ্ধ করে, এর দিকে আহ্বান করে, ফলে সে যখন কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট আসবে, তখন তার নেকির পাল্লায় বহু সংখ্যক শহীদের ও বহু সংখ্যক জিহাদের সওয়াব লেখা হবে।

একারণে মুজাহিদা নারী যখন কিয়মাতের দিন আল্লাহর নিকট আসবে, তখন তার নেকির পাল্লায় ঐ সকল বাচ্চারাও থাকবে, যাদেরকে সে জিহাদের শিক্ষা দিয়ে প্রতিপালন করেছিল।

যখন অনেক মুসলিম এমন রয়েছে- আমরা আল্লাহর নিকট মুক্তি কামনা করছি, আল্লাহর নিকট দু'আ করি, আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত দান করুন এবং তাদের অবস্থা সংশোধন করে দিন! -যারা তাদের সন্তানদেরকে খেলোয়ার, শিল্পী ও অভিনেতার আদর্শ অনুসরণের উপর বড় করে তোলে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল অবস্থা হল, যে দ্বীনি বিষয়াদী ভুলে শুধু তার

দুনিয়ার পিছনে পড়ে থাকে।

কিন্তু মুজাহিদের স্ত্রী, যে তার পরিবারকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর আদর্শের উপর এবং আল্লাহর পথের মুজাহিদদের সাহায্য করার আদর্শের উপর প্রতিপালন করে এবং তাদের মধ্যে বপন করে জিহাদের বীজ, শাহাদাত ও শহীদদের মর্যাদার শিক্ষা এবং দ্বীনের সাহায্য করার শিক্ষা ... যে নারী তার পরিবারবর্গকে এর উপর প্রতিপালন করবে, সে কিয়ামতের দিন এমতাবস্থায় তার প্রভুর সামনে আসবে যে, তার নেকির পাল্লায় তারা সকলে থাকবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে একত্রিত করে দিবেন।

যদি সে তাদের থেকে উচ্চ মর্যাদার হয়, তাহলে আল্লাহ তাদেরকে তার স্তরে পৌঁছে দিবেন। আর যদি তারা তার থেকে উচ্চ মর্যাদার হয়, তাহলে আল্লাহ তাকে তাদের স্তরে পৌঁছে দিবেন।

যেমনটা আল্লাহর নিম্নোক্ত আয়াতে স্পষ্ট:

“ যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের বংশধরও ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের বংশধরকেও তাদের সাথে মিলিয়ে দিবো। আর এতে তাদের আমলের সওয়াব সামান্যও কমাবো না। প্রতিটি মানুষ নিজ আমলের সাথে আবদ্ধ।”

এমনিভাবে জিহাদের মহা সওয়াবের একটি হল, যেটা মুজাহিদা নারীদের জন্য একটি প্রশস্ত দরজা, তা হল: দু’আ।

মুজাহিদগণ তাদের যুদ্ধে কষ্ট করে, তাদের বের হওয়ার মধ্যে কষ্ট করে, শত্রুদের প্রতীক্ষায় বসে থাকার মধ্যে কষ্ট করে, কিন্তু তাদের সাথে খুব সামান্য অস্ত্র থাকে। কিন্তু তাদের সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সবচেয়ে ভয়ংকর অস্ত্র, যেটা আনতে শত্রুরা অক্ষম এবং যা প্রতিটি

বুঝমান মুসলিমের জন্যই সহজ; এমনকি লুলা, পরকালগামী বৃদ্ধ ও ক্ষীণ বৃদ্ধাদের জন্য সহজ, তা হল: দু'আ।

কারণ বান্দার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা বা আড়াল নেই। প্রতিটি বান্দাই পারে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে জাগ্রত হতে, আল্লাহর সামনে আপ্রাণভাবে প্রার্থনা করতে, কাকুতি মিনতি করতে, তার সামনে ভেঙ্গে পড়তে এবং তার সামনে বিগলিত হতে, যেন তিনি মুজাহিদদেরকে সাহায্য করেন, তাদেরকে বিজয় দান করেন এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।

কারণ মুজাহিদগণ যে সকল অস্ত্র ব্যবহার করে, তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে বড় অস্ত্র। কোন পুরুষ বা নারী যেন নিজেকে তুচ্ছ মনে না করে, কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা লজ্জাশীল সম্মানিত। যখন বান্দা তার নিকট দু'আর হাত তুলে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ব্যর্থ করতে ও খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জা পান।

প্রয়োজন শুধু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দিকে মনোযোগী হওয়া, কাকুতি মিনতি করা, দীর্ঘ সিজদা করা এবং আল্লাহর নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করা। তার সুন্দর নামসমূহ ও সুউচ্চ গুণাবলী উল্লেখ করে।

বেশি বেশ দু'আ করা। কারণ বান্দাকে এই দু'আর জন্যও সওয়াব দেওয়া হবে। এমনকি যদি দু'আটি কবুল নাও হয়, তথাপি আল্লাহ এর বিনিময়ে বান্দাকে সওয়াব দিবেন।

মুজাহিদা স্ত্রীদের থেকে যেটা কাম্য, তা হচ্ছে আনুগত্য ও নেক আমল। আর মুজাহিদের স্ত্রীদের জন্য আল্লাহ সহজ করে দিয়েছেন, তারা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর ক্ষেত্রে তাদের স্বামীদের সহযোগী হতে পারে, তাদের কষ্টে, বিপদে ও পরিশ্রমে তাদের সঙ্গ দিতে পারে।

কারণ এই যামানার একজন মুজাহিদের জীবন সেই যামানার একজন মুজাহিদের জীবনের মত নয়। কারণ বর্তমানে মুজাহিদগণ ও তাদের স্ত্রীগণ এমন বিপদাপদের সম্মুখীন হন, যা পূর্ববর্তী যামানার মুজাহিদগণ ও তাদের স্ত্রীগণকে সহ্য করতে হত না।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর যামানায় মুজাহিদগণ তাদের ঘর-বাড়িতে স্ত্রী-সন্তানদের সাথে, কৃষিক্ষেত্র, দোকান, বাজার ইত্যাদির মাঝেই থাকতেন। অতঃপর যখন কোন আহ্বানকারী যুদ্ধের জন্য আহ্বান করত, তখন যুদ্ধে বের হয়ে পড়তেন, এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ, একমাস বা তার চেয়ে কম-বেশ সময়ের জন্য। অতঃপর আবার তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতেন।

পক্ষান্তরে বর্তমান যামানায় যখন কোন মুজাহিদ জিহাদের পথ অবলম্বন করে, তার বিরুদ্ধে পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রগুলোর পক্ষ থেকে, দুনিয়ার সমস্ত শক্তিগুলো ও তাদের সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে যুদ্ধ করা হয়। সে হয়ে যায় বিতাড়িত, নির্বাসিত। তার জন্য সকল কাজ ও চাকরির দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তাকে বিতাড়িত করা হয়, নির্বাসন দেওয়া হয়, শাস্তি দেওয়া হয়। তার উপর সর্বপ্রকার বিপদ ও কষ্ট অবধারিত হয়ে যায়। অনেক সময় দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য হয়, অনেক সময় স্ত্রী-সন্তানদের থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করা হয়।

পিঠ সোজা করার মত রিযিক পায় না। এই পরিমাণ অর্থকড়ি পায় না, যার দ্বারা তার নিজের ও পরিবারবর্গের খরচ চালাবে। উপযুক্ত জায়গা, উপযুক্ত আশ্রয় পায় না। এই সকল বিপদ আপদ তার জন্য অবধারিত হয়ে যায়।

তাই যখন কোন মুজাহিদ এমন নেককার স্ত্রী পায়, যে তাকে এই সকল বিপদাপদ ও কষ্টে সাহায্য করে, সর্বদা তার সাথে থাকে এই চিন্তা করে যে,

এই দুনিয়া ধ্বংসশীল, এটা অতিক্রম করে চলে যাওয়ার একটি জগত; স্থায়ী বসবাসের জায়গা নয়, নশ্বর জগত; স্থায়ী জগত নয়।

যে তার সাথে ধৈর্য্যরে সাথে অটল থাকে এই চিন্তা করে যে, কোন মুমিন বা মুমিনা যত বিপদাপদ, কষ্ট ও সংকীর্ণতার সম্মুখীন হয়, তার জন্য তাদেরকে কিয়ামতের দিন বিনিময় দেওয়া হবে। বলা হবে যে, আল্লাহর এই বান্দা ধৈর্যশীল ছিল অথবা এই স্ত্রী, মুজাহিদের স্ত্রী ধৈর্যশীল ছিল, সে তার স্বামীকে ধৈর্য ধারণ করতে উৎসাহিত করেছে, তাকে সাহায্য করেছে, সে ছিল তার উত্তম সহযোগী, তখন উক্ত মুজাহিদ আল্লাহর হুকুমে তার জন্য প্রতিহতকারী ও সাহায্যকারী হবে।

উক্ত স্ত্রী হবে খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রা: এর মত, যখন তার নিকট রাসূলুল্লাহ (ﷺ)আসলেন, যে সময় তার নিকট ওহী এসেছিল, ফলে তিনি অনেক ভীত হলেন এবং তার নিকট তা প্রকাশ করলেন, তখন তিনি বললেন: কখনো নয়; আল্লাহর শপথ! আল্লাহ কখনো আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না, আপনি আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা করেন, বোঝা বহন করেন, হারানো জিনিস কুড়িয়ে দেন, মেহমানদের মেহমানদারী করেন এবং সত্য বিপদে সাহায্য করেন। এভাবে তিনি তাকে সাহস দেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তার স্ত্রীর মাধ্যমে তাকে দৃঢ় করেন। এমনিভাবে মুজাহিদের স্ত্রীও।

মুজাহিদের অনুভূতি ভিন্ন রকম হয়ে যায়, যখন সে তার স্ত্রীর নিকট আসে বা তার সাথে কথা বলে বা তার সাথে যোগাযোগ করে আর তখন সে অনেক বিপদ বা কষ্ট থাকে, অথবা স্ত্রী থেকে দীর্ঘ বিচ্ছেদে থাকে অথবা তাকে রেখে কোন জিহাদী ব্যস্ততায় দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দেয়, আর তখন তার স্ত্রী তাকে বলে: **আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করুন, আল্লাহ আপনার**

সাহায্যে থাকুন, আল্লাহ আপনাকে অবিচল রাখুন! আপনি অটল থাকুন, কারণ আপনার অবিচলতাই আমাদের অবিচলতা। নিশ্চয়ই দুনিয়া ধ্বংসশীল ...। এভাবে সে তাকে সাহস যোগায় ও সঠিক পথ প্রদর্শন করে, তাহলে এ সকল কথাগুলো মুজাহিদের জন্য সাহায্যকারী ও রক্ষাকারী হবে।

এই দুই নারীর সাথে ব্যবধান ... তথা উপরিল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের নারীর সাথে আর এমন নারীর সাথে, যার স্বামী তার সাথে কথা বললে বা তার সাথে যোগাযোগ করলে, সে বলে: আপনি কোথায় আছেন, আপনার অনুপস্থিতি আমাদেরকে কষ্ট দিয়েছে, আপনি যাওয়ার পরে আমরা কষ্ট ও সংকীর্ণতায় কাটিয়েছি। আমাদের জীবনটা অনেক কষ্টের, আপনি আমাদের নিকট ফিরে আসতে চান না, কত দিন পর্যন্ত এই বিচ্ছিন্ন জীবন ... কতদিন পর্যন্ত চলবে এই বিপদ?

ফলে সে এমন কষ্ট, সংকীর্ণতা ও বিষণ্নতা অনুভব করে, যা অনেক সময় তার জন্য দুর্বলতার কারণ হয়, অনেক সময় তার বিকৃতি ও জিহাদ বর্জন, আত্মসমর্পণ ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ থেকে বিমুখ হয়ে যাওয়ার কারণ হয়। আর এগুলোর কারণ হল শুধু তার স্ত্রী।

কত পুরুষ জিহাদে অটল থেকেছে, আর তার অটল থাকার কারণ ছিল তার নেককার স্ত্রী। আর কত পরুষ জিহাদের পথ ছেড়ে দিয়েছে, আর তার জিহাদের পথ ছাড়ার কারণ ছিল তার স্ত্রী, যে আল্লাহর পথে কুরবানী করতে চায়নি এবং তার উপর সংকল্প করেনি, যে আল্লাহর কোন বিনিময় লাভ করতে চায় না, আল্লাহর পথে কোন কষ্ট সহ্য করতে চায় না।

জিহাদের পথে এবং একজন মুসলিমের জীবনে প্রতিটি জিনিসের মধ্যে

সওয়াবের নিয়ত করা যায়। প্রতিটি জিনিসের মধ্যে বিনিময় আছে। যেকোন কষ্টের মধ্যে বিনিময় আছে, অসুস্থতার মধ্যে বিনিময় আছে, প্রচন্ড ঠান্ডার মধ্যে বিনিময় আছে, খাবারের ঘাটতির মধ্যে বিনিময় আছে। কষ্ট, কাঠিন্য, প্রচন্ড গরম, প্রচন্ড ঠান্ডা, রোগ, স্ত্রীর বিচ্ছেদ, সন্তানের বিচ্ছেদ, স্বামীর বিচ্ছেদ সন্তানদের থেকে, সন্তানদের বিচ্ছেদ স্বামী থেকে, স্ত্রীর বিচ্ছেদ স্বামী থেকে ... সেই ভুমি থেকে বিচ্ছেদ, যেখানে স্থায়ীভাবে থাকা মানুষের নিকট প্রিয়- এ সকল কিছুর মধ্যেই বিনিময় রয়েছে। যা বান্দা কিয়মাতের দিন দেখতে পাবে। ফলে যখন কিয়মাতের দিন আসবে, তখন নেকির পাল্লায় অনেক এমন আমল দেখতে পাবে, যেগুলো থাকার বিষয়টি সে ধারণাও করত না। আল্লাহর নিকট বিনিময় প্রাপ্তির আশা রাখার বিষয়টি ব্যাপক। বান্দা যে বিষয়েই সওয়াব প্রাপ্তির আশা করে, তাকে তাতেই বিনিময় দেওয়া হয়।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

“ অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো, কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং সম্পদ ও ফলমূলের ঘাটতির মাধ্যমে। আর ধৈর্য্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও।”

কারা ধৈর্য্যশীল? **“যাদের কোন বিপদ ঘটলে, তারা বলে, আমরা তো আল্লাহর জন্যই এবং আমরা তার দিকেই ফিরে যাবো।”**

বিপদ, যেকোন ধরণের বিপদ, কষ্ট, ভয়, সংকট, দীর্ঘ সফর, দীর্ঘ পরিশ্রম, খাবারের স্বল্পতা, পানীয়ের স্বল্পতা, সন্তানদের থেকে স্বামীর বিচ্ছেদ, স্ত্রীর তিক্ততা, তার কষ্ট, তার পরিবারের কষ্ট, তথা এমন যা কিছুরই সম্মুখীন হয়, যেটাকে সে অপছন্দ করেসেটাই বিপদ।

মুমিন বান্দা এসকল বিপদের মোকাবেলায় ধৈর্য্যশীল থাকে। তার কোন বিপদ আসলে সে বলে: আমরা আল্লাহর জন্যই এবং আমরা তার নিকটই ফিরে যাবো। তাদের এই অবস্থার ফলাফল কি?

“ ঐ সকল লোকদের উপর বর্ষিত হয় তাদের প্রভুর পক্ষ হতে প্রভুত রহমত ও দয়া এবং তারাই সুপথপ্রাপ্ত।”

কল্যাণের যে সকল দরজাসমূহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুজাহিদা, তথা মুজাহিদের স্ত্রীর জন্য খুলে দিয়েছেন ও তার জন্য সহজ করেছেন, তার মধ্যে একটি হল: যেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: প্রত্যেক নেক কাজই সাদাকা। তাহলে যে ভাল বিষয়ই কোন মুসলিম তার মুসলিম ভাইয়ের জন্য পেশ করে, সেটাই সদকা। যেটার মাধ্যমে সে সদকা করছে। যেটা সে তার নেকির পাল্লায় পাবে।

আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদা বোনদের জন্য মুজাহিদের খেদমত করা ও তার সাহায্য করা সহজ করে দিয়েছেন, তার খাবার পাকিয়ে দেওয়া, তার কাপড় চোপর ধুইয়ে দেওয়া, তার প্রয়োজন পুরা করা, ঔষধ ঠিক করে দেওয়া, কিছু কিছু রোগের চিকিৎসা করা ... মুজাহিদদেরকে যেকোন প্রকারে সাহায্য সহযোগীতা করা- এ সকল সহযোগীতাগুলো সদকা হিসাবে বিবেচিত হবে। বান্দা এর মাধ্যমে কিয়ামতের দিন বিপদ ও আযাব দূর করতে পারবে।

মুজাহিদ ও মুজাহিদাদের জন্য আরো যে সকল নেক আমলের পথ আল্লাহ খুলে দিয়েছেন, তার মধ্যে একটি হল: ঈমানী ভ্রাতৃত্ব, যেটা ভালবাসা, উদারতা ও সম্প্রতি সৃষ্টি করে, ফলে সে তার মুসলিম ভাইদের সাথে সহজ, কোমল ও উদার থাকে।

আল্লাহ তা'আলা সূরা হাশরে বিভিন্ন প্রকার মুমিনদের আলোচনা

করেছেন। প্রথম দল হিসাবে উল্লেখ করেছেন মুহাজির ও আনসারদের দলকে। অতঃপর তিনি মুহাজিরদের প্রশংসা করেন, যারা তাদের দেশ ও সম্পদ আল্লাহর পথে ত্যাগ করেছে। অতঃপর তাদের পরে আনসারদের প্রশংসা করেছেন, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন:

“ তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্থ হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। ”

কি সেই বৈশিষ্ট্যগুলো, যেগুলো আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বর্ণনা করলেন? তা হল: **“তারা নিজেদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের প্রচন্ড ক্ষুধা থাকে।”** অর্থাৎ তারা যদিও সংকীর্ণতা, সংকট, দারিদ্র্য ও ক্ষুধায় থাকে, তথাপি তারা তাদের মুমিন ভাইদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়।

এই মূল ঘটনাটি নাযিল হয়েছে একজন সাহাবীর ব্যাপারে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট একজন মেহমান আসল। রাসূলুল্লাহ তার মেহমানদারী করতে চাইলেন। কিন্তু তিনি তার বাড়িতে পানি ছাড়া কিছু পেলেন না। তখন রাসূল(ﷺ) তার সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বললেন: কে তার মেহমানদারী করতে পারবে? আল্লাহ তার উপর রহম করবেন।

তখন একজন আনসারী সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন: আমি, হে আল্লাহর রাসূল। তিনি তার ঘরে প্রবেশ করে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন: ঘরে কি কিছু আছে? স্ত্রী বলল: শুধুমাত্র আমার শিশু বাচ্চাদের খাবার ছাড়া কিছুই নেই। তখন সাহাবী বললেন: এ তো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর মেহমান। তখন ঐ স্ত্রী কি বলেছিলেন ?! তিনি কি বলেছিলেন,

আমাদের নিকট কিছু নেই। আছে শুধু ক্ষুধা, পিপাসা, কষ্ট, বিপদ, সংকট।

আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণ খাবার নেই।

না, তিনি এটা বলেননি। বরং তিনিও তার স্বামীর সাথে ধৈর্য্য ধারণ করলেন, সহ্য করলেন। তখন সাহাবী তার স্ত্রীকে আদেশ করলেন, যেন বাচ্চাদেরকে রাতের খাবার ব্যতীতই ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়।

অতঃপর তারা সম্পূর্ণ খাবারটাই মেহমানের সামনে পেশ করে দিলেন। তারা কিছুই খেলেন না। এভাবে স্ত্রীও তার স্বামীর সাথে মেনে নিলেন এবং ধৈর্য ধারণ করলেন।

সকাল বেলা উক্ত সাহাবী রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট গেলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন: গতকাল তোমাদের মেহমানদের সাথে তোমাদের আচরণে আল্লাহ মুগ্ধ হয়েছেন এবং আল্লাহ তা'আলার এই বাণী নাযিল হয়েছে:

“ তারা নিজেদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের প্রচন্ড ক্ষুধা থাকে। আর যাকে মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, ঐ সকল লোকই তো সফলকাম।”

যখন বান্দা মানষিক কার্পণ্য থেকে মুক্ত হয় এবং নিজের স্বার্থ, নিজের মনোবাসনা এবং নিজের দুনিয়াবী অংশ পাওয়ার লোভ থেকে মুক্ত হয়, তখনই সে সফলকামদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

মুহাজির ও আনসারদের পর আল্লাহ তা'আলা পৃথকভাবে ঐ সকল লোকদের কথা বলেছেন, যারা তাদের যথাযথ অনুসরণ করেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

“ আর তাদের পরে যারা এসেছে, তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে ও আমাদের ঐ সকল ভাইদেরকে ক্ষমা কর, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের

জন্য বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই তুমি দয়াশীল, অনুগ্রহকারী।”

মুমিনের উপর আবশ্যক হল তার অদৃশ্য বিষয়াবলী, তথা তার মনে তার মুমিন ভাইদের ব্যাপারে যে হিংসা বিদ্বেষ আছে তা দূর করা।

মুমিনদের হওয়া উচিত পরস্পরের ব্যাপারে স্বচ্ছ হৃদয়, যাতে কোন হিংসা-বিদ্বেষ ও প্রতারণা থাকবে না। বান্দা এগুলো দূর করতে চেষ্টা করবে এবং ক্ষমা করে দিতে চেষ্টা করবে। তাই সে ক্ষমা করে দিবে এবং এড়িয়ে যাবে। কারণ যে ক্ষমা করে, আল্লাহও তাকে ক্ষমা করে দেন। ফলে যে ক্ষমা করে দেয়, মানুষের ভুলগুলোকে এড়িয়ে যায় এবং তার উপর যত সীমালঙ্ঘন ও জুলুম করা হয়েছে, তাকে মার্জনা করে দেয়, আল্লাহ তা'আলাও তাকে ক্ষমা করে দেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন:

“ তারা যেন ক্ষমা করে দেয়, এড়িয়ে যায়। তোমরা কি চাওনা, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিক? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াশীল।”

বান্দার উচিত, আল্লাহর নিকট এই দু’আ করা যে, আল্লাহ যেন তার অন্তরকে পুত-পবিত্র করে দেন এবং তার মুসলিম ভাইদের জন্য স্বচ্ছ করেন। ফলে তার অন্তরে তাদের ব্যাপারে কোন প্রতারণা না থাকে, কোন হিংসা না থাকে। বান্দা যখন এই স্তরে পৌঁছে, তখন এটাই জান্নাতবাসীদের বৈশিষ্ট্য।

একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ, জনৈক সাহাবীর ঘটনা। একবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বললেন: তোমাদের মাঝে একজন জান্নাতী লোক প্রবেশ করবে। অতঃপর এমন একজন লোক প্রবেশ করলো, যার মধ্যে তারা অধিক নামাযের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পেলেন না। এভাবে দ্বিতীয় দিন ও তৃতীয় দিনও একই বিষয় ঘটল।

তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা: তার পিছু নিলেন। তিনি বললেন: আমি আমার বাবার সাথে ঝগড়া করেছি, এখন যদি তুমি আমাকে তিন দিনের জন্য আশ্রয় দাও, যাতে আমি আমার অবস্থাটা দেখে নিতে পারি, তাহলে ভাল হত! তখন লোকটি তাকে তিন দিনের জন্য আশ্রয় দিল। আর তিনি তিন রাত তার সাথে উঠাবসা করলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা: এর লক্ষ্য ছিল, অর্থাৎ তিনি চিন্তা করেছিলেন এই লোক তো অধিক ইবাদতের মাধ্যমেই এই মর্যাদায় পৌঁছেছে, তাই তিনি তার রাত্রিজাগরণ ও রাতে নামাজের অবস্থা দেখতে চাইলেন, হয়তো এতে রহস্য উম্মোচিত হবে।

তাই তার সাথে তার বাড়িতে রাত্রি কাটালেন। কিন্তু তিনি তাকে অধিক নামাজ পড়তে দেখলেন না বা এরকমও দেখলেন না যে, সে যখনই রাত্রিবেলা পার্শ্ব পরিবর্তন করে তখনই আল্লাহকে স্মরণ করে।এভাবে যখন তিন রাত্রি শেষ হলো: তখন আব্দুল্লাহ তাকে বললেন:আসলে আমার মাঝে ও আমার পিতার মাঝে কিছুই ঘটেনি। কিন্তু রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আপনার ব্যাপারে এই এই বললেন। তাই আমি চাইলাম, আপনার আমল দেখতে। কিন্তু আমি আপনার অধিক আমল দেখতে পেলাম না। তখন লোকটি বলল: ইবাদতের ব্যাপারটা আপনি যেমন দেখেছেন, তেমনই, কিন্তু আমার অন্তরে মুসলিমদের ব্যাপারে কোনো কপটতা, হিংসা,বিদ্বেষ নেই। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বললেন: এটাই আপনাকে এই মর্যাদায় পৌঁছিয়েছে। এমনিভাবে মুসলিমদের উচিত পরস্পরের ব্যাপারে স্বচ্ছ হৃদয় হওয়া। রাসুল (ﷺ) বলেছেন: তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার ভাইয়ের জন্যও সেই জিনিস পছন্দ না করে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে।

মুজাহিদাহ:

মুজাহিদের জীবন সঙ্গিনী...

উম্মে ইয়াহইয়া

হে মুজাহিদাহ! হে গারীবাহ! হে দুনিয়ার উপর আখিরাতকে প্রাধান্যদানকারিনী! হে আমার দ্বীনী বোন, সম্মানিত মুজাহিদের স্ত্রী ও তাঁর শ্রেষ্ঠ সঙ্গিনী, সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহর জন্য।

মাশাআল্লাহ, আপনি আর সমস্ত নারীর চেয়ে ভিন্ন। আপনি একজন মুজাহিদাহ, ঠিক আপনার স্বামীর মত। আপনি আল্লাহর বাহিনীর একবীর সেনানী! নিশ্চয়ই আপনি মজবুত হৃদয়ের অধিকারিণী। আপনি নিজের জন্য যে জীবন পছন্দ করেছেন তাতে আপনার সুযোগ রয়েছে বিরাট এক ভূমিকা রাখার এবং জগদ্বাসীর কাছে একটি বার্তা পৌঁছে দেয়ার। আপনি পশ্চিমাদের দূষিত দুনিয়া থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে, আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে এক মহান রাস্তায় চলছেন। হে আমার দ্বীনী বোন, এই রাস্তায় চলতে কী প্রয়োজন সেটা আপনার বোঝা উচিৎ। আপনার বোঝা উচিৎ এ রাস্তায় আপনাকে কী করতে হবে, আপনার জীবনে কেমন প্রতিক্রিয়া হবে এবং আপনাকে কিরকম বাঁধার সম্মুখীন হতে হবে। নিঃসন্দেহে মুজাহিদের জীবন সবচেয়ে প্রশান্তিময়, কিন্তু জিহাদের রাস্তা আরাম আয়েশের ফুলশয্যা নয়। জিহাদের রাস্তায় আপনার সম্পদহানী হবে, অনেক বন্ধুকে বিদায় জানাতে হবে এবং সর্বোপরি আপনাকে নিজের প্রিয় পরিবার ও ঘর ছেড়ে চলে আসতে হবে। আপনাকে প্রচণ্ড ধৈর্য্যের পরিচয় দিতে হবে, মনের বিভিন্ন খায়েশকে দমিয়ে রাখতে হবে। তাই, বোন আমার, সবসময় এই দোয়াটি পড়বেন-

"ইয়া মুক্বাল্লিবাল ক্বুলুবওয়াল আবসার, সাব্বিত ক্বুলুবানা 'আলা দীনিক।" (হে হৃদয় ও বিবেকের পরিবর্তনকারী! আমাদের হৃদয়গুলোকে তোমার দ্বীনের উপর অটল করে দাও।)

দুঃখ-কষ্ট জিহাদকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। বিশ্বাস করুন, এই রাস্তায় কষ্ট ছাড়া আপনার জীবন একেবারেই পানসে লাগবে। আপনার সঙ্গীর সাথে বেছে নেয়া এই রাস্তায় আপনাকে অতি অবশ্যই যে বিষয়ের সম্মুখীন হতে হবে, তা হল- জিহাদ ও জিহাদের সন্তানদের ব্যাপারে মিডিয়ার মিথ্যাচার ও গুজব। দুঃখের কথা হল, আপনার আশপাশের বহু মুসলিমকে দেখবেন, মিডিয়ার এই অপপ্রচার বিশ্বাস করে বসে আছে। সুতরাং আপনার উচিৎ, হে আমার ভাগিনী, মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের সেনানীর দায়িত্ব পালন করা। আপনাকে দৃঢ়পদ হতে হবে, এবং কাফেরদের প্রোপাগান্ডা বিন্দু পরিমাণ বিশ্বাস করা থেকেও বিরত থাকতে হবে। আপনার মুজাহিদ স্বামী এবং তাঁর সাথীগণ প্রতিনিয়ত পশ্চিমা ক্রুসেডার এবং তাদের দালালদের হিংস্র হামলার স্বীকারে পরিণত হচ্ছেন। কী লজ্জার বিষয়! এইদালালগুলো আমাদের সমাজেরই লোক! ঈমান ও কুফরের এই যুদ্ধে তারা মিথ্যা ছড়িয়ে বেড়ানোকে নিজেদের দায়িত্ব বানিয়ে নিয়েছে যেন লোকরা জিহাদের বরকতপূর্ণ রাস্তায় আসা থেকে বিরত থাকে, তরুণরা মুজাহিদীনদের সমর্থন করা থেকে বিরত থাকে, এবং জিহাদের কাফেলা ছোট থেকে যায়। এভাবে দালালগুলো তাদের চেষ্টা চরিত্রের দ্বারা কাপুরুষদের সংখ্যা বাড়াচ্ছে, যারা নিজেদের দ্বীনের জন্য কোন রকম ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত না।

মুসলিমদের ঘরে ঘরে আজ কুফফারদের মিথ্যাচার প্রবেশ করেছে এবং বহু লোক তাদের কথা বিশ্বাস করেছে- আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত দাণ করুন। সুতরাং আপনাকে এই বাস্তবতা বুঝতে হবে এবং মিডিয়া যুদ্ধের ব্যাপারে আপনাকে সচেতন হতে হবে। আমাদের শত্রুরা যাকে পাচ্ছে তাকেই ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করছে। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা হল, উম্মাহ সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের তথাকথিত 'আলেম'দের জিহাদ বিরোধী বক্তব্যের দ্বারা, যারা দুই পয়সার বিনিময়ে শত্রুর গোলামে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ! উম্মাহ জেগে উঠছে। জিহাদের মিডিয়া উপকরণ গুলো এখন নেটের সবজায়গায় ছড়িয়ে আছে। সুতরাং আপনি নিজেও এখানে অবদান রাখুন, সত্যপ্রচারে ব্রতী হউন। আমার সম্মানিত ও প্রিয় মুসলিমা বোন, সম্মানিত মুজাহিদের স্ত্রী। ...আপনার চারপাশে যারা জিহাদের বিরুদ্ধে কথা বলে তাদের ব্যাপারে সোচ্চার হউন। তাদেরকে সত্যবাদিতা ও বিজ্ঞতার পরিচয় দিতে উপদেশ দিন। তাদের আরও উপদেশ দিন যেন তারা কেবল একপক্ষের (মুজাহিদদের শত্রু) কথা না শুনে, অপরপক্ষের কী বলার আছে সেটাও যেন তারা শোনে। তাদেরকে বোঝান প্রচলিত মিডিয়ায় মুজাহিদদের ব্যাপারে কোন কিছু শুনলে যেন তারা মুজাহিদদের মিডিয়া থেকে এর সত্যতা যাচাই করে নেয়।

হে মুজাহিদের স্ত্রী! আপনি হয়ত ইতিমধ্যে বুঝে গিয়েছেন, শুধু আবেগ তাড়িত হয়ে থাকা এই পথে চলার জন্য যথেষ্ট নয় কিংবা কেবল প্রতিশোধস্পৃহা কিংবা কেবল হারানো সম্মান পুনরুদ্ধার করতে চাওয়ার ইচ্ছা জিহাদের রাস্তায় টিকে থাকার জন্য যথেষ্ট নয়। আপনাকে ইলম এবং

জ্ঞা ন দ্বারা নিজেকে প্রস্তুত ও অস্ত্র-সজ্জিত থাকতে হবে। ময়দানের ব্যাপারে নিজের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করুন, নবী ও মুজাহিদগণের পথকে উপলব্ধি করুন। তাওহীদের ফারয ও দ্বীনের অত্যাবশকীয় বিষয়গুলোর ইলম গোগ্রাসে আহরণ করুন। রোজানা কুরআন অধ্যয়ন করুন এবং দ্রুত নিজের দ্বীনকে ভালমত শিক্ষা করুন। নবীদের জীবনী পড়তে নিজেকে অভ্যস্ত করুন, তারা কীরূপ কষ্ট সহ্য করেছেন, কীরূপ ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন- তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। সাহাবায়ে কেরামের জীবনী পড়ুন ও বোঝার চেষ্ঠা করুন এবং তাদেরকে নিজের 'রোলমডেল' হিসেবে দেখুন। মুজাহিদগন (আল্লাহ তাঁদের সুরক্ষিত রাখুন) হলেন তাওহীদের শক্তিশালী পতাকা উত্তোলনকারী, ইসলামী শরীয়াহর অনুসারী, আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী ﷺ এর অনুসারী, যারা মুসলিম উম্মাহকে একতাবদ্ধ করছেন।

হে আগামীদিনের মুজাহিদের মা! আপনার সন্তানদেরকে দ্বীনের শিক্ষায় শিক্ষিত ও আলোকিত করার দায়িত্ব ও কর্তব্য আপনারই দুই ঘাড়ে । তারা আপনার জীবনের মহা মূল্যবান মণিমুক্তা। তারা আপনার আমানত। আপনি তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিন, ইসলামের ইতিহাস থেকে শিক্ষা দিন যেন তারা দ্বীনকে ভালবাসতে শুরু করে এবং এর জন্য যেকোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে যায়। সবচেয়ে বড় হল, তাদেরকে প্রকৃত ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার ও ভ্রান্তি থেকে সুরক্ষিত রাখুন। তাদেরকে এমনজ্ঞানে জ্ঞানী বানান, যা মুসলিম উম্মাহর জন্য উপকারী হবে।

আমার ইসলামী বোন! আপনি যদি আপনার দায়িত্ব পালন করে থাকেন,

তবে সত্যের পথে কয়জন আছে সেই সংখ্যা নিয়ে আপনার বিচলিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ সত্য হচ্ছে আল্লাহপ্রদত্ত, মহিমান্বিত; যদিও এর অনুসারীরা সংখ্যায় অনেক কম। আল্লাহ বলেন, "আর অধিকাংশ লোক আল্লাহকে বিশ্বাস করে কিন্তু তার সাথে অংশীদারও সাব্যস্ত করে। (অর্থাৎ খুব কম মানুষই শিরক মুক্ত হয়ে আল্লাহকে বিশ্বাস করে)" [১২: ১০৬] চিন্তা করুন, ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম তো একা ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তাকে একাই এক উম্মাহ বা জাতি আখ্যায়িত করেছেন।

আমার প্রিয় উখতি! যদি কখনও আপনার জীবনে পরাজয়ের বাতাস বয়ে আসে কিংবা মিসাইল অথবা বোমার বিস্ফোরণে আপনার চোখ বুজে যায় কিংবা কাফেরদের হাতে পরিচিত মুজাহিদদের বন্দিত্ব আপনার স্বামীকে বিষণ্ন করে দেয়, আপনি এক পলকের জন্যও তাকে এই কঠিনসময়ে একা ফেলে যাবেন না, তাকে সাহস ও হিম্মত দিতে থাকুন এবং তাকে আশ্বস্ত করুন, আপনি সবসময় তার পাশে আছেন।

হেরার গুহায় জিব্রাইল আলাইহিস সালামের সাথে আল্লাহর রাসুলের ﷺ যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তিনি অত্যন্ত ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। ভয়ে তিনি থরথর করে কাঁপছিলেন। এমন কঠিন সময়ে তিনি যখন স্ত্রী খাদীজার কাছে এসে বললেন, "আমাকে আবৃত কর, আমাকে আবৃতকর।" খাদীজা রা. তখন আল্লাহর রাসুলকে ঢেকে দিয়েছিলেন এবং তাঁর মনে সাহস যোগাতে চেষ্টা করছিলেন, এমনকি তিনি তাঁকে সম্পূর্ণ নির্ভয় করে ফেলতেও সক্ষম হয়েছিলেন। খাদীজা রা. কি নির্বিকার বসে ছিলেন কিংবা স্বামীর অস্বাভাবিক আচরনে বিরক্ত কিংবা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে

গিয়েছিলেন? অবশ্যই না! একজন স্ত্রী হিসেবে তিনি তাঁকে সান্তনা দিয়েছিলেন, সাহস যুগিয়েছিলেন এই বলে, "আল্লাহ কখনোই আপনাকে লজ্জিত করবেন না। আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক মজবুত করেন, দুর্বলদের সাহায্য করেন, দরিদ্র ও অসহায়দের পাশে থাকেন, অতিথিদের সম্মান করেন এবং সত্যের পথে কষ্ট স্বীকার করেন।"

প্রাণপ্রিয় বোন আমার! আপনার স্বামীর নাম হয়ত "মোস্ট ওয়ান্টেড" লিস্টের শীর্ষে আছেন, হয়তবা তিনি বন্দী হয়ে আছেন, তাঁর জীবনে হয়ত অনেক কষ্ট ও হতাশার ঝড়-ঝাপটা আসতে পারে। এমনসময়ে, আপনি যেন তার দুখে দুখী হন, তার ব্যাথায় ব্যাথিত হন, আপনি যেন তার পাশে থাকেন, তাঁকে সাপোর্ট দেন এবং তাকে সাহস ও শক্তি যুগিয়ে দেন; আপনি যেনতার কাধে মাথা রেখে বলেন-

"প্রিয়তম, চিন্তা করো না... ঠিক আছে, কোন সমস্যা নেই,
...তোমার আগে আম্মার রা. কেও এই একই কষ্ট বরদাশত করতে হয়েছে,
... তোমার আগে বিলাল রা. কেও ধৈর্য্যধরতে হয়েছে, ...
আর তোমার আগে সালাহুদ্দীন আইয়ুবী জয়ী
হয়েছিলেন। ...ইনশাআল্লাহ তুমিও জয়ী হবে; হয়ত শত্রুকে পরাজিত
করে নয়ত শাহাদাত বরন করে।"

(সমাপ্ত)

১২/১০/২০১৪ ইং

[Inspire ম্যাগাজিনের দ্বাদশ ইস্যুর Sisters' Corner: Mujahidah wife of a Mujahid প্রবন্ধ থেকে অনূদিত]

শহীদ উস্তাদ আহমাদ ফারুক রহিমাহুল্লাহ’র
মুহতারামা স্ত্রী’র ঈমানদীপ্ত স্মৃতিচারণ

তিনি ছিলেন এ ধরায় তাওহীদের সাক্ষী!

শহীদ উস্তাদ আহমাদ ফারুক রহিমাহুল্লাহ'র মুহতারামা স্ত্রী'র ঈমানদীপ্ত স্মৃতিচারণ

তিনি ছিলেন -এ ধরায় তাওহীদের সাক্ষী!

ভূমিকা

জনৈক কবি বলেছেন, "শহীদের আত্মদান জাতির তরে প্রাণ"।

এ কথা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত যে, একজন শহীদের মৃত্যুতে জাতির মাঝে এক জাগরনী উম্মাদনা সৃষ্টি হয়। মানুষ সেদিকে ধাবিত হয়। তারা চিন্তা ভাবনা করে যে, একজন ব্যক্তি এমনিতেই জীবন দিয়ে দিল? তার ধ্যান-ধারণা কি ছিল? তার এ চেষ্টা-প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য কি ছিল? তার কষ্টেভরা এ সফরের শেষ কোন মনযিলের উদ্দেশে ছিল? তার ব্যক্তিগত স্বভাব, চরিত্র ও গুনাবলী কি ছিল?

যেই জাতির মাঝে এই প্রশ্নগুলো সৃষ্টি হয়, তাদের মাঝে মুজাহিদীনের পরিচয় ও দাওয়াত ব্যাপক হয়। পরিণামে কিছু লোক ঐ দাওয়াতে প্রভাবিত হয়ে নিজ মুসলিম ভাই-বোনদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অত:পর সেও শহীদ হয়ে যায় এবং আরো অধিক লোক জেগে উঠার বীজ বপন করে যায়। এভাবেই সে পরবর্তী ফসল প্রস্তুত করে রেখে যায়।

শাহাদাতের এ ধারাবাহিকতা পর্যায়ক্রমে বংশ পরম্পরায় জাতির মাঝে (সফলতা অর্জনের উপযোগী) এক ইসলামী গণজাগরণের জোয়ার সৃষ্টি করে দেয়। ফলে একটা সময় এমন আসে যে. গোটা জাতি এক হয়ে নিজেদের

অস্তিত্ব ও ইসলামী জীন্দেগী টিকিয়ে রাখার জন্য দা'য়ী এবং সংরক্ষণকারী হয়ে যায়। এভাবেই একজন শহীদের মৃত্যু সমগ্র জাতির জন্য জীবন সঞ্চারণের কারণ হয়। সুতরাং প্রত্যেক যুগের আহলে ইলম, জ্ঞানী ও লেখকদের জন্য কর্তব্য হল- তারা উম্মাহর শহীদগনের জীবনী, চিন্তা-চেতনা, তাদের লেখাসমূহ ও ঈমানদীপ্ত ঘটনাগুলো জাতিকে জানিয়ে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করবেন। যাতে করে জাতি তার স্ব-জাতির স্বকিয়তা অনুযায়ী শহীদানের উপস্থিতি ও তাদের ত্যাগ-কুরবানীর বরকত থেকে বঞ্চিত না হয়।

প্রচলিত বাস্তবতা হল, কোন মানুষের ব্যক্তিগত জীবনাচার, গোপন ও প্রকাশ্য গুনাবলী সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত থাকে তার 'স্ত্রী'। কোন ব্যক্তির কৃতিত্বের ব্যাপারে তার স্ত্রী থেকে বেশি সত্য সাক্ষী আর কেউ হতে পারেনা।

তাছাড়া এটাও মনে রাখতে হবে যে, স্ত্রী কর্তৃক তার স্বামীর কৃতিত্বের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া এবং তার গুণাবলী ও কৃতিত্বের প্রকাশ করা নতুন কোন কথা নয়। আজ থেকে প্রায় চৌদ্দশত বছর পিছনে যদি আমরা তাকাই, তাহলে দেখতে পাই যে, একজন সৌভাগ্যবান স্ত্রী তার সম্মানিত স্বামীর শানে বলেছিলেন:

انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين علي نوائب ا

"আপনি তো আত্বীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, দুর্বলদের বোঝা নিজের কাঁধে উঠিয়ে নেন, অভাবীদের জন্য উপার্জন করেন, মেহমানদের মেহমানদারী করেন এবং সত্যের পথে কষ্ট সহ্য করেন।"

বিষয়টি হল, হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা নিজ স্বামীর কৃতিত্বের

সাক্ষ্যদানের যে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, তা কিয়ামত পর্যন্ত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মেয়েদের জন্য (স্বামীর কৃতিত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে) অনুসরণীয়ও হয়ে থাকবে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রত্যেক যুগের মা-বোনেরা নিজেদের নেককার ও সৎ স্বামীদের জীবনী ও কৃতিত্বের সাক্ষ্য দিয়ে আসছেন।

নিচের আলোচ্য বিষয়টিও আমাদের একজন সম্মানিতা বোনের লেখা, এটা না তার নিজের আত্বজীবনী, আর না কোন শহিদের জীবনী। বরং এটাতো শুধু তার স্বামীর ভালবাসা মিশ্রিত ঈমানদীপ্ত সাহচার্যের কিছু স্মৃতিচারণ মাত্র। এটাতে তিনি হিজরত ও জিহাদের বাগান থেকে কিছু ফুল বাছাই করে আমাদের সামনে পেশ করেছেন। যাতে এর সুঘ্রান দ্বারা আমরাও আমাদের ঈমান ও আমলকে সুশোভিত করতে পারি। কতইনা পবিত্র জযবাহ, যে ব্যাক্তিই তা পড়বে সেই শহিদের জীন্দেগী ও তাঁর লক্ষার্জনে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং হিজরত ও জিহাদের পরিপূর্ণ প্রতিজ্ঞা করে ফেলবে।

আমরা আমাদের এ বোনের প্রতি সর্বোচ্চ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এজন্য যে, তিনি এই উত্তম আমানত আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্য ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ নির্ধারন করুন। আমীন।

****

১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ২০০৬ সালের রমযানুল মুবারক আমার জন্য নতুন এবং দুর্লভ আনন্দের পয়গাম নিয়ে এসেছিল। আল্লাহ তা'য়ালা আমার দীর্ঘ দোয়া উত্তম ভাবে কবুল করেছেন, এবং আমাকে আমার চাওয়া মতো

নিয়ামত দান করে কৃতজ্ঞ করেছেন।

রমযানুল মুবারকের শেষ দশকে কথা চূড়ান্ত হয়েছিল। পনের-বিশ দিনের মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা রুখসতির(স্বামী কতৃক স্ত্রীকে উঠিয়ে নেয়ার) ব্যবস্থাও করেছেন। এই পরিবারের সাথে বিবাহের বিষয়টি ছিল একটু ভিন্ন ধরণের। এ বিবাহে কোন রকমের রং ঢং ছিলনা। সীমিত সংখ্যক এবং একেবারে কাছের কিছু মেহমান বিবাহে উপস্থিত ছিল। বিবাহ মসজিদে হয়েছিল এবং সেখান থেকেই রুখসতি হয়েছিল। পরের দিন সন্ধ্যাবেলা ওলিমা(বিবাহের পর স্বামীর পক্ষ হতে যে মেহমানদারী করা হয়) হয়েছিল। অর্থাৎ বিবাহের প্রায় আটচল্লিশ ঘন্টা পর আমাদের দাম্পত্য জীবন শুরু হয়। কোন জীবন এটা? এবং কেমন ছিল সে জীবন?এটা বুঝার জন্য কয়েক বছর পিছনে ফিরে যেতে হবে।

তখন গ্রীষ্মকালীন ছুটি ছিল। আমি গ্রাজুয়েশন করে অবসর বসে ছিলাম। আমাদের এলাকায় ছাত্রীদের জন্য একটি তাফসীরুল কুরআন প্রশিক্ষণ কোর্সের ঘোষণা হল। এই প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহনের দাওয়াত আমিও পেয়েছিলাম। যদিও আমরা একটি দ্বীনদার ভদ্র পরিবারের সদস্য ছিলাম তবুও দ্বীনহীন শিক্ষা গ্রহণের ফলে এর প্রভাব আমাদের উপর পূর্ণভাবে ছিল। এর ফলে আমি নামাজ, রোজার পাবন্দ ছিলাম ঠিক কিন্তু জীবনকে দ্বীনের উপর পরিচালনা করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলামনা। দ্বীন জীবনের সর্বক্ষেত্রের জন্য এবং সকল বিষয়ের উপর বিজয়ী হওয়ার জন্যই এসেছে এর কোন অনুভূতিই আমার ছিলনা। অথচ এই দৃষ্টিভঙ্গি-ই সর্বদিকে পথপদর্শনের উৎস। তাই দ্বীনি ইলম অর্জন করার চিন্তা, ব্যকুলতা ও

সেদিকে ধাবিত হওয়ার কোন আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে ছিলনা।

আমার আম্মাজানকে আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাত দান করুন, কেননা আমাদের মাঝে যা ভাল এবং কল্যাণকর রয়েছে তা আল্লাহ তা'য়ালার তাওফীক ও অনুগ্রহের পর আমাদের মায়ের দীক্ষাতেই হয়েছে। দ্বীনের প্রতি তার মুহাব্বত ও আগ্রহের কারণেই নিজ সন্তানদেরকে দ্বীনের উপর আমলকারী ও ভাল মুসলমান হিসাবে তিনি দেখতে চাইতেন। আমাদের নামাজ, রোজা, পর্দা (প্রচলিত প্রথানুযায়ী হলেও) ইত্যাদি পালনে তারই বেশি অবদান ছিল।

এক্ষেত্রেও আম্মাজানের অসন্তুষ্টির ভয়ে এ প্রশিক্ষণকোর্সে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সেখানে যেয়ে আমি আমার ধারণার বিপরীত পরিবেশ পেয়েছি। প্রশিক্ষণের পদ্ধতি আমার এতই পছন্দ হয়েছিল যে, পরবর্তীতে এটাতে আমি খুব আগ্রহের সাথেই অংশগ্রহণ করেছিলাম। এই প্রশিক্ষণ আমাকে এক নতুন জগতের অর্থাৎ কুরআনের জগতের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। এরপর আল্লাহ তা'য়ালার তাওফীকে এই পথে জিন্দিগী পরিচালনা শুরু করেছিলাম।

আমাদের সমাজের লোকদের সাধারণ প্রবনতা এমন ছিল যে, যখন তাদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত এবং কোন কোর্সের আহ্বান আসত, তখন তারা বলত – "ভাই! দ্বীন সম্পর্কে আমরা যা জানি প্রথমে তার উপর আমল করে নেই"। অনেক সময় এভাবেও বলত যে, "না জানলে আমল করতে হয়না" অথবা "যদি একবার ক্লাসে অংশগ্রহণ করা হয় এবং আল্লাহ তা'য়ালার কথা শুনে আমল না করা হয় তাহলে গুনাহ হবে"।

এসকল কথা সুস্পষ্টভাবে নফসকে সন্তুষ্ট করার জন্য বলা হত। অথচ আল্লাহ তা'য়ালা সকল মুসলমানের জন্য দ্বীনের বুনিয়াদী জ্ঞান ও প্রয়োজন পরিমাণ কুরআনের ইলম অর্জন করা ফরজ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালার নিকট অজ্ঞ থাকার কোন ওজর গ্রহণযোগ্য হবেনা বরং এটা উল্টো পাকড়াও এর কারণ হবে। সেসময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলবেন – "তোমাদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছেছিল। কিন্তু তোমরা ইলম শিক্ষা করা থেকে অজ্ঞ থাকাকে প্রাধান্য দিয়েছিলে"।

কোর্সের প্রশিক্ষক এবং দায়িত্ব পালনকারিণী শিক্ষিকা ও খালাম্মাদের মনযোগ, কল্যানকামিতা, চরিত্র এবং ভালবাসা আমাদের মাঝে এমন বন্ধন সৃষ্টি করেছিল যে, কোর্স শেষ হওয়ার পরও ক্লাসে অংশগ্রহনের ধারাবাহিকতা শেষ হয়নি। এদিকে জাগতিক শিক্ষাও চলছিল। তখনো পর্যন্ত আমি জাগতিক শিক্ষাকে ঐ শিক্ষাই মনে করতাম, যার ফজিলতের ব্যাপারে কুরআনের জায়গায় জায়গায় আয়াত অবতীর্ন হয়েছে। দাজ্জালী ফেতনা এবং তার প্রকাশকে তখনো পরিপূর্ণ চিনতে পারিনি। একারণে ইচ্ছা ছিল জাগতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করে তা পরিপূর্ণ কাজে লাগানো।

পরের বছর আরো বড় আকারে কোর্স সংঘটিত হয় এবং এতে আমাদের শিক্ষিকা ছিলেন আরও জ্ঞানী, উচ্চ শিক্ষিতা, ভদ্র ও নম্র। তিনি যুবতিদের মেজাজ অনুযায়ী মাসায়েল বুঝানোর মত যোগ্য একজন খালাম্মা ছিলেন। এই খালাম্মাকে আমি 'উস্তাদজি' বলে সম্বোধন করতাম।

পুরো শহর থেকে আসা ছাত্রীদের বড় একটি অংশ এই কোর্সে অংশগ্রহণ

করে উপকৃত হয়েছিল। ততদিনে আল্লাহ তা'য়ালার রহমতে কুরআন আমার সিনায় আসতে শুরু করেছে। লোক দেখানো পর্দার পরিবর্তে খাস পর্দা করা এবং জীবনের মাকসাদ বুঝা আল্লাহ আমার জন্য সহজ করে দিয়েছিলেন। কুরআনের নূর ক্ষনস্থায়ী ও ধ্বংসলীলা দুনিয়ার বাস্তবতা স্পষ্ট করে দিয়েছিল। সেসময় আখেরাত অর্জনের আগ্রহ অন্তরকে আলোকিত করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের উস্তাদজীকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যানসমূহ ও তাঁর স্থায়ী সন্তুষ্টির দ্বারা সৌভাগ্যবান করুন। যিনি তার মূল্যবান সময় এবং মেহনতকে আমাদের মত বিকৃত মস্তিষ্কের গিট খোলার কাজে ব্যয় করেছেন। তাদের সময়, মনযোগ, ইলম এবং কুরআন পড়ানো ও বুঝানোর প্রজ্ঞাপূর্ণ পদ্ধতি অনেকের অন্তরকেই আল্লাহ তা'য়ালার সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালার রহমতের পর তাদের মেহনতের ফলেই আমাদের দাজ্জালী শিক্ষায় ভরপুর অন্তরসমূহকে কুরআনের আলোয় আলোকিত করার সৌভাগ্য হয়েছিল।

কুরআন বুঝার প্রাথমিক অবস্থাতেই আল্লাহ তা'য়ালা এই বুঝ দান করেছিলেন যে, মুসলিম জাতিকে আল্লাহ তা'য়ালা বিশেষ এক উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, আর সে উদ্দেশ্য হল দ্বীন কায়েম করা। আর দ্বীন কায়েমের এই ফরজ দায়িত্ব আরামদায়ক গদিতে বসে পালন করা সম্ভব নয়।

ইসলাম ও কুফর-নিফাকের দন্দ্ব, তার পরিণতি, আল্লাহ তা'য়ালার প্রতিশ্রুতি ও ভীতিপ্রদর্শন, সফলতা ও বিজয়, জান্নাত- জাহান্নাম ও তাতে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তি, এগুলো হচ্ছে কুরআনের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। আল্লাহ তা'য়ালা উভয় পথকে পাশাপাশি দেখিয়েছেন। সত্যপথের অনুসারী এবং তাদের পথ, তাদের উপর

আসা পরীক্ষাসমূহ এবং দৃঢ়তার সাথে ঐ পথে যারা প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবেন তাদের উত্তম পরিণাম কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা আছে। অন্য দিকে বাতিল ও পথভ্রষ্টদের বাহ্যিক উন্নতি এবং তাদের নিকৃষ্ট পরিণতি সম্পর্কেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে অবহিত করেছেন।

যখন এসব কিছু পড়া হয়ে গেছে এবং সে অনুযায়ী আ'মল করার চেষ্টা করছিলাম তখন আল্লাহর রাহে জিহাদ ব্যতীত এমন কোন মুক্তির পথ আমি দেখিনি, যার উপর চলে একজন মুসলমান দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিজের ঈমানের হেফাজত এবং পরকালকে নিরাপদ ও নিশ্চিত করতে পারবে। ফলে আল্লাহ তা'য়ালার সামনে আমার দুর্বলতা, অযোগ্যতা, জ্ঞানের সল্পতা ও অনুল্লেখযোগ্য আমল নিয়ে দোয়া করেছি এই বলে -

"হে আমার রব! আপনার সামনে পেশ করার মত কিছুই তো আমার নেই। আছে শুধু এ প্রাণটা, এটাও আপনারই দেয়া। একে আপনি আপনার রহমত দ্বারা জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিন এবং নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককার বান্দাগনের পথে আমাকে পরিচালিত করুন।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালার নিকট তার দেয়া তাওফীক দ্বারা জিহাদ কামনা করেছি এবং এই রাস্তায় চলার মাধ্যম অর্থাৎ মুজাহিদও চেয়েছি। যেহেতু আমি মহিলা, তাই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহতে আমার অংশগ্রহণের একটা উত্তম উপায় হল – কোন মুজাহিদের (স্ত্রী) সাথী হিসাবে থাকা। যার সংশ্রবে থেকে আমি জান্নাতের দিকে ও আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে চলতে পারবো।

এই পথে চলার 'পাথেও কী' অথবা এই পথের 'কঠোর বাস্তবতা' কেমন

এসম্পর্কে কোন জ্ঞান আমার ছিল না। শুধু একটা জযবা ছিল যাতে আল্লাহ তা'য়ালা তার মুহাব্বতের রং ভরে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা সর্বদা এ জযবাকে জারি রাখুন এবং তার এ মুহাব্বতের রং স্থায়ী করুন। আমীন।

দু চার দিন নয় বরং এক বছরেরও অধিক সময় (আল্লাহ তা'য়ালা যতদিন চেয়েছেন) আমি আমার রবের নিকট নীরবে নিভৃত্বে এই দোয়া করেছিলাম -

"হে আমার রব! আপনার রাস্তায় চলার তাওফীক দান করুন। এ রাস্তায় চলার জন্য কোন নেককারের সংশ্রব দান করুন। এমন সাথী দান করুন যে ঈমান, ইলমে না'ফে(উপকারী ইলম), নেক আমল ও তাক্বওয়া-পরহেযগারীতে আমার চেয়ে অগ্রগামী হবে। যার ঈমান আমার ঈমান থেকে অনেক মজবুত ও শক্তিশালী হবে, যাতে করে তার সংশ্রব আমার দুর্বল ঈমানকে শক্তিশালি করা এবং হেদায়াত ও কল্যাণের পথে উন্নতির কারণ হয়ে যায়"।

সেই সাথে এটাও চেয়েছি –

"হে আল্লাহ! আপনি যদি জানেন আমি যা চাচ্ছি তাতে আমার কল্যাণ নেই, তাহলে আমি আপনার কাছেই দোয়া করি এতে আপনি কল্যাণ লিখে দিন, এবং তা আমার জন্য নির্ধারন করে দিন"। অন্তরে একথা দৃঢ় ছিল যে, আল্লাহ তা'য়ালার দরবার থেকে ততক্ষণ মাথা তুলবনা, যতক্ষণ না তিনি নিজ রহমতে আমাকে একজন মুজাহিদের সাথী হিসাবে কবুল করবেন।

অবশেষে আমার রব দুয়া কবুল করেছেন এবং আমার মত অযোগ্য ও দুর্বল বান্দীর জন্য তাঁর উত্তম বান্দাদের মধ্য থেকে একজন অত্যন্ত প্রিয় বান্দাকে

নির্বাচন করেছেন।

১৪২৭ হিজরীর রমাজানুল মোবারকে একটি পয়গাম আসে। আব্বাজান পিতৃত্বের দরদের কারণে ভূমিকাতেই বললেন যে, তিনি আমাদেরকে অত্যন্ত মুহাব্বতের সাথে লালন পালন করেছেন। আদুরে মেয়েকে নিজ হাতে যুদ্ধের পরিবেশে পাঠানোর জন্য তার অন্তর প্রস্তুত ছিলনা। অত:পর আল্লাহ তায়ালা সাহায্য করেছেন এবং তার মনকে এই সম্পর্কের জন্য উম্মুক্ত করে দিয়েছেন। আম্মাজান শুরু থেকেই পাশে ছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের উভয়ের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। আমীন।

রমজানেই এই সম্মন্ধ চূড়ান্ত হয়ে গেল। শাওয়াল মাসে বিবাহ হল এবং উঠিয়ে নিয়ে গেল। ওলীমার পরের দিনই কাঙ্ক্ষিত সেই সফর শুরু হয়ে গেল যা এখন পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দোয়া করি, যেন এ সফরের শেষ মাকবুল শাহাদাতের মাধ্যমে হয়। আল্লাহ তা'য়ালার সন্তষ্টি এবং জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু যেন না হয়, আমীন।

এখনতো আপনি জেনেই গেছেন যে, এটা কোন সফর এবং কেমন সফর?

জি হা। এটা নিজেকে আল্লাহ তা'য়ালার জিম্মায় দিয়ে দেয়ার সফর, রবের সন্তুষ্টি অর্জনের দিকে সফর, হিজরতের সফর (অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় নিজের ঘর, মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্বীয়-স্বজন, নিজের শহর, দেশ, মনের চাহিদা, অভ্যাস এবং নিজের সমস্ত পছন্দ-অপছন্দ ছেড়ে দেয়ার সফর), আল্লাহর পথে জিহাদের সফর, সীমান্ত পাহাড়ায় অংশগ্রহণের সফর এবং

ইনশাআল্লাহ জান্নাতের দিকে সফর। আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে যে নিয়ামতে ভূষিত করেছেন তার প্রতিদানে শোকর আদায় করে শেষ করতে পারবো না।

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর এই গুনাহগার, দুর্বল ঈমানওয়ালী এক বান্দির উপর এত বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাকে নিজের এক প্রিয় মুজাহিদ বান্দার সাথী হিসাবে কবুল করে নিয়েছেন। এরপর হিজরতের পথের জন্যও বাছাই করে নিয়েছেন। প্রশংসা শুধু আল্লাহ তা'য়ালার জন্য। আল্লাহ তা'য়ালার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত হক্কের উপর অবিচল রাখেন এবং হিজরতের এ সফর কাঙ্ক্ষিত মনযিলেই যেন শেষ করেন। অর্থাৎ মকবুল শাহাদাত এবং সেই সাথে রবের সন্তুষ্টি ও জান্নাতের জন্য যেন কবুল করেন।

বিবাহের কয়েক দিন পূর্বে রমাজানুল মোবারকের শেষ দশকে, একদিন ঈশার নামাজের কিছু পূর্বে আমি কুরআন তিলাওয়াত করছিলাম। ইতিমধ্যে সম্মানিতা হবু শাশুরির ফোন আসলো। তিনি পরিপূর্ণ দরদ ও ভালবাসা দিয়ে বললেন, "বেটি! রাস্তা বড় কঠিন। আবারো চিন্তা করে দেখ"। আমি উত্তর দিলাম - "আলহামদুলিল্লাহ, আমি দৃঢ় আছি"। তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন এবং দোয়া করলেন। ফোন শেষ করার পর আমি পুনরায় কুরআন হাতে নিলাম। যেখানে তিলাওয়াত বন্ধ করেছিলাম সেখান থেকেই দ্বিতীয়বার তিলাওয়াত শুরু করলাম। যে আয়াত পাঠ করছিলাম তার অর্থের উপর চিন্তা করলাম। সুবহানাল্লাহ! কুরআন পাক 'জীবন্ত' হওয়ার ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল। এটা ছিল সূরা হাজ্জ এর একেবারে শেষ আয়াত। যার অর্থ:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ
هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ
فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

”এবং আল্লাহর রাহে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা প্রয়োজন, তিনি তোমাদেরকে নিজের ইবাদতের জন্য নির্বাচন করেছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর কোন সংকীর্নতা রাখেননি। তোমাদের পিতা ইবরাহিমের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নাম (পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে) মুসলমান রেখেছেন এবং এই কুরআনেও, যাতে রাসুল তোমাদের উপর সাক্ষী হতে পারে, আর তোমরা অন্যান্যদের জন্য সাক্ষী হতে পার। সুতরাং নামাজ কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, তোমরা তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে, তিনিই তোমাদের মুনিব, তিনি কতইনা উত্তম মুনিব এবং কতইনা উত্তম সাহায্যকারী। (সূরা হাজ্জ – ৭৮)

সেদিনের পর থেকে বাকি জীবন এ আয়াত ও এ আয়াতে বিদ্যমান সুসংবাদ আমার সাথে রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।

আমাদের ওলিমার পরের দিন সকাল বেলাই তিনি তার ল্যাপটপে একটি গজল ছাড়লেন। আমি সফরের প্রস্তুতিতে মগ্ন ছিলাম তাই প্রথমে খেয়াল করিনি। তিনি এটা লক্ষ্য করে আমাকে বললেন – “এটা আমি তোমার জন্য চালিয়েছি”। গজলের কথা গুলো ছিল,

مجھے تم سے محبت ہے اگر ایماں کو تم چاہو + اگر بارود کی خشبواور قرآں کوتم چاہو

“তোমার সাথে আমার মুহাব্বত থাকবে যদি তুমি ঈমান চাও

যদি বারুদের সুগন্দি এবং কুরআনকে চাও।”

আমি প্রশ্ন করলাম – “আপনার মুহাব্বত শর্তযুক্ত”? তখন তিনি নরম কিন্তু অত্যন্ত গাম্ভির্যের সাথে উত্তর দিলেন –“হ্যাঁ”। অর্থাৎ বিবাহের উদ্দেশ্য উভয়ের দিক থেকে স্পষ্ট ছিল। আলহামদুলিল্লাহ।

জিহাদের রাস্তা সর্বদাই বিপদসংকুল। এই রাস্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল - এই পথে যাবতীয় তথ্য বা কাজগুলো গোপন রাখতে হয়। প্রথম দিন থেকেই এ লক্ষ্যে তিনি আমাকে দীক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন। সুতরাং ‘আমরা কোন দিকে যাচ্ছি?’ এটা সফর শুরুর মাত্র কয়েক মিনিট পূর্বে আমাকে বলেছেন। কার সাথে যাচ্ছি? কোথায় থাকব? সামনে কি হবে? ইত্যাদির ব্যাপারে আমি বেখবর ছিলাম। জিহাদের পথে নিজেদের পরিকল্পনা, সংকল্প ইত্যাদি যাদের সাথে কোন সম্পর্ক নেই তাদের থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গোপন রাখা হয়। আর নিজেদের ব্যক্তিগত তথ্য যথাসম্ভব কম জানানোই উত্তম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী থেকেও আমরা নিরাপত্তার বিষয়ে সাবধানতা ও গোপনীয়তা অবলম্বনের শিক্ষা পাই।

আমাদের প্রথম মানযিল ছিল পশতুর এক আনসারের ঘর। মাশাআল্লাহ ঘরের সমস্ত সদস্যই আমাদের খুব ভালোবাসতেন। তারা খেদমত এবং আন্তরিকতার ক্ষেত্রে তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা আমাদের জন্য করেছিলেন।

সেসময় আমি পশতু ভাষার একটি অক্ষরও জানতামনা। কিন্তু গৃহকর্ত্রী ও বাচ্চাদের আন্তরিকতা, ভালোবাসা এবং আপন করে নেয়াটা বুঝার জন্য ভাষা বুঝার প্রয়োজন ছিল না। এটা এমনিতেই বুঝতে পারতাম।

আমাদের নব বন্ধন সেখানেই দৃঢ় সম্পর্কের রুপ নিতে শুরু করেছিল। এ বন্ধনের ভিত্তি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে ছিল। একারণে নববধুর চাহিদা না আমার অন্তরে ছিল, আর না তার মেজাজে ছিল। সুতরাং ঈমান ও ইয়াক্বিনের এ সফরের প্রথম পনের দিন (যখন নব বধুর হাত পায়ের মেহেদীও তখনো উঠেনি) কেটেছে পাহাড়ে উঠা-নামা করে। পাহাড়ে চড়া শিখার পাশাপাশি কঠিন সব রাস্তা অতিক্রম করার প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছিল। ক্লাসিনকোভ ও পিস্তলের নিশানা ঠিক করার প্রশিক্ষণও এই সময়ে নিতে হয়েছিল। মনে হচ্ছিল এই প্রশিক্ষণই (বিবাহের) প্রকৃত মোহর, যা একজন মুজাহিদ স্বামী তার নব বধুকে দিয়েছিলেন।

ঐ পাহাড় থেকে নামার সময় আমার পায়ের আঙ্গুল সামান্য রক্তাক্ত হল। আমি তাকে বললাম – “এটা আল্লাহর রাস্তায় আমার প্রথম যখম, চাই তা যত ছোটই হউকনা কেন। যদি আল্লাহ তায়ালা এটা কবুল করে নেন, তাহলে বদলার দিক থেকে এটা অনেক দামি”।

এসময়ে আমার মৌলিক আক্বিদা ও চিন্তা-ফিকিরের বিশুদ্ধতার প্রশিক্ষণ চলছিল। তিনি আমার ব্রেন পরিষ্কার করার জন্য কিছু জিহাদী ভিডিও দেখান। তিনি সবসময় আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতেন। কখনো আমাকে এ ধারণা দেন নাই যে, ‘জিহাদ বিষয়ে তুমি কি জান’? বা ‘তুমি তো মহিলা মানুষ, নিজের কাজ কর’।

বরং সবসময় প্রত্যেক বিষয়কে খোলাখুলি বর্ণনা করে বুঝিয়ে দিতেন। উদাহরণ স্বরুপ - সেখানে থাকা অবস্থায় যখন এফ সি এর উপর মুজাহিদীনদের হামলার সংবাদ খবরের মাধ্যমে জানতে পারলাম তখন এ ব্যাপারে আমি বারবার উনাকে প্রশ্ন করছিলাম। নিজের বিভ্রান্ত জেহেনকে তার সামনে পেশ করলাম। তখন তিনি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে "আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা" আকিদার (আল্লাহর জন্যই বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা) বর্তমান যুগের প্রেক্ষিতে বর্ননা করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ এর দ্বারা আমার অন্তর ও জেহেনের গিঁট খুলে গেছে।

এছাড়া তার সংশ্রব আমার ঈমানী ও চিন্তার পরিশুদ্ধির উপকরণ হয়েছিল। সুমধুর কণ্ঠে প্রতিদিন তেলাওয়াতের অভ্যাস তাঁর ছিল। এমনটা খুব কমই হত যে, তিলাওয়াত করতে গিয়ে তার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়নি। অথচ তখনও আমার তিলাওয়াতের ঐ অবস্থাই ছিল যা সাধারন দ্বীনদারদের হয়ে থাকে। রমাজানুল মোবারকে এক খতম তিলাওয়াত করতাম আর বাকি সারা বছরে কয়েক পারা তিলাওয়াত করতাম, তাও পরিপূর্ণ ভাবে পড়া হতনা।

একবারের ঘটনা আমি যখন কয়েকদিন যাবত নিয়মিত তিলাওয়াত করতে পারিনি। তিনি আমাকে বললেন, "কুরআন ব্যতীত জীবিত থাকার কল্পনা কিভাবে করা যেতে পারে?!!"

সুন্নতের গুরুত্ব এবং মনোযোগের সাথে ওযু করা আমি তার থেকেই শিখেছি। তাছাড়া তার নামাজ....এটা তো ছিল আরেক বিরল ব্যাপার। এতে তার বিশেষ বিশেষ আয়াত তিলাওয়াত করা, লম্বা লম্বা সিজদা-রুকুগুলো উল্লেখ করার মতো। এগুলো ছাড়াও নামাজে তিনি কখনই এদিক সেদিক

দৃষ্টি দিতেননা(তার সম্পর্কে এটা আমার ধারণা, বাকি আল্লাহ তা'য়ালা ভাল জানেন)। নামাজরত অবস্থায় সাধারণত তিনি কামরায় কি হচ্ছে তা বলতে পারতেন না।

বেশী বেশী সালাম দেয়া এবং আগে আগে সালাম দেয়ার চেষ্টা করার আমল তাঁর থেকেই শিখেছি। শহরে জীবন-যাপনের কারণে ঘরের লোকদের মাঝে পরস্পর একে অপরকে এক রুম থেকে অন্য রুমে যেতে সালাম দেয়ার অভ্যাস আমার ছিল না। অথচ সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থা ছিল এমন - তারা রাস্তায় চলতে গিয়ে যদি দুই ব্যক্তির মাঝে একটি গাছও অতিক্রম করার পর পুনরায় দেখা হত তাহলেও একে অপরকে পুনরায় সালাম দিতেন। আলহামদুল্লিাহ মুজাহিদীনদের মাঝে অধিক সালাম দেয়ার গুরুত্ব রয়েছে।

এমনি ভাবে রাতে শোয়ার পূর্বে নিজের উপর(সূরা ইখলাস,ফালাক্ব, নাস পড়ে) সুন্নতি ফুক দিয়ে শোয়া এবং তা গুরুত্ব সহকারে পালন করা তাঁর কাছ থেকেই শিখেছি। দৈনন্দিন সুন্নত আমলগুলোর পাবন্দি করার চেষ্টা করা - উদহারনস্বরুপ কোন ছোট কাজও বিসমিল্লাহ পড়া ব্যতীত না করা, হেলান দিয়ে খানা না খাওয়া ইত্যাদিও তাঁর সোহবতে থেকেই শিখেছি।

চলুন আমরা সফরের কথায় ফিরে যাই। পশতুর সেই আনসারের বাড়িতে অবস্থানের সময়সীমা শেষ হয়ে আসলে আমরা পরবর্তী গন্তব্যে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আমরা এখানে মাত্র ১৫ দিন ছিলাম। কিন্তু এর মাঝেই এই আনসার পরিবার আমাদেরকে নিজেদের পরিবারের সদস্য বানিয়ে নিয়েছিলেন। তাদের অকপটতা, মুহাব্বত, আন্তরিক খেদমত ভুলার মত না।

তাই তাদের থেকে আমাদের বিদায়টা খুব বেদনাবিধুর/অশ্রুসজল হয়েছিল। এর মধ্যে আমাদের আনসার আমার জন্য টুপিওয়ালা একটা বোরখা নিয়ে এসেছিল। এ ধরণের বোরখা আমি আগে পড়িনি, তাই এটাতে অভ্যস্ত হতে পারছিলাম না। আমার এই অবস্থা দেখে আমার স্বামী লুকিয়ে মুচকি হাঁসছিলেন। এরপর সেখান থেকে বিদায় নিয়ে আবার আমরা হিজরতের ভূমির দিকে যাত্রা শুরু করি।

কয়েক ঘন্টার লাগাতার সফর আল্লাহ তা'য়ালা অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছিলেন। আমরা যখন হিজরতের ভূমিতে আনসারদের গ্রামে পৌঁছেছি তখন রাত হয়ে গিয়েছিল। চাঁদের তারিখ (আরবি মাসের) শেষ দিকে ছিল এবং পূর্বদিক (দক্ষিণ ওয়াযিরিস্তান) অন্ধকারে ডুবে ছিল।

সম্ভবত এক-দু দিন আগে বৃষ্টি হয়েছিল। একারণে জায়গায় জায়াগায় কাঁদা ছিল। তিনি তো এসব বিষয়ে অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু আমার জন্য এসব কিছু একেবারেই নতুন ছিল। একজন স্থানীয় আনসারের ঘরের দরজায় করাঘাত করে তিনি আমাকে বললেন – "তুমি অন্দর মহলে মহিলাদের নিকট চলে যাও। আর আমি বাইরে পুরুষের সাথে (বৈঠক খানায়) থাকব"।

অপরিচত জায়গা, ঘন অন্ধকার, তার উপর অতিরিক্ত টুপি ওয়ালা বোরখা পরিহিত ছিলাম। এই টুপিওয়ালা বোরখা পড়ার অভ্যাস এর আগে ছিলনা। এটার চিকন ছিদ্র দিয়ে আলোর মধ্যেই দেখা মুশকিল, আর অন্ধকারে তো একেবারেই দেখা যায়না। বেশ অস্বস্তি নিয়েই সদর দরজা দিয়ে যখন ভিতরের দিকে পা বাড়ালাম তখন চারদিকে জমাট পানি আর কাঁদা দেখতে পেলাম। কয়েক কদম যাওয়া মাত্রই পিচ্ছিল পথে হোঁচট খেয়ে পড়ে

যাচ্ছিলাম প্রায়। ইতিমধ্যে অভ্যর্থনার জন্য নির্ধারিত আনসারী মুহতারামা এগিয়ে এসে ধরে ফেললেন।

তার সাথে একটি রুমে প্রবেশ করি এবং সে রুম থেকে আরেক রুমে। রুমগুলোর ভিতরেও ঘোর অন্ধকার ছিল। নতুন এলাকা, নতুন পরিবেশ, না তাদের ভাষা আমি জানতাম, আর না তারা আমার ভাষা জানত। এমতাবস্থায় আমি চূড়ান্ত ভাবে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

ঘরে অবস্থানরত সকল মহিলা এবং বাচ্চারা একে একে এসে আমার সাথে সাক্ষাত করছিলেন। কিন্তু অন্ধকারে না আমি কারো চেহারা দেখতে পারছিলাম, আর না তাদের কথা কিছু বুঝতে পারছিলাম। ঐ ঘরের মুহতারামা আমাকে অত্যন্ত মুহাব্বতের সাথে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কিন্তু আমি যদি ঐ ভাষা বুঝতাম তবেইনা উত্তর দিতে পারতাম।

আমি মনে মনে ভাবছিলাম কখন সকাল হবে। আলো আসলে অন্তত আমি কিছু দেখতে পারতাম। আল্লাহ তা'য়ালা তার বান্দাদের উপর অত্যন্ত দয়ালু, তিনি তার এ বান্দির উপর এ পরীক্ষা দীর্ঘায়িত করেননি। আধা ঘন্টা পরই(যা আমার জন্য কয়েক ঘন্টা দীর্ঘ মনে হয়েছিল) ডাক এসে গেল যে, আবার কোথাও যেতে হবে। রুম থেকে আবার ঐভাবেই পিছলে পড়তে পড়তে বাইরে এসে তাকে(স্বামীকে) পেয়ে কিছুটা সান্তনা পেলাম।

এরপর আরেক আনসারের ঘরে পৌছলাম। এখানে পূর্ব থেকেই অত্যন্ত প্রিয় একজন মুহাজির অবস্থান করছিলেন। সম্মানিত স্বামী আমাকে বললেন,

‘এখানে তোমারই ভাষাভাষি একজন বড় বোন পাবে, যার থেকে তুমি অনেক কিছু শিখতে পারবে’। না জেনেই আমি তাঁর বর্ণনা শুনে ভেবেছি যে, বড় বোন হয়ত আমার থেকে বয়সে অনেক বড় হবে। আমি কল্পনা করছিলাম তিনি হালকা রংয়ের পোষাক পরিহিতা হবেন এবং সাদা রংয়ের দুপাট্টা উড়নী সাথে থাকবে।

বড় বোনকে দেখে আমি একটা ধাক্কা খেলাম! কারণ তিনি আমার থেকে মাত্র কয়েক বছরের বড় এবং তিনি সুন্দর ফিরুজা রংয়ের পোশাক পরিহিতা ছিলেন। তাকে প্রথম দেখাতেই আমার অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। তিনি আমাকে উপরে তার থাকার রুমে নিয়ে গেলেন। প্রাথমিক পরিচয়ের পর আমি তাকে বললাম আমি অনেক ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ কথা বলার পর বোন বললেন যদি আপনি বিশ্রাম নিতে চান, তাহলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে পারেন।

আমি বলতে পারবোনা কখন ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম। প্রায় আধা ঘন্টা পর আমার ঘুম ভাঙ্গলো। চোখ খুলে দেখি বোন আমার নিকটই বসে আছেন। কয়েকদিন পর কথায় কথায় বোন আমাকে বলছিলেন - তুমিতো প্রথম দিন আমাকে তোমার মনের ভয়ের কথা বলে ঘুমিয়ে পড়েছিলে। এদিকে আমি একা একা বসে ভয় পাচ্ছিলাম। (এই বোন আর তার স্বামী ২০১২ ঈসায়ী সনের রমজান মাসের শেষ রোজার ইফতারির কয়েক মিনিট পূর্বে পাকিস্তানি জেট বিমানের বোমাবর্ষনে শহীদ হয়েছেন। আল্লাহ তাদেরকে কবুল করে নিন। আমীন।)

ইতিমধ্যে রাতের এক তৃতিয়াংশ অতিক্রম হয়ে গিয়েছিল, তাই আনসারি

বোনেরা ডাকতে এসে গেলেন। তাদের অভ্যাস ছিল ইসলামী নিয়মানুযায়ী সেহরীর সময় উঠে যাওয়া এবং ইশার পর পর ঘুমিয়ে পরা।

শীতকালীন রাত্র যে দীর্ঘ হয় এর অনুভূতি আমার সেখানে গিয়ে হয়েছিল। কারণ শহরে থেকে বিদ্যুৎ এর কারণে প্রাকৃতিক নিয়মকানুন থেকে আমি গাফেল ছিলাম। যখন আমরা সেখানে পৌঁছলাম তখন আমাদের অভ্যর্থনার জন্য লোকজন নিজেদের গরম বিছানা ছেড়ে প্রশস্ত চিত্তে এগিয়ে এলেন। তারা সর্বোচ্চ ভালবাসা ও উষ্ণ অভ্যর্থনায় আমাদের গ্রহণ করে নিলেন। ততক্ষণাৎ মুরগী যবেহ করে ফেলা হল। তরকারী তৈরি হওয়ার সাথে সাথে খামিরা করে রুটিও তৈরি করা হয়ে গেল। ক্লান্তিময় দ্বীর্ঘ সফরের পর মেজবানদের উষ্ণ অভ্যর্থনা এবং গরম গরম মজাদার খাবার ও চা আমাদেরকে একেবারে সতেজ করে দিয়েছিল। তাছাড়া নিজ ভাষাভাষী স্বদেশি বোনের কারণে আমার ভরসাও দৃঢ় হয়েছিল।

পরবর্তী এক মাস আমরা ঐ ঘরেই ছিলাম। সে ঘরে অবস্থানের সময়টুকু আমি কখনোই ভুলতে পারবোনা। ঐ বোন এবং ভাই তাদের একটি রুম সমস্ত মালামালসহ আমাদেরকে দিয়ে দিলেন। অর্থাৎ নিজেদের ঘরটি আমাদের ব্যবহারের জন্য দিয়ে দিলেন। এখানে এক রুমকে একটি ঘর বলার কারণ হল হিজরতের ভূমিতে সাধারনত একটি রুমেই একই পরিবারের সকল সদস্য একসাথে থাকেন। আর এই ঘরেই তাদের প্রয়োজনীয় সকল সামানা এবং চুলা, হাড়ি, পাতিল ইত্যাদি একসাথে থাকে।

আমাদেরকে নিজেদের রুমটি ছেড়ে দিয়ে বোন ও তার স্বামী পাশের একটি ছোট রুমে চলে যান। কখনো কখনো ঐ বোনের নিজের প্রয়োজনীয় কিছু

জিনিস নেয়ার জন্য উপরের রুমে আসার প্রয়োজন পড়ত। আমাদের উপর তাদের ইহসান এমন ছিল যে - তারা স্বামী-স্ত্রী কখনোই কোন কারণে 'উফ' উচ্চারণও করেননি। উপরন্তু আমাদেরকে কখনো বুঝতে দেননি যে, তারা আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। তাদের ব্যবহারের মাধ্যমে তারা সবসময় এটাই বুঝাতেন যে, এ সব তোমাদের, এতে তোমাদেরই অধিকার। আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং জান্নাতে আমাদেরকে তাদের সাথী হিসাবে কবুল করুন। আমীন।

আমার স্বামী দিনের অধিকাংশ সময় ঘরের বাইরে জিহাদের কাজে কাটাতেন। এসময়টাতে আমার এই বোনের দিন একসাথে সময় কাটতে লাগল। বোনের সাথে যত সাময় কাটাচ্ছিলাম ততয় আমার স্বামীর কথা সঠিক প্রমাণিত হচ্ছিল। আসলেই এই বোন থেকে আমি অনেক কিছু শিখার সুযোগ পেয়েছিলাম। আল্লাহ তা'য়ালা বোনকে ইলম, বুঝশক্তি ও প্রশিক্ষণের কৌশল দ্বারা সৌভাগ্যবান করেছিলেন। আমি যেহেতু আমলী জিন্দেগীতে নতুন তাই বৈবাহিক জীবনের নানান বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম। একজন অভিভাবকের অভাব গভীরভাবে অনুভব করতাম। বোন আমার এই অভাবকে উত্তমভাবে পূর্ণ করেছিলেন। তিনি নানান বিষয়ে মুল্যবান পরামর্শ, উপকারী অভিমত ও কার্যকরী উপদেশ দ্বারা আমাকে সাহায্য করেছেন। এসকল কারণেই সময়ের সাথে সাথে বোনের সাথে বন্ধুত্ব ও মুহাব্বতের সম্পর্ক আরও গভীর হয়ে যায়।

এখানে থাকাকালীন সময়েই আমি বুঝতে পারলাম যে, একজন পুরুষের জন্য স্ত্রী'কে সময় দেয়াটাই জীবনের আসল উদ্দেশ্য ও অগ্রগণ্য বিষয় নয়।

বরং আসল উদ্দেশ্য হল যে ক্ষেত্রে আল্লাহর রহমত আছে, সে ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সহযোগী হবে।

এ কারণেই আমার স্বামীর অধিকাংশ সময় জিহাদী কাজে ব্যয় করার জন্য নির্ধারিত ছিল। তারপরও আমার মানসিক চিন্তা-ফিকিরের পরিশুদ্ধতার প্রতিও তাঁর পরিপূর্ণ খেয়াল ছিল। প্রথমত তিনি আমাকে শাইখ সাফারুল হাওয়ালীর কিতাব "সর্বশেষ কি হবে?" পড়তে দিয়ে বলেছিলেন – "তুমি প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পুরো কিতাবটি পড়বে, আমি তোমার পরীক্ষা নিব"। ঐ সময় পর্যন্ত আমার কিতাবাদির সাথে বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিলনা।

যাই হোক হাকিমের কল্যাণকর হুকুম অনুযায়ী কিতাব পড়া শুরু করে দেই। তবে কিতাবটি পড়ার সময় আমার চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী পড়েছি অর্থাৎ প্রথম পৃষ্ঠা দেখেছি, লেখকের নাম পড়েছি, পূর্বকথা, ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় যেগুলোকে জরুরী মনে করিনি, ছেড়ে দিয়েছি। শুধু কিতাবের মূল অংশটি পড়েছি। তারপর একদিন তিনি সুযোগ পেয়ে পরীক্ষা নেয়ার জন্য বসে পড়লেন। সময়টা ছিল শীতকালের দিনের বেলা। এসময় রোদের তাপ ছড়িয়ে পড়ছিল। তিনি রুমের বাইরে বারান্দায় একটি পিলারের সাথে হেলান দিয়ে বসে পড়লেন এবং আমাকেও বসার জন্য বললেন। আমি যেহেতু সবে মাত্র শহুরে জীবন ছেড়ে এসেছি, তাই কাপড় ময়লা হয়ে যাবে মনে করে থেমে গেলাম। কিন্তু তিনি আমাকে জোরপূর্বক মাটিতেই বসিয়ে দিলেন(অনেকদিন পর বুঝতে পেরেছিলাম যে, এটাও আমার প্রশিক্ষনের অংশ ছিল। এটা এইজন্য যেন আমার অন্তরে নমনীয়তা আসে এবং

কৃত্রিমতা ছেড়ে যেন আমি প্রকৃতির কাছাকাছি আসতে পারি)।

পরীক্ষা শুরু হল।প্রথম প্রশ্ন ছিল: "কিতাবের নাম এবং লেখকের নাম কি"? আমি এর উত্তর দিয়ে দিলাম। অত:পর প্রশ্ন করলেন – "লেখক কোথায় জন্ম গ্রহণ করেছেন? এবং তিনি কোন এলাকার?" আমি পেরেশান হয়ে বললাম – "কিতাবের মূল অংশের কোথাও এ কথা লিখা নেই"। এটা শুনে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন – "প্রথম পৃষ্ঠার মধ্যভাগে লেখকের পূরো পরিচয় আছে"। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়তে বলার উদ্দেশ্য কি। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে কিতাব পড়ার নিয়মাবলীর বিষয়টা আমার পরিপূর্ণ শিখা হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ।

একইসাথে বড় বোন আমাকে চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন। এই পরিবেশে আমাকে কিভাবে থাকতে হবে, আনসারদের সাথে ভালবাসার সম্পর্ক কীভাবে তৈরি করতে হবে, তাদেরর হক্ক জেনে তা আদায় করার পদ্ধতি, তাদের মনোরঞ্জনের ব্যাপারে গাফেল না হওয়া, তাদের ভাষা শিখা এবং এর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করার বিষয়টি তিনি আমাকে হাতে কলমে শিখিয়েছেন। এছাড়াও আনসারদেরকে মন খুলে মেহমানদারি করা, প্রয়োজনে কৌশলে তাদেরকে শরয়ী বিষয়ের প্রশিক্ষণও দিয়ে দেয়া এবং তাদের দুর্বলতাগুলোকে সংশোধন করার পদ্ধতিও আমি এই বোন থেকে শিখেছি।

আমি স্পষ্টভাবে সবসময় এটা স্বীকার করি যে, বিভিন্ন সমাজে নিজের ইজ্জত রক্ষা করা, সম্মান অর্জন করা, স্থানীয় আনসারদের সাথে মুহাব্বত কায়েম করা, তাদের থেকে মুহাব্বত অর্জন করা এবং সে সমাজের প্রথা অনুযায়ী

বসবাসের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে আমাকে আমার স্বামী আর এই বোন হাতে-কলমে শিখিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দোয়া করি, আমার এই দুই মুরুব্বিকে আল্লাহ তা'আলা উত্তম মর্যাদা দান করুন। আমীন।

বাস্তবতা হল আনসারদের এ হক্ব স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিখিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ " الأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ اسْتَقْبَلُوا وَادِيًا – أَوْ شِعْبًا – وَاسْتَقْبَلَتِ الأَنْصَارُ وَادِيًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَلَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ " .

সাহল বিন সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আনসারগণ যেন দেহের আভরণ এবং অন্যরা তার উপরিভাগের (শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন) আভরণ। আনসারগণ যদি কোন গিরি পথে প্রবেশ করে এবং অন্য লোকেরা অন্য গিরি পথে প্রবেশ করে, তবে আমি আনসারদের গিরি পথেই যাবো। হিজরতের ঘটনা না ঘটলে আমি আনসারদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। [সুনানে ইবন মাজাহ - ১৬২]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " رَحِمَ اللَّهُ الأَنْصَارَ وَأَبْنَاءَ الأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ " .

আম্‌র বিন আওফ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা আনসারদের প্রতি দয়াপরবশ হোন, তাদের সন্তানদের প্রতি দয়াপরবশ হোন, তাদের সন্তানদের প্রতি দয়াপরবশ হোন এবং তাদের সন্তানদের সন্তানগণের প্রতিও দয়াপরবশ হোন। [সুনানে ইবন মাজাহ - ১৬৩]

তিনি আরো বলেন ”যদি আনসাররা এক ঘাটিতে থাকে আর মুহাজিররা অন্য ঘাটিতে থাকে, তাহলে আমি আনসারদের সাথে তাদের ঘাটিতেই থাকব। তারপর এই দোয়া করলেন ” হে আল্লাহ আপনি আনসারদের উপর রহম করুন, এবং তাদের সন্তানদের উপর ও তাদের সন্তানদের সন্তানদের উপর রহম করুন। তিনি আরো বলেন তোমরা কি এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট নও? যে, লোকেরা ধন সম্পদ নিয়ে ঘরে যাবে, আর তোমরা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নিজেদের সাথে নিয়ে যাবে” আল্লাহ তা’আলা আমাদেরকে আনসারদের ভালবাসা এবং তাদের হক্ব বুঝে তা আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন

আনসারদের সাথে চলার সময় আমাদের কিছু মৌলিক বিষয় সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে। প্রথম কথা হল, আমাদের জীবন-পদ্ধতি ও প্রতিদিনকার চাহিদা আর তাদের সরল জীবনের মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে। এমনিভাবে মুহাজিরদের নিয়ে আনসারদের মাঝে কৌতুহল সৃষ্টি হওয়া, ঘরের সামানা পত্র নিয়ে আগ্রহ দেখানো এবং তা চাওয়ার বিষয়গুলো প্রায় স্বাভাবিক ঘটনা। এমনটা ঘটেই থাকে। তাই এ ব্যাপারে আমাদের অন্তর যেন সংকীর্ণ না থাকে বরং এসকল বিষয় মানিয়ে চলতে হবে। চেষ্টা করতে হবে আমাদের খাবার-দাবার এবং পোষাকাদী যেন এমন স্থানে না থাকে যেখানে সহজেই

সকলের দৃষ্টি পড়ে। এক্ষেত্রে একটা মূলনীতি হচ্ছে - আমাদের মালামাল আমরা নিজেদের হেফাজতে রাখবো।

যদি আমরা এটাই চাই যে, আমাদের সকল মালামাল আমাদের সামনেই রাখব আবার এটাও কামনা করব যে, সেদিকে কেউ তাকাতে পারবেনা, কেউ তা চাইতেও পারবেনা এবং কেউ এ নিয়ে আলোচনাও করতে পারবেনা, এমনটা ভাবা তো ঠিক না। একটি গরিব, সহজ-সরল পরিবার, যারা আরাম আয়েশের জীবন সম্পর্কে জানে না, তাদের বাচ্চাদেরকে কেন আমরা (আমাদের মাল সামানা প্রদর্শন করে) পরিক্ষায় ফেলবো? এটা তো এমন যে, একদল প্রচন্ড ক্ষুধার্ত মানুষের সামনে রকমারি খাবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাছাই করা হচ্ছে, আর এসকল খাবারের সুঘ্রান ও দর্শন তাদের ক্ষুদাকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। তারপর তাদেরকে বলা হল যে, তোমরা এগুলোর দিকে তাকাবে না, এর থেকে খেতেও পারবেনা, আর তা চাইতেও পারবেনা!!! যদি তারা ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়ে তা থেকে কিছু খেয়ে নেয়, তখন আমরা তাদেরকে মুর্খ, বে-ওকুফ, চোর, পকেটমার ইত্যাদি নাম দিয়ে দেই। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আসল কথা হচ্ছে, সংশোধন তাদের নয় বরং আমাদরে হওয়া দরকার। কারণ আমাদের প্রয়োজনকে স্বীমাবদ্ধ করার চেষ্টা আমাদের করা উচিত। নিজেদের জীবন যাপনের পদ্ধতি(লাইফ স্টাইল), পোশাক-পরিচ্ছদ যথাসম্ভব তাদের জীবন পদ্ধতি ও তাদের পোশাকের কাছাকাছি করার চেষ্টা করবো। নিজেদের মালামাল সকলের সামনে না রেখে যথাসম্ভব ঢেকে রাখার চেষ্টা করবো। নিজেদের টাকা পয়সা এবং দামি জিনিসপত্র নিজেদের হেফাজতে

রাখব, যাতে করে কারো উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাদেরকে লজ্জিত করতে না হয়, আর নিজেদেরও যেন আল্লাহ তা'য়ালার নিকট লজ্জিত হতে না হয়।

এ বিষয়ে একটি ঘটনা শুনাই - আমাদের অত্যন্ত প্রিয় একজন আনসার ছিল। তার দশ-এগারো বছরের একটি ছেলে ছিল, যার দ্বারা আমরা মাঝে মাঝে কিছু সদাই পাতি আনার ব্যবস্থা করতাম। একদিনের ঘটনা - সে ঘরের মুরুব্বি আমাদেরকে খবর পাঠালেন, আমরা যেন সেই বাচ্চাকে (আগে) টাকা দিয়ে বাইরে না পাঠাই। বরং সে যখন সামানা নিয়ে আসবে তখন তার দাম জিজ্ঞাসা করে যেন টাকা আদায় করি। কারণ সে তো বাচ্চা মানুষ - আর বাচ্চাদের অন্তরে যে কোন সময় পদস্কলন আসতে পারে। সুতরাং তাদের হাতে বেশি টাকা দিয়ে যেন তাদেরকে পরীক্ষায় না ফেলি!

অতএব আমি-আপনি বুকে হাত রেখে একটু চিন্তা করে দেখি যে. কাল যদি এই আনসাররা আমাদের বাড়িতে মুহাজির হয় আর আমরা আমাদের বাড়িতেই থাকি এবং এই মুহাজিরদেকে যদি নিজেদের ঘরে আশ্রয় দিতে হয় - যাদের ভাষা, রুসম-রেওয়াজ, চাহিদা, চাল-চলন সবকিছুই আমাদের থেকে ভিন্ন - তাহলে বলুন আমরা তাদের সাথে কতটুকু ধৈর্য, সহনশীলতা ও মুহাব্বতের আচরন করতে পারব?! যার আশা এখন আমরা তাদের থেকে করি!!

বাস্তবতা হল - আমরা তো বিল্ডিংয়ে থেকে অভ্যস্ত, তাই ঐ আনসারদের কাঁচা (মাটির) ঘরে থাকার সময়ে এই ঘরের যত্নের ব্যাপারটা আমরা আমলে নেই না। এর ফলে যথাযথ মেরামতের অভাবে (কাচা ঘরকে যথাযথ

হেফাজত এবং সময়মত মেরামত না করার কারণে) তাদের বাচ্চা ও মহিলাদের নানারকম পেরেশানীতে পরতে হয়। তা সত্বেও আনসারগণ নিজেদের জান, মাল, খেদমত ও আশ্রয়ের মাধ্যমে আমাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকেন। যেভাবে তারা আমাদের সাথে ধৈর্য ও সহনশীলতার আচরন করেন এটা শুধু তাদেরই বৈশিষ্ট। নিঃস্বন্দেহে তাদের প্রকৃত শুকুরগুজার গুণের কারণেই তারা এমনটা করতে পারেন। প্রকৃত সম্মানদাতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। আনসারদের মর্যাদা আল্লাহ তা'য়ালার নিকট কেমন তা পরকালেই আমরা জানতে পারব ইনশাআল্লাহ।

বড় বোন যেহেতু অনেক বছর যাবত তার মুজাহিদ স্বামীর সাথে রয়েছেন, তাই তার দ্বীনি চিন্তা-চেতনা অত্যন্ত মজবুত ছিল। একদিন আমাদের উভয়ের স্বামী যথারীতি জিহাদের কাজে বাইরে ছিলেন। বোন আমাকে বললেন, "চল আমরা আজ পুনরায় নিয়্যাতকে নবায়ন করে নেই। যেহেতু সহীহ নিয়্যাত ব্যতীত কোন আমল কবুল হয়না। এমন যেন না হয় যে, আমাদের স্বামীগণ আল্লাহ তা'য়লার সন্তুষ্টি এবং পরকালের সফলতা সবই অর্জন করে নিল আর আমরা কোন নিয়্যাত না থাকার কারণে অথবা গলদ নিয়্যাতের কারণে খালি হাতে রয়ে গেলাম"। তার এ কথা আমার অন্তরে খুব প্রভাব ফেলে। তখনই আমরা দুজন সেখানে বসেই নিজেদের নিয়্যাতকে নবায়ন করে নেই যে - আমরা আমাদের স্বামীদের কারণে হিজরত ও জিহাদের পথ অবলম্বন করিনি। বরং আমরা আমাদের রবের কাছ থেকে জান্নাতের বিনিময় পাওয়ার জন্য তা করেছি। আমরা আমাদের জান ও মালকে জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছি। আমাদের

হিজরত এবং জিহাদ একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই। আল্লাহ না করুন যদি কখনো আমাদের স্বামী না থাকে, অথবা এই পথে অবিচল না থাকে তখনো আমরা এই পথকে ছাড়বো না এবং জিহাদের উপর অবিচল থাকব ইনশা আল্লাহ।

বোন তো কয়েক বছর পূর্বেই নিজের নিয়্যাতের সনদের উপর সীলমোহর এটে নিয়েছেন(আমি এমনটাই ধারনা করি)। এখন আবার আমার সাথে নবায়ন করে নিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে নিয়্যতের ব্যাপারে দৃঢ়পদ রাখুন এবং তার পথে মাকবুল শাহাদাৎ থেকে বঞ্চিত না করুন। আমীন।

আমার হিজরতের জীবনের আনন্দময় একটা ঘটনা এখন বলবো। এক দিন তিনি ঘরে এসে আমাকে বললেন, "দেখবে তোমার জন্য কি নিয়ে এসেছি?" এটা বলে তার উভয় হাতকে আমার সামনে ধরলেন। তার হাতে কোন অলংকার, কাপড় অথবা সুগন্দি ইত্যদি কিছুই ছিলনা। বরং সেখানে ছিল একটি ছোট চকচকে পিস্তল। এটা তিনি আমার জন্যই এনেছিলেন। আমার পিস্তল!!! এটাই আমার প্রথম অস্ত্র ছিল। একজন মহিলা স্বর্ণ অলংকার দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে যে আনন্দ পায় আমি তার চেয়ে বেশী আনন্দ পেয়েছিলাম। আমার কাছে মনে হয়েছিল আমি এ পিস্তল পেয়ে যে আনন্দ পেয়েছি তা অন্য কোন মহিলা হাজারো উপহার পেলেও পাবে না। তাছাড়া আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে অস্ত্র পাওয়ার মর্যাদায় আলাদা। অস্ত্র সংগ্রহ আর ব্যবহারে কষ্ট যত বেশি হবে সাওয়াবের ওয়াদাও তত বেশি। এই চিন্তা আমার আনন্দকে আরো কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছিল।

বোন এবং অন্যান্যদের নিকট কয়েক মাস থাকার পর আমাদের একটি

ঘরের ব্যবস্থা হয়েছিল। আমরা সেখানে চলে যাই। ঐ সময় পর্যন্ত আমার স্থানীয় ভাষার জ্ঞান বলতে কাউকে স্বাগত জানানোর কয়েকটি শব্দের মঝে সীমাবদ্ধ ছিল। দুই রুম, বৈঠকখানা এবং বারান্দাসহ পুরোটাই আনসারদের চার দেয়ালের ভিতরেই ছিল। আনসারদের ঘরে "আ'দে" নামে একজন সম্মানিতা ব্যক্তি ছিলেন যাকে আমি "মা" বলে ডাকতাম। তার স্বামীকেও আমি বাবা বলতে শুরু করেছিলাম। তিনিও (তার ঘরের লোকদের সাথে ও তার স্বামীর সাথে কথা বলার সময়) সর্বদা আমাকে নিজের মেয়ে বলেই সম্বোধন করতেন। তাদের দুজন যুবক ছেলে ছিল। বাবা ও দুই ছেলে দিনের অধিকাংশ সময় বাইরে কাটাতেন।

সেসময়টাতে আমার স্বামীও নিজের কাজে দিনের বেলা তো বাইরে থাকতেনই, অধিকাংশ সময় রাতেও বাইরেই থাকতেন। একারণে প্রায়ই আমাকে একা একা থাকতে হতো। এই একাকী থাকার কারণে একটি বড় ফায়দা যেটা হয়েছে সেটা হল, আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক তৈরি করার জন্য ভালোভাবে চেষ্টা করা শুরু করলাম। তাছাড়া কিতাব পড়ার ব্যাপারে বরাবরই আমার একটা অনিহা ছিল। এখন এই অবসর সময়ে কিতাব পড়ার অভ্যাসটাও হয়ে গেল। আমি লাগাতার পড়ার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলাম। তারপর থেকে কোন না কোন কিতাব পড়ার মধ্যে লেগে থাকতাম। আলহামদুলিল্লাহ।

কিতাবের পর আমার একাকিত্বের সাথী ছিল "আদে" নামে পরিচিতা সম্মানিতা মা। তিনি অত্যন্ত যত্নের সাথে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা দশ-পনের মিনিট, কখনো আধা ঘন্টা সময় আমার সাথে বসে কথা-বার্তা বলতেন।

এসময়ে আমি তার কাছ থেকে পশতু ভাষা শিখতাম। এই পশতু ভাষা শিখার ঘটনাটিও বেশ মজার।

ঘটনা হল - শুরুতে আমি পশতু ভাষা একটুও পারতাম না। আর "আদে"রও পশতু ছাড়া অন্য কোন ভাষা সামান্যও জানা ছিলনা। যখন আদে আমার কাছে আসতেন এবং কথা বলতেন তখন আমি (আমার স্বামীর শিখানো পদ্বতিতে) তার চেহারার ভঙ্গি দেখে সে অনুযায়ী নিজের চেহারার মধ্যে ঐ ভাবটা ফুটিয়ে উঠানোর চেষ্টা করতাম। যাতে তিনি এটা মনে না করেন যে, আমি তার কোন কথা বুঝিনা এবং তার মন যেন ভেঙ্গে না যায়। এভাবে শুনতে শুনতে কিছু কিছু বুঝতে পারতাম কিন্তু তারপরও সম্পূর্ন কথা বুঝতামনা।

একদিন আদে আমার নিকট আসলেন এবং তার ছেলের সম্পর্কে কোন লম্বা ঘটনা শুনিয়ে গেলেন - যা আমি একটুও বুঝতে পরিনি। সে রাতে আমার স্বামী ঘরে আসেননি। পরের রাতে যখন আসলেন তখন তিনি আমাকে বললেন, আদের ছেলেকে কিছু লোক ভুল বুঝে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। দুদিন পর সুস্থ ও নিরাপত্তার সাথে ছেড়ে দিয়েছে। আমি অত্যন্ত পেরেশান হলাম যে, আদে আমাকে কেন বললেননা? যখন আদেকে আমি একথা জিজ্ঞাসা করলাম তখন তিনি আমার দিকে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে তাকালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাকে একথা কে বলেছে'? আমি আমার স্বামীর নাম বললাম। তখন তিনি বললেন, 'তাকে কে বলেছে? আমি বললাম, 'আপনার ছেলে'। অত:পর তিনি আমাকে বললেন, 'পরশু আমি তোমাকে এত লম্বা কাহিনী শুনিয়েছিলাম সেটা তাহলে কি ছিল?

আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না আমি যে কি পরিমাণ লজ্জিত হয়েছিলাম। এভাবেই আদের কাছ থেকে আমি আস্তে আস্তে এমনভাবে স্থানীয় ভাষা শিখে নিয়েছি যে, পরবর্তীতে অত্যন্ত সহজভাবে স্থানীয় মহিলাদের সাথে তাদের ভাষায় কথা বলতে পারতাম।

হিজরত এবং জিহাদের ময়দানে থাকা অবস্থায় স্থানীয় ভাষা শিখার প্রয়োজনীয়তা বুঝা, এর প্রতি আগ্রহ তৈরি করা এবং এর জন্য মেহনত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্থানীয় লোকদের অন্তরও ঐ সকল মুহাজিরদের জন্য অধিক প্রশস্ত হয় যারা তাদের ভাষা শিখার আগ্রহ রাখে এবং এর জন্য মেহনত করে। এটা মানতে হবে যে, আমরা নিজেদের ভাষায় কথা বললে(যদি শ্রোতা আমাদের ভাষা বুঝে) যতটুকু প্রভাবিত হবে, তার চেয়ে অধিক প্রভাবিত হবে যদি স্থানীয় ভাষায় বলতে পারি।

বাস্তবতা হল স্থানীয় ভাষা জানার চেষ্টা না করার অর্থ হল আমরা নিজেদেরকে বড় এবং আনসার ও তাদের সকল বিষয়কে ছোট মনে করি। বাস্তবে হয়তো এমনটা আমরা মনে করি না। কিন্তু স্থানীয় ভাষার শিখার ক্ষেত্রে অনাগ্রহ ও গাফলতি এমনটাই নির্দেশ করে। আনসারদের সাথে আমাদের সম্পর্ক শুধু প্রয়োজনের ভিত্তিতে তৈরি হবে বিষয়টা এমন না। বরং তাদের সাথে মিলে-মিশে থাকা এবং তাদের সাথে মুহাব্বতের সম্পর্ক স্থাপন করাও আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে আনসারদের হক্ক আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আমাদের উপর আনসারদের একটি বড় হক্ক হল, আমরা যেন তাদের জন্য আখেরাতের ফিকির করি। তাদের পরকালীন সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে

আগ্রহী হই। আমরা সর্বোচ্চ ভালবাসা, দরদ ও কল্যাণকামিতার মাধ্যমে যেন আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক জোড়ানোর চেষ্টা করি। তাদের মধ্যে আখেরাতের ফিকির সৃষ্টি করা আমাদেরই দায়িত্ব। এটা তো ইনসাফ হতে পারেনা যে, আমরা তাদের থেকে দুনিয়াবী সকল সেবা গ্রহন করব আর এর বিনিময়ে তাদের আখেরাতের কল্যাণের ব্যাপারে একেবারে উদাসীন থাকব। কিন্তু একথাও মনে রাখা আবশ্যক যে, দরদ ও কল্যানকামিতার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সাথে 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধে'র অনেক পার্থক্য রয়েছে।

আমাদের প্রথমটা করতে হবে, দ্বিতীয়টিতে হাত দেয়া যাবেনা। এটা এইজন্য যে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের বিষয়টা বেশ স্পর্শকাতর। এর স্পর্শকাতরতার দরুন হেকমত ও কৌশল না জানার কারণে আমাদের মত লোকেরা মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার নৈকট্যশীল করার পরিবর্তে দ্বীন থেকে দূরে সরানোর কারণও হয়ে যেতে পারি।

সুতরাং আমরা অন্তরিকভাবে আনসারদের পরকালীন সফলতার জন্য আগ্রহী হব এবং তাদের জন্য মেহনত করব। আর এ মেহনত ঐ সময় ফলদায়ক হবে যখন আমরা তাদের ভাষা সম্পর্কে জেনে তাদের সাথে তাদের ভাষায় কথা বলবো। আর এভাবেই তাদের সাথে আমাদের আন্তরিক ভালবাসা সৃষ্টি হবে।

ঐ পাঁচ মাসের মধ্যে (যেসময়ে আমি একাকি ঘরে থাকতাম তিনি কম সময়ই ঘরে থাকতেন) যতটুকু সময় তার থেকে আমি পেয়েছি তিনি আমার দ্বীনি বিষয়াদি সংশোধনের দিকে খেয়াল রাখতেন। একদিন তিনি জিজ্ঞাসা

করলেন, “সকাল সন্ধার যিকরসমূহ ঠিকমত পড়ছ তো?” হ্যাঁ সূচক উত্তর শুনে প্রশ্ন করলেন, “সবগুলো দুয়ার অর্থ কি জানা আছে”? এর উত্তরে না বলায় তিনি বললেন, “সবগুলো দুয়ার অর্থ শিখে নাও। আমি শুনব(এবং পরবর্তীতে শুনেছেনও)”। উদ্দেশ্য ছিল দোয়াগুলো যেন আমি খুব ধ্যানের সাথে পড়ি এবং তার গুরুত্ব যেন অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়।

ঐ সময় তিনি তার সাথীদের শরয়ী দাওরা করাচ্ছিলেন, সাথে সাথে আমিও এর কিছু অংশ পেতে থাকি। আকিদার বিষয়ে মাওলানা ইদ্রিস কান্ধালভী রহ: এর প্রিয় কিতাব ”আকায়েদুল ইসলাম” শব্দে শব্দে পড়িয়েছেন, বুঝিয়েছেন এবং মৌলিক আক্বীদাগুলো সাবলিল ভাষায় আমার সামনে উপস্থাপন করেছেন। এ সময় যখন তিনি লক্ষ্য করলেন আমার তিলাওয়াতে তাজবিদ ও মাখরাজের কিছু ভুল হচ্ছে। তখন আমার আবেদনের প্রেক্ষিতে ২৩ নং পারা পুরোটা তাজবিদের সাথে এমনভাবে পড়িয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ এর পরে আমার মৌলিক ভুলগুলো ঠিক হয়ে গেছে। নিশ্চই এটা আমার উপর উনার করা অনুগ্রহগুলোর মধ্য থেকে অন্যতম একটি অনুগ্রহ।

এরপরেও যেহেতু আমি দীর্ঘ একটা সময় দাজ্জালি জীবন ব্যবস্থায় অভ্যস্ত ছিলাম তাই আমার অন্তর ও দেমাগ তখনও পশ্চিমা শিক্ষার ধ্বংসাত্বক প্রভাব দ্বারা পরিপূর্ণ ভাবে প্রভাবিত ছিল। এ কারণে আমি তাকে মাঝে মাঝেই বিরক্ত করতাম যে, আমাকে কোন কাজ দিন। আমার দ্বারা কোন কাজ করান, আমি অবসর বসে থাকতে পারিনা ইত্যাদি। তিনি বলতেন - খানা রান্না করা, কাপড় ধোয়া, ঘরের প্রতি খেয়াল রাখা, আমার প্রতি খেয়াল রাখা, মেহমানদের সেবা করা এ সবগুলোই তোমার কাজ, এর চেয়ে বেশি

কি কাজ তুমি চাও? কিন্তু আমি যে অজ্ঞতার যুগে বড় চাকরী করাকেই নিজের জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে রেখেছিলাম, তাই আমার কাছে এসমস্ত ঘরের কাজ এবং দায়িত্বকে কিছুই মনে হতনা। আমি তখনো এমন কোন কাজ চাচ্ছিলাম যার মাধ্যমে আমার সফলতা ও অগ্রগামীতা বুঝা যাবে। তখন আমার মনে হবে আমিও দ্বীনের কাজে ও জিহাদী অঙ্গনে অনেক বড় অবদান রাখছি এবং আমার ডিগ্রি বৃথা যায়নি।

সর্বশেষ একদিন তিনি সান্তনা দেয়ার জন্য আমাকে বললেন, "কাজ চাও? তুমি কাজ করবে? কে তোমাকে নিষেধ করেছে! তুমি কি আল্লাহ তা'য়ালাকে সন্তুষ্ট করে নিয়েছ? পুরা কুরআন মুখস্থ করে নিয়েছ? বুঝে নিয়েছ এবং আমলে পরিনত করে নিয়েছ? সব মাছনুন দোয়া মুখস্ত হয়ে গেছে? যদি না করে থাক তাহলে কি এগুলো কাজ নয়? তুমি তোমার দ্বীনের ক্ষেত্রে অগ্রগামিতার সুযোগ ও অবসরকে কাজে না লাগিয়ে দুনিয়াবি কাজে সময় নষ্ট করতে চাইছো?

এই কথাগুলোর মাধ্যমে এক বৈঠকেই তিনি আমার চিন্তা-চেতনাকে পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, শোন বিবি! কাজ করার মতো কাজ সেটা নয় যা দেখে গোটা দুনিয়ার মানুষ মনে করে যে, তুমি একটা কিছু করছ। বরং করার মত কাজ তো সেটাই যার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে পরিপূর্ণ জীবন-বিধান দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। তাছাড়া এ অনুভূতি অন্তর থেকে স্বার্থপরতা এবং অহংকারকেও বের করে দেয়।

স্বাভাবিকভাবে মানুষ চিন্তা করে থাকে যে, আমি সে কাজই করব যা আমার

জ্ঞান বলবে। অথচ আমি কি? এবং আমার জ্ঞানের মাপকাঠি কি? আমার জ্ঞান যা বলবে তাই কি সঠিক? আমি যা আজকে ভাল মনে করছি আগামীকালও কি এটাকেই ভাল মনে করবো?

তিনি আরও বললেন, "বিষয়টা হল - আমার রব তো আমাকে স্বাধীন ছেড়ে দেননি। আমার মর্যাদা এবং সম্মান আমার নিজের মত করে পছন্দ করে নেওয়ার এখতিয়ার আমার রব আমাকে দেন নি। আমার মর্যাদা কোন পথে তা আমার রব ঠিক করে দিয়েছেন। তাই তার দিকে অগ্রগামী হবার চেষ্টা কর, সেদিকে অগ্রসর হও এবং এ পথে নিজের যোগ্যতা অর্জন কর। অগ্রগামী হবার যত ইচ্ছা ও আশা রয়েছে তা এই পথেই পূরণ করার চেষ্টা কর। আর এই পথে অগ্রগামী হবার কোন শেষ নেই। যদি ফরজ ইবাদতগুলো আদায় করে থাক তাহলে তাতে ইহসান এর স্তরে পৌঁছার চেষ্টা করতে থাক। এরপর নফল ইবাদতের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করতে থাক। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তা'য়ালার দেয়া জীবনব্যবস্থা অনন্য, কিন্তু আমাদের জিন্দেগীর গাড়ি কোন দিকে রওয়ানা দিয়েছে? কার উদ্দেশ্যে? কোথায় গিয়ে থামবে? এব্যাপারে চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে"।

আলহামদুলিল্লাহ তিনি আখিরাতের চোখে সফলতা-ব্যর্থতা, উপকারী-অপকারী এবং এধরনের পরিভাষার অর্থগুলো আমার কাছে পরিস্কার করে তুলে ধরলেন। আমি দুনিয়ার চোখে যেগুলোকে সফলতা ও ব্যর্থতা বলে মনে করতাম আখিরাতের চোখে সেগুলোর অসারতা আমার সামনে তুলে ধরলেন। এভাবেই তিনি আমার অন্তরের পরিশুদ্ধির চেষ্টার মাধ্যমে আমাকে পথ প্রদর্শনের চেষ্টা করেছেন নিরন্তর। আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

আমীন।

তাছাড়া তার দীক্ষা আমার নিকট এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, যদি মহিলাগণ তাদের সীমানায় থেকে নিজেদের দায়িত্বগুলোকে উত্তমভাবে পুরা করতে থাকে এবং নিয়্যাতকে সহিহ করে নেয় - তাহলে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে ইনশাআল্লাহ জিহাদ ও রিবাতেরর (পাহারার কাজ) সওয়াব পাওয়া যাবে। এমনিতেই তিনি যখন একদিন আমাক জিজ্ঞাসা করলেন যে, "তুমি এখানে (জিহাদের ময়দানে) কেমন আছ"? তখন আমি বললাম, " আমিতো শুধুমাত্র একজন হিজরতকারিনী"। তিনি মুচকি হেঁসে বললেন, "শুধু হিজরতকারিনী নয়, বরং তুমি আমি আমরা সকলে রিবাতে রয়েছি"। আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, "আপনিতো রিবাতের কাজে (জিহাদের পথে সীমানা পাহারা দেওয়ার আমল) লেগে আছেন। কিন্তু আমি তো মহিলা মানুষ, আমি তো ঘরেই অবস্থান করছি"। তখন তিনি আমাকে বুঝালেন - "মুরাবিত্ব এমন স্থানের পাহারাদারদেরকে বলে যেখানে তারা শত্রুদের আশংকা করে এবং শত্রুরাও তাদেরকে ভয় করে। আর যে জায়গায় আমরা রয়েছি তা ফ্রন্ট লাইনের (প্রথম স্তরের) অবস্থানে রয়েছে। এখানে দুশমন আমাদের থেকে সতর্ক থাকে এবং আমরাও তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকি। সুতরাং আমরা সকলে রিবাত্বে রয়েছি"। এটা জানতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম। আমার মধ্যে একটা সংশয় ছিল যে, জিহাদে আমার অংশ কি? যাই হোক একথাগুলো শুনে আমার বক্র চিন্তা-চেতনার কিছুটা সংশোধন হয়েছিল। তারপর তিনি আমার মত অযোগ্য মানুষ থেকে টুটা ফাটা কিছু কাজও নিয়েছেন। এতে করে কাজ করতে যেয়ে আরও নতুন কিছু বিষয়

সম্পর্কে জানতে পেরেছিলাম। অনেক নতুন বিষয়ও শিখেছি। আরো কিছু বিষয় সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে নিজের সহযোগিতা মূলক কাজ দ্বারাও আমার অর্জন বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

আমার এই নসিহত মূলত ময়দানের জিহাদে আগ্রহী নারীদের জন্য। কারণ তারা হিজরতের পূর্বে চিন্তা করে এবং বলে থাকে যে, আমরা মুজাহিদীনদের এই এই খেদমত করতে চাই। আল্লাহ তা'য়ালা যদি আমাদেরকে হিজরতের তাওফীক দেন, তাহলে আমরা মুজাহিদদের জন্য খানা রান্না করব, তাদের কাপড় ধুয়ে দিব এবং তাদের সেবা করব। কিন্তু যখন আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে হিজরতের তাওফীক দিয়ে দেন, তখন দেখা যায় ঐসকল মুজাহিদীনের খেদমত কখনো কখনো তাদের নিজেদেরই করতে হয়। অথচ মুজাহিদ এবং তার পরিবারের লোকদের খেদমত করা অনেক ফজিলতপূর্ণ বিষয়। আর এসকল খেদমতের মাধ্যমেও মহিলাগণ নিজেদেরকে জিহাদের কাজে অংশগ্রহণ করাতে পারেন।

একদিন তিনি আমাকে এবং পাকিস্তান থেকে আগত কিছু মেহমানকে নিয়ে দূরের এক পাহাড়ে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে মেহমানগণ অন্যদিকে চলে গেলেন। এরপর তিনি আমাকে ক্লাশিনকোভ এবং বিভিন্ন ধরণের পিস্তলের নিশানা ঠিক করানোর প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এটা আমার জীবনের একটি আনন্দময় দিন ছিল। পূর্বে আমি আপনাদের বলেছিলাম যে, হিজরতের একেবারে প্রথমদিকে ক্লাশিনকোভ এবং অন্যান্য পিস্তলের নিশানা ঠিক করার অনুশীলন আমি করেছিলাম। তবে তখন সরাসরি ফায়ার করার সুযোগ মিলেনি। আজকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ করে

দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

২০০৭ এর শুরুর দিকে অবস্থা খুবই নাযুক হয়ে যায়। প্রতিটি মূহুর্তে ভয় হত যে, এখনই হয়ত পলায়ন কিংবা আত্মগোপন করতে হবে। আনসাররাও ভয়ে ছিলেন, বরং মুহাজিরদের তুলনায় তাদেরই ভয় বেশি ছিল। কারণ তাদের বাড়ি-ঘর, পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, জমি-জামা সবকিছুই ঝুঁকিতে ছিল। মুজাহিদীনের সাথে কারো সম্পর্কের ব্যাপারে সেনাবাহিনীর কাছে রিপোর্ট যাওয়া মাত্রই তারা ঐ আনসারের সবকিছু ধ্বংস করে ফেলত। সর্বদা আমরা এই ভয়ে থাকতাম যে, এই নাযুক পরিস্থিতির কারণে কখন যেন আনসারগণ আমাদেরকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলেন।

একদিন সে এলাকায় সৈন্যদের টহল দেয়ার (ঘুরাঘুরির) খবর ছড়িয়ে পড়ল। আমরা আনসারদের এলাকার যে ঘরটাতে থাকতাম, সে ঘরের একেবারেই নিকটেই মুজাহিদীনদের একটি ক্যাম্প(কেন্দ্র) ছিল। এই ক্যাম্পটার উপর অতর্কিত হামলার আশংকা ছিল। এসময় হঠাৎ করে "আদে" আমার নিকট আসলেন। আমি ঐ সময় একজন মুহাজিরা বোনের সাথে ছিলাম। এদিকে আমার স্বামী মার্কাজে (মুজাহিদীনদের ক্যাম্পে) আক্রমনের আশংকার কথা শুনেই আমাকে একথা বলে মুজাহিদীনের সাথে চলে গেলেন যে, এসময়ে সাথীদের হেফাজত ও সংখ্যা বৃদ্ধির স্বার্থে আমার সেখানে থাকা আবশ্যক।

"আদে"র এ সময়ে আসাতে আমার মনে প্রথমে এ কথাই আসল যে, এখন অবশ্যই তিনি আমাকে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে বলবেন। কিন্তু না বরং তিনি বললেন যে, "বিপদ অনেক বেশি। তোমরা আমাদের সাথে আমাদের ঘরের অন্দর মহলে আমাদের থাকার রুমে চলে আস"। আমরা নারীরা হা

করে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। যখন বিপদ মাথার উপর এসে গেছে তখনও তারা নিজেদের পরিবর্তে আমাদের হেফাজতের চিন্তা করছেন। শুধু কি তাই? তারা আমাদেরকে ঘর থেকে বের করার পরিবর্তে নিজেদের ঘরের অন্দর মহলের রুমে আসার জন্য বলছেন। এ অবস্থাকে সেই অনুভব করতে পারবে, যে এমন ভীতিকর নাযুক পরিস্থিতি অতিক্রম করেছে। এমন নাযুক পরিস্থিতিতে যখন তার সন্তানাদী, ঘর-বাড়ি, ধন-সম্পদ সবকিছুই দুশমনের চোখের সামনে, তখন শুধুই আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টির জন্য কাউকে আশ্রয় দেয়া অনেক শক্তিশালী ঈমানের পরিচয়। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। আমীন।

ওইখানে অতিবাহিত করা পাঁচ মাসের শেষের দিকে আমাদের এখানে ভিন্ন দেশের এক নব দম্পতি আসেন। ঠিক সেভাবে আসলেন, যেভাবে আমরা বোন ও ভাইজানের নিকট এসেছিলাম। আমাদের দুই রুমের এক রুম তাদেরকে দিয়ে দিলাম।

আর এভাবে খুব সহজেই আমার একটি বান্দবী ও বোন মিলে গেল। এরপর আস্তে আস্তে লোকদের সমাগম বাড়তে শুরু করে। এসময় অনেকেই হিজরত করে আসতে শুরু করেন। এক মাস পর আরেক বোন তার স্বামী ও দুই সন্তান নিয়ে আমাদের এখানে আসলেন। আলহাদুলিল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের অন্তরকে সংকীর্ণ হতে দেননি। ততক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত হয়ে যায় যে, দুই রুমে তিন পরিবার মিলে-মিশে থাকবে। আর স্বামীগণ পর্যায়ক্রমে(পালা বন্টন করে) আসবেন। চার বা সাড়ে চার মাস এভাবে পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে। একদিনও কারো অন্তরে এ সংকীর্ণতা আসেনি যে, দ্বিতীয় বা তৃতীয়

পরিবারের কারণে আমার স্বামী বেশিক্ষণ অবস্থান করতে পারেননি।

ঘরে ঈমানের অত্যন্ত চমৎকার পরিবেশ ছিল। এখানে সকলেই তার ঈমানের প্রতি যত্নবান ছিলেন। একে অপরের সাথে মুহাব্বত, সামনে বেড়ে খেদমত করার আগ্রহ, একে অপরকে প্রাধান্য দেয়া এবং কুরবানীর ক্ষেত্রে একে অন্যের থেকে অগ্রগামী হওয়ার জন্য চেষ্টা করতেন। আল্লাহর জন্য একে অপরকে মুহাব্বত করা, একে অপরকে প্রাধান্য দেয়া এবং পরস্পর সাহায্য করার মাধ্যমে অতিবাহিত দিনগুলোতে আমাদের মাঝে যে মুহাব্বত সৃষ্টি হয়েছিল তা দিন দিন দৃঢ় হচ্ছিল। আলহামদুলিল্লাহ তা আজও আছে। আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দুয়া করি তিনি যেন আমাদের এই মুহাব্বতকে তার জন্য খালেস করে নেন এবং নিজ রহমতে শেষ বিচারের দিন তার আরশের ছায়া তলে একত্রিত করেন - যেদিন অন্য কোন ছায়ার ব্যবস্থা থাকবেনা। আমীন।

আমরা নারীরা চেষ্টা করতাম প্রতিদিন সকলে মিলে একসাথে বসে কিছু পড়তে। সাধারনত এ তালিমে কুরআনের তাফসীর, হাদীস এবং সাহাবাদের জীবনী থাকত। সাথে সাথে জিহাদের ফাজায়েল থেকেও উপকৃত হচ্ছিলাম। মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি ভাল কাজে লেগে থাকা যেন দৃষ্টি আপন মানজিল থেকে অন্যদিকে সরে না যায়।

আমরা এখানে যে সকল নারীরা হিজরত করে এসেছি প্রত্যেকেই শহরের বাড়িঘর, আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে এসেছি। তাই আমাদের প্রত্যেকের ফিকির এমন থাকতো যে - শহরের বাড়ি ছেড়ে এসে এখানকার ঘর গুলোর সাথে আমাদের অন্তর যেন জুড়ে না যায়। আর যে উদ্দেশ্যে শহর, বাড়ি-ঘর এবং আপন লোকদেরকে ছেড়ে এসেছি তা যেন ভুলে না যাই। অর্থাৎ

হিজরতের মূল উদ্দেশ্যই হল দ্বীন কায়েমের মাধ্যমে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। এটা কিছুতেই ভুলা যাবেনা। এটাই মুহাজিরা সকল নারীদের ফিকির ছিল।

এরই মধ্যে লাল মসজিদের লোমহর্ষক ঘটনাটি ঘটে। সেসময় আমরা সবসময় রেডিওতে কান লাগিয়ে রাখতাম। আর অন্তর ও জবান দুয়ায় ব্যস্ত থাকতো। যেদিন মাওলানা আব্দুর রশীদ গাজী রহ. এর আম্মার শাহাদাতের খবর পাই, সেদিন যেন আমাদের সকলের অন্তর ফেটে যাচ্ছিল। তারপর মাওলানা আব্দুর রশীদ গাজী ও অন্যান্য ছাত্রীদের শাহাদাতের খবর আমাদের উপর পাহাড় ভেঙ্গে পড়ার মত মনে হচ্ছিল। আমরা সকলে আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে বার বার এ দুয়া করছিলাম - হে আল্লাহ! আমরা এ জুলুম থেকে মুক্ত। (এই জুলুমে আমাদের কোন হাত নেই)।

ঐ দিনগুলিতে তিনি প্রায়ই বলতেন "যেদিন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই প্রশ্ন করবেন যে, যখন তোমাদের দেশে তোমাদেরই ভাই-বোনদেরকে শুধুমাত্র এই কারণে হত্যা করা হয়েছিল যে, তারা বলেছিল আমাদের রব আল্লাহ! ঐসময়ে তাদের সাহায্যের খুব প্রয়োজন ছিলো। তখন তোমরা তাদের জন্য ও আল্লাহর দ্বীনের জন্য কি করেছিলে? তখন আমরা কী উত্তর দিব?"

ঐ বছরই কিছু কারণে আমাদের পাকিস্তান যেতে হয়েছিলো। এতদিনে আমরা টুপি ওয়ালা বোরকা পড়ে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি এবং এটাই এখন আরামদায়ক মনে হয়। অধিকাংশ মুহাজিরা মহিলাদের অনুভূতি এমনি ছিল। আর বাস্তব কথা হলো এই ধরণের বোরকা দ্বারাই আসল পর্দা রক্ষা হয়। কারণ এতে বয়স, আকৃতি কিছুই বুঝার উপায় নেই। আর ভাইজানের

ভাষায় ‘এই বোরখা দেখতে এতই বে-মানান ও আকর্ষণহীন যে এর দিকে একবার তাকালে পরে আর তাকাতে মন চায় না।’ মূলত এটাই ছিল বোরকার আসল উদ্দেশ্য।

যাই হোক পাকিস্তানের অধিকাংশ এলাকায় যেহেতু টুপি ওয়ালা বোরকার প্রচলন নেই, তাই আমরা এক আনসারের ঘরে রাত্রি যাপন করি। পরের দিন যখন আমরা পরবর্তী মনযিলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম, তখন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেখানকার প্রচলিত বোরকা তথা কোর্ট ও স্কার্ফ পড়ে নিলাম। এই বোরকায় হাত-পা আবৃত ছিলো, কিন্তু চোখ সমান্য দেখা যাচ্ছিলো। বাইরে বের হতেই তিনি (স্বামী) তাড়াতাড়ি কাছে এসে বললেন, “তুমি এটা কী পরেছো”? আমি তো হয়রান হয়ে গেলাম! তিনি বলতে লাগলেন, এই আকর্ষণীয় বোরকায় দেহ ঢাকলেও তা মানুষের দৃষ্টি আরো বেশি আকর্ষণকারী - যা দ্বারা বোরকার মূল উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে যায়। এরপর থেকে আমি আর কখনও এই ধরণের বোরকাকে নিজের জন্য আরামদায়ক মনে করে পড়িনি।

২০০৮ সালের মার্চ মাসে আমাদের মাজমুআর(মুজাহিদ গ্রুপ)অনেক সাথী প্রশিক্ষণ নেয়ার সময় ড্রোন হামলার শিকার হয়। তখন তার কাজ অনেক বেড়ে গেলো। কখনো সাথীদের শরয়ী তরবিয়াতে সময় কাটাতেন। কখনো রনাঙ্গনের সাথীদের উৎসাহমূলক কথা বলতেন। কখনো দীর্ঘ বৈঠকে ব্যস্ত থাকতেন, আবার কখনো ইনতেযামী বিষয়েরও তদারকী করতেন। এতকিছু সত্বেও ঘরে এসে কখনোই নিজের পেরেশানীর বোঝা আমার উপর চাপাতেন না। শত ক্লান্তি আমার সাথে নরম ব্যবহার করতেন। সর্বদা

হাসিমুখে কথা বলতেন, আমাকেও বলতেন 'হাসিমুখে থাকবে, এতে পয়সা খরচ হয় না।'

তার ইলম অর্জনের আগ্রহ ছিলো খুব বেশি। ঘরে থাকাকালীন অধিকাংশ সময় বই পড়ে কাটাতেন। কিন্তু তা সত্বেও শুকনো খিটখিটে মেজাজে থাকতেন না। তিনি খুবই রসিক ছিলেন। বই পড়ার ফাঁকে ফাঁকে আমাকে সম্বোধন করে কোন কৌতুক বা মজাদার কথা বলতেন, যাতে আমার মন ভালো থাকে।

ঐসময়ে তার ছোট ভাই আব্দুর রহমান (যার বয়স ছিলো মাত্র সতের বছর এবং সে হাফেযও ছিলো) আহত মুজাহিদদের খেদমতের উদ্দেশে চলে আসল। সে এমন চমৎকার আখলাকের অধিকারী ছিলো যে, অল্পদিনেই সব মুজাহিদদের প্রিয়ভাজন হয়ে গেলো। কিছুদিন পর সে আঙ্গুরা আড্ডা নামক রণাঙ্গনে চলে গেলো।

সময়টা ছিল আগস্ট মাস। তিনি ঘরে ছিলেন না। হঠাৎ করেই আমার মনে অস্থিরতা বিরাজ করছিলো। আমি আমার স্বামী ও সকল মুজাহিদের জন্য দুআ করলাম। মন কিছুটা প্রশান্ত হলে পরে ঘুমিয়ে পড়লাম। ফজরের পরপরই তিনি ঘরে আসলেন এবং দ্রুত বলতে লাগলেন - 'রণাঙ্গনে রাতে ড্রোন হামলা হয়েছে। অনেক সাথী শহীদ হয়েছেন। আমি সেখানে যাচ্ছি। এদিকে আব্দুর রহমানের খবরটাও পেলাম না, সে তো ওখানেই ছিলো।" একথা বলে বের হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই আবার ফিরে এলেন এবং বারান্দায়ই সেজদায় পড়ে গেলেন। সেজদা থেকে যখন মাথা উঠালেন তখন তার চোখে পানি ছিলো, মুখে হাসিও ছিল। বললেন – "আব্দুর

রহমানের খবর পেয়েছি, সেও শহীদ হয়ে গেছে"। একথা বলে রওয়ানা হয়ে গেলেন, এই যাওয়ায় সম্ভবত পরের দিন ফিরে এসেছিলেন।

ঐ ড্রোন হামলায় বারো জন মুজাহিদ শহীদ হয়েছিলেন। তিনি রণাঙ্গনে পৌঁছতে পৌঁছতে দশজনের জানাযা পড়া হয়ে গিয়েছিলো। তার ছোট ভাই ও অপর এক মুজাহিদের জানাযা বাকি ছিলো। ঐ মুজাহিদের লাশ প্রায় অক্ষত ছিলো, কিন্তু আব্দুর রহমানের লাশের নামে একটি পুটলি বাঁধা ছিলো। তিনি তার ভাইয়ের বিক্ষিপ্ত লাশের টুকরা দেখার জন্য পুটলি খুলতে চাইলেন। কিন্তু পুটলিতে হাত দেওয়া মাত্রই তা থেকে রক্ত বের হতে লাগল। তখন সাথীরাও তাকে খুলতে নিষেধ করলেন। আল্লাহ তা'আলা আপন দয়ায় তার মন প্রশান্ত রাখলেন। তিনি ক্যাম্পে অবস্থানরত সাথীদেরকে ঐ দিন জিহাদ ও শাহাদাতের ফযিলতের উপর দরসও দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা সত্য। আল্লাহ তা'আলা শহীদের পরিবারের উপর সাকীনা নাযিলের যে ওয়াদা করেছেন তা আমি এই শাহাদাতের সময় তার ও তার পিতামাতার ক্ষেত্রে স্ব-চক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ।

সম্ভবত জুলাই মাসের শেষের দিকের এক রাতে আমি ড্রোন হামলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। সকাল হওয়া মাত্রই তিনি আমাকে এ কথা বলে বের হয়ে গেলেন যে, আমি খোঁজ খবর নিয়ে আসি। কয়েক ঘন্টা পর ফিরে এসে বললেন "তুমি তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হও। শাইখ আবু খাব্বাব মিসরীর ঘরে ড্রোন হামলা হয়েছে(তিনি ছিলেন বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ। তার গোটা জীবন তিনি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেছেন। বয়সও ষাটের বেশি ছিলো)। তিনি ও তাঁর নয় বছরের ছেলেসহ তার জামাতা এবং অল্প বয়সি নাতনি এই

হামলায় শহীদ হন। এছাড়া আরবের এক ভাইও এই হামলায় শহীদ হয়েছেন - যিনি একজন আলেম ও মুজাহিদীনদের সন্তানদের শিক্ষক ছিলেন। এই হামলায় তার স্ত্রীও গুরুতর আহত হন।

আমি হাসপাতালে গিয়ে দেখি শাইখের স্ত্রীর অপারেশন হয়ে গেছে। তখন তিনি বেহুশ অবস্থায় ছিলেন। সেখানকার মহিলা ডাক্তার আমাকে বললেন অপারেশনের আগে বেহুশ অবস্থায়ও তিনি মুখে حسبنا الله و نعم الوكيل পড়ছিলেন। তিনি অনেক ধৈর্যশিলা, দৃঢ় সংকল্পের অধিকারিণী মহিলা ছিলেন। আমি হাসপাতালে তাঁর কাছে তিন দিন ছিলাম। তিনি বারবার তাঁর স্বামী, সন্তান ও ঘরের অন্যান্যদের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন, কিন্তু আমরা তাকে কিছুই বলিনি। তাঁর বাম হাতের কয়েক জায়গায় ফ্রেকচার হয়ে গিয়েছিলো। কনুইয়ের নিচে বড় একটা অংশের মাংস উড়ে গিয়ে হাড্ডি দেখা যাচ্ছিলো। শরীরের অনেক জায়গায় মিসাইলের টুকরা প্রবেশ করেছিলো। একারণে বুক থেকে পেট পর্যন্ত কয়েক জায়গায় অপারেশন করতে হয়েছে।

পরের দিন যখন নার্স ড্রেসিং করতে আসলো, তখন আমি আপার (শাইখের স্ত্রী) ডান হাত ধরে রাখলাম। আরেকজন নার্স তার মাথা ধরে রাখলো আর বাতাস করতে থাকলো। ড্রেসিংকারী নার্স যখন তার যখমে জীবাণুনাশক ঔষধ দিলো তখন ক্ষতস্থান থেকে ফেনা বের হচ্ছিল আর আপারও অনেক কষ্ট হচ্ছিল। তার কষ্টের পরিমাণ আমি বুঝতে পেরেছি এইজন্য যে, তিনি আমার হাত এত শক্ত করে ধরেছিলেন যে, আমার ভীষণ কষ্ট হতে লাগলো। ওষুধের প্রভাবে তার পুরো শরীর ঘেমে গিয়েছিল। এতদসত্বেও তার মুখ

দিয়ে উফ শব্দ পর্যন্ত বের হলো না। এসময়েও তার মুখে "লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ", ও "হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল" এর যিকির জারী ছিলো।

পরের দিন আপা আমাদের ড্রোন হামলার রাতের ঘটনা শুনালেন। আপার ভাষ্যমতে - "রাতে যখন ড্রোন হামলা হলো তখন আমরা বাড়ির উঠানে ঘুমন্ত ছিলাম। পুরুষরা উঠানের একদিকে ছিলো, আর মহিলারা ছিলো অন্য দিকে। আমার যখন চোখ খুলল তখন দেখি আমার দিকে একটি আগুনের শিখা আসছে। আমি তাড়াতাড়ি আমার নাতনীকে দূরে সরিয়ে দিলাম যাতে সে আহত না হয়। এরপর আমি আহত অবস্থায় ঘরে ছুটে গেলাম। আমার তখন একটাই চিন্তা; এখনই লোকজন এসে পড়বে। লোকজনের আনাগোনায় বায়তুল মালের আমানত উধাও হয়ে যেতে পারে। তাই খুব শিঘ্রই আমাকে আমানতের হেফাযত করতে হবে"।

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

পরিস্থিতি দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছিল। একদিকে সেনাবাহিনীর হামলার আশঙ্কা ছিলো, অন্যদিকে আমার স্বামীর কাজের চাপও অনেক বেড়ে গিয়েছিলো। একদিন তিনি আমাকে বললেন, "মুজাহিদরা সেনা ক্যাম্পে বড় ধরনের হামলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি সহ অনেক মুজাহিদ তাতে শরীক হবো। শাহাদাতের সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ তাদের ক্যাম্পে প্রবেশ করতে হবে। দোয়া করো, আমি যেন শহীদ হই"।

আমাদের বিবাহের পর প্রথমবার একটি অপারেশনে যাওয়ার সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'আমার জন্য শাহাদাতের দুআ কোরো"। তখন তাঁর

যাওয়ার পর আমি কেঁদে কেঁদে তাঁর শাহাদাতের জন্য দুআ করলাম। এর একটু পরেই শয়তান আমাকে ধোঁকা দিয়ে দিল। আমার মনে একথা উদয় হলো যে, "হে আল্লাহ! এখনই না"। এরপর আগের চেয়ে আরো বেশি কেঁদে কঁদে দোয়া করেছিলাম "হে আল্লাহ! এখনই শহিদ হিসেবে কবুল করে নিয়েন না"। পরে তওবা করেছিলাম এমন কাজ আর করব না। এরপর আল্লাহ আমার অন্তর মযবুত করে দিলেন।

যাই হোক, এবার তিনি দ্বি-প্রহরের কিছু পূর্বে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। যাওয়ার আগে আমাকে বললেন, "আজ রাত একটা বা দেড়টার দিকে অভিযান শুরু হয়ে যাবে। মুজাহিদীনদের সফলতা ও আমার শাহাদাতের জন্য দোয়া করবে"। তখন পর্যন্ত আমার অন্তর প্রশান্ত ছিল। আমি এশার পর সবার জন্য দোয়া করে ঘুমিয়ে পড়লাম। দ্বিতীয়বার যখন ঘুম ভাঙলো তখন রাত প্রায় একটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি ছিলো। কিছুক্ষণ পরেই ফায়ারিং এর আওয়াজ শুরু হলো, আমি বুঝতে পারলাম নির্ধারিত সময়ে কাজ শুরু হয়ে গেছে। আমি আবার সবার জন্য দোয়া করে ঘুমিয়ে গেলাম।

সকালে আমি ফজরের নামাজ পড়ে উঠানে বের হলাম। তখন "আদে" নামক আনসারী মায়ের উঠান থেকে তাঁর ছেলের সাথে মায়ের কথার আওয়াজ শুনতে পেলাম। ছেলে বলছিল, 'মা! সে তো সিংহের মত লড়াই করেছে'। এ ধরণের আরো কিছু কথাবার্তা শুনে আমার মনে হলো আমার স্বামীর কথা বলছে। আমি কান খাড়া রেখে যিকির আযকারে লিপ্ত হয়ে গেলাম। পরে জানতে পেরেছি আনসারী মায়ের এই ছেলেও রাতের হামলায় শরিক ছিলো। একজন স্থানীয় বংশোদ্ভুত লোকের কাছে(যারা ছিল

বাহাদুরিতে প্রশিদ্ধ) তাঁর প্রশংসা শুনে বুঝলাম যে, আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বীরত্বপূর্ণ গুণের একটি অংশ আমার স্বামীকেও দিয়েছেন। কিছুক্ষণ পর আনসারী মা আমার কাছে এসে আমার এবং তাঁর মাতা-পিতা, ভাই-বোন সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। আমি পেরেশান হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম "আদে"! তাঁর কী খবর? সে কি ভালো আছে"? তিনি বললেন, "হ্যাঁ! খবর ভালো, সে চলে আসবে"। একটু পরে আবার এসে বললেন, "তোমার স্বামীর কোন কাপড় থাকলে দাও"। এবার আমার সন্দেহ ইয়াক্বীনের রুপ ধারণ করতে লাগলো। আমি বললাম, "আদে! কাপড় কেন প্রয়োজন? কাপড় তো তিনি সর্বদা সাথেই নিয়ে যান"। কিন্তু মা কোনও উত্তর দিলেন না। বললেন, "কাপড় দিয়ে দাও"। আমি তখন ঘরের অবশিষ্ট একসেট কাপড় দিয়ে দিলাম।

মাগরিবের আজান হলো। আমি অজু করে জায়নামাজে দাড়ালাম। এমন সময় দরজায় আওয়াজ হলো। তাঁর কড়া নাড়ার আওয়াজ চিনতে পেরে বললাম, "দরজা খোলা আছে, ভিতরে চলে আসুন"। কিন্তু তিনি প্রবেশ না করে আবার আওয়াজ দিলেন। আমি গিয়ে তাড়াতাড়ি দরজা খুললাম। যখন তিনি ঘরে প্রবেশ করতে যাবেন তখন আমি হাসিমুখে বললাম, "কি? আহত হয়েছেন"? তিনি হাঁসি দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, ঘরে তো আসতে দাও"। আমি কবুলিয়তের দোয়া করলাম এবং বিস্তারিত জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, "আগে নামায পড়ে নিই"।

একটু পরেই আনসারী মা-বাবা ও তাদের ছেলে ঘরে আসার অনুমতি চাইলো। আমি ভিতরের কামরায় চলে গেলাম। মা ভিতরে প্রবেশ করে

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি বুঝতে পেরেছিলে”? আমি বললাম, “ধারণাতো করেছিলাম, কিন্তু আপনি বলেননি কেন”? তিনি বললেন, “আমি তো সকাল থেকেই জানি, কিন্তু তোমাকে বলার সাহস হচ্ছিলনা বিধায় বলিনি”।

মেহমানরা যাওয়ার পরই তিনি আমাকে বললেন, “তোমার হাতে মাত্র আধাঘন্টা সময় আছে। এর মধ্যেই সব কিছু গুছিয়ে নাও। আমার আহত হওয়ার খবর ওয়ারলেসের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে গেছে। এখনই এখান থেকে সরে যেতে হবে। আল্লাহ অন্তরে সাহস দিলেন। আধাঘন্টা সময়েই নামায, খাওয়াদাওয়া ও সামানাপত্র(যা খুব কম ও হালকা ছিল, যাতে সহজেই স্থানান্তরিত করা যায়।) গুছিয়ে নিলাম। এসময় তিনি এক জিম্মাদার ভাইয়ের সাথে সামনের কাজের পরিকল্পনা করছিলেন। এই আধা ঘণ্টা সময়ে শয়তান আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। মনে শুধু এই চিন্তা আসছিলো যে, যদি পরিস্থিতি আমাদের দু’জনকে আলাদা করে দেয়, তাহলে আমার কী হবে? কিন্তু মহান আল্লাহ আমাকে শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে হেফাযত করেছেন এবাং আমার অন্তরকেও মযবুত করে দিয়েছিলেন।

পরে তিনি আমাকে বলেছেন - হামলার সময় তিনি ঐ গ্রুপে ছিলেন, যারা ক্যাম্পে প্রবেশ করে একটি চেকপোষ্ট দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কাছেই একটি গ্রেনেড বিস্ফোরিত হওয়ায় তিনি আহত হন এবং রক্ত বের হওয়া শুরু হয়। তিনি দ্রুতই সেখান থেকে বের হয়ে আসলেন(কারণ রক্তক্ষরণ বেশি হলে পরে আর বের হতে পারতেন না)। মুজাহিদগণ প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে গাড়ি রেখে পায়ে হেটে ক্যাম্পে এসেছিলেন, তাই সে

পর্যন্ত হেটে যেতে হবে। অপরদিকে তাঁর রক্তক্ষরণও বেশি হতে লাগলো, তাই তিনি জামা খুলে শক্ত করে বেঁধে নিলেন। এভাবে খুব কষ্ট করে সেনাবাহিনীর চেকপোষ্টগুলো থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছলেন। কিছুদিন পর তিনি আমাকে ঐ কাপড় এনে দেখিয়েছিলেন যা পুরোটাই রক্তে রঞ্জিত ছিলো। কেবল দু এক জায়গায় কাপড়ের আসল রং দেখা যাচ্ছিল।

হাসপাতালে গিয়ে সকল আহত সাথীর ব্যান্ডেজ করানোর পর নিজের ব্যান্ডেজ করালেন। (হে আল্লাহ! তুমি তাঁর খেদমত কবুল কর)। অল্প কিছুদিন বিশ্রাম নিলেন (অথচ ডাক্তার পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছিলো)। এ সময়েও লাগাতার বৈঠক চালু রেখেছিলেন। তারপর আহত পা নিয়েই লাঠিতে ভর করে ময়দানে চলে গেলেন। কারণ পরিস্থিতি অবসর ও বিশ্রামের সুযোগ দিচ্ছিলো না।

সেনা অভিযানের আশঙ্কায় এই এলাকা থেকে প্রায় সকল মুহাজির পরিবারকেই সরিয়ে নেয়া হয়েছিলো। শুধু আমি এবং আরেক শহীদ পরিবার বাকি ছিলাম। আসরের সময় আমাদের অস্থায়ী বাড়ির খুব কাছেই ড্রোন মিসাইলের বিকট আওয়াজ এসেছিল। পরের দিন তিনি এসে বললেন, “এই হামলায় আমার খুব কাছের একজন ভাই মাওলানা সাঈদুল্লাহ গুরুতর আহত হয়েছেন”। অবশ্য দুই সপ্তাহ পর (ক্ষতস্থানের ব্যথা-যন্ত্রনা ভোগ করে) শহীদ হয়ে গেছেন। (আল্লাহ তাকে কবুল করুন। আমীন)। এই হামলায় তার ভাইসহ আরো দুইজন সাথী শহীদ হয়েছেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পর তিনি একদিন বললেন, তোমাদের দুই পরিবারেরও সফরের ফয়সালা হয়েছে। পরের দিন সম্ভবত শা’বান মাসের

ঊনত্রিশ তারিখ ছিল, আমরা সফরের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলাম। ইতিমধ্যে তিনি আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসে দাড়ানো অবস্থায় কয়েকটি নসিহত করে চলে গেলেন। আমার খুব খারাপ লাগছিলো। এই অবস্থায় প্রিয় স্বামীকে রেখে আমি কোথাও যেতে চাচ্ছিলাম না। আর হিজরত ও জিহাদের ভূমি থেকে কোথাও যেতে মন চাচ্ছিলো না। এখানে শাহাদাত লাভের সম্ভাবনা খুবই দৃঢ় ছিল। সেনা অভিযানের এই পরিস্থিতিতে আমাদের সকলেরই শাহাদাতের খুব তামান্না ছিল। এখান থেকে আসলে কারোই যেতে মন চাচ্ছিল না। পুণরায় এখানে যে ফিরে আসা যাবে তেমন কোনো নিশ্চয়তাও নেই।

সারা রাস্তা কাঁদতে কাঁদতে গেলাম। এ অবস্থায় আমার জান্নাতের এই গুণটির কথা সর্বদা স্মরণে আসছিলো যে, জান্নাতবাসীদেরকে আপন জায়গা থেকে কখনো বের করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়ায় জান্নাতুল ফিরদাউসে আমাদের ঠিকানা বানিয়ে দিন, আমীন।

কিছুদিন পর যখন অবস্থা একটু ভালো হলো, তখন আমিসহ আরো কিছু মুজাহিদ পরিবারকে আবার পূর্বের অবস্থানে ফিরিয়ে নেয়া হলো। এর কিছুদিন পর আমরা প্রথমে মেহসুদ, তারপর উত্তর ওয়াজিরিস্তানে চলে গেলাম।

স্বভাবগতভাবেই তিনি দুনিয়াত্যাগী ছিলেন। অধিকাংশ সময় এবিষয়ে ওলামায়ে কেরামের সাথে আলোচনা করতেন। ভালো খাবারের প্রতি তার ছিল প্রচন্ড আগ্রহ, কিন্তু সর্বদা তা থেকে বেঁচে থাকতেন। আর আমাকেও সবসময় একথা বলতেন যে, "স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য সময়ে তুমি যে খাবার

রান্না কর, আমি আসলে তাই রান্না করবে। অতিরিক্ত আয়োজন করবে না।”

তিনি কোথাও ভালো কিছু খেয়ে আসলে ঘরে এসে তা বলতেন। তখন আমি তাকে বলতাম, “আমাকে তো আপনার পছন্দের খাবার তৈরী করতে দেন না”। উত্তরে তিনি বলতেন, “আমি যে খাবারেরই প্রশংসা করব তাই তৈরী করার পিছনে লেগে যাবে? নিজের শক্তি, যোগ্যতা, সময় ও মেধা এর থেকে উত্তম কাজে অর্থাৎ ইলম অর্জনে ব্যয় কর”।

তিনি মেহমানের সেবা-যত্ন সাধ্য অনুযায়ী খুব ভালোভাবে করার চেষ্টা করতেন। একবার আমাদের ঘরে শায়খ আবু ইয়াহইয়া লিব্বি রহ. এসেছিলেন। তিনি তার সাথে যুহদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করছিলেন। এদিকে আমি মেহমানের জন্য কেক বানিয়ে রেখেছিলাম। তিনি এসে নিয়ে গেলেন। শায়খ লিব্বি রহ. রসিকতা করে বলেছিলেন, فأين الزهد؟ (দুনিয়াত্যাগ কোথায় গেল?) তিনি হাঁসি দিয়ে বললেন, “এ তো মেহমানের সম্মানার্থে”। তিনি নিজে কখনো অতিরিক্ত কাপড় রাখতেন না, আমাকেও রাখতে দিতেন না। বিবাহের পর থেকেই কয়েকমাস পরপর আমার সমস্ত সামানপত্রের হিসেব নিতেন এবং অতিরিক্ত জিনিস দান করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। তার তরবিয়তের বরকতে কিছুদিনের মধ্যেই আমার বুঝে এসেছে যে, হিজরত ও জিহাদের ময়দানে যেহেতু সফর খুব বেশি করতে হয়, তাই সামানপত্র যত কম হবে, স্থানান্তর ও বহনকারী মুজাহিদ ভাইদের জন্য ততই সহজ হবে।

যুহদের সাথে সাথে আল্লাহ তা’আলা তাকে বিনয় ও নম্রতার গুণেও গুণান্বিত করেছিলেন। এমনিতেই কথা নিচু আওয়াজে বলতেন। কোন বড় ব্যক্তির সাথে কথা বলার সময় আওয়াজ আরো নিচু হয়ে যেত। একবার আমাকে

কোন একটি বিষয়ে একটি চিঠি লিখতে বললেন। আমি লিখে তাকে দেখালাম। তিনি কিছু শব্দ সংশোধন করে বললেন, "চিঠির ভাষা এমন হওয়া উচিৎ নয় যেন চিঠি পরে মনে হয় যে লেখক চিঠি লিখে পাঠকের উপর দয়া করেছেন, এক্ষেত্রেও বিনয় প্রকাশ করা উচিৎ। আমার কথাবার্তার মাঝে অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলোও তিনি সাথে সাথে সংশোধন করে দিতেন। একবার আমি কোন কথার প্রেক্ষিতে বলে ফেললাম, "আল্লাহ আপনাকে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন"। তিনি সাথে সাথে আমাকে বললেন, "তুমি তোমার কথা ফিরিয়ে নাও"। আমি বললাম, "আমি তো এমনিই বললাম"। কিন্তু তিনি নাছোড় বান্দা - তিনি বললেন, "তুমি তো আমাকে বদ -দোয়া দিয়েছ, কারণ আল্লাহ যাকে জিজ্ঞাসা করবেন সে তো ছাড় পাবে না"।

আরেকটি ঘটনা – একবোন একবার একটি ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। বোন হজ্জের সফরে থাকাকালীন সময়ে একবার ক্ষুধা পিপাসায় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন স্বপ্নে দেখেন তাকে ফল খাওয়ানো হয়েছে। ঘুম থেকে উঠে তার কোন ক্ষুধা-পিপাসা বাকি ছিলো না। আমি এই ঘটনা তাকে শুনিয়ে বললাম, "আল্লাহ তাকে জান্নাতের ফল খাইয়েছেন"। তিনি বললেন, "না। বরং তার স্বপ্নে মনে হয়েছে তাকে জান্নাতের ফল খাওয়ানো হয়েছে"।

একবার কোন এক ব্যক্তি কিছু সচ্ছল মুজাহিদ পরিবারের ব্যাপারে আলোচনা করল। আমি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "কখনও কারো ঘরের সামানপত্র, ভালো চলাফেরা, আলমারিতে রাখা অতিরিক্ত জিনিসপত্র তার তাকওয়ার মাপকাঠি বানাবে না। কারণ যে

ব্যক্তি হিজরত করে এসেছে, সে অবশ্যই অনেক কিছু ছেড়ে এসেছে। তোমার কি জানা আছে যে, এখন সে যেভাবে চলা-ফেরা করে, এর পূর্বে সে কেমনভাবে চলাফেরা করত? এবং কী পরিমাণ কুরবানি করে এখানে এসেছে? তাছাড়া নিজের সম্পদ নিজের জন্য খরচ করা তো হারাম নয়। তুমি তো এটাও জান না যে, তার সম্পদ জিহাদের কত কাজ উদ্ধার করে। সুতরাং কারো সম্পদ তার তাকওয়ার মাপকপঠি বানাবে না। নিজের জন্য তো মাপকাঠি বানাবেই না, অন্যের জন্যও এমনটা করবে না।

এমনিভাবে এক রমযানে আমরা একজনের বাসায় ছিলাম। পাশেই এক মারকাযে তিনি সাথীদের শরয়ী দাওরা করাচ্ছিলেন। স্বাভাবিকভাবে ইশা ও তারাবীহ পড়ে বাসায় আসতেন। একদিন ঐ ঘরের আপা বললেন, তিনি স্বপ্নে দেখেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পিয়াজ রসুনের ব্যবহার সম্পর্কে কোন একটি আদেশ করেছেন। আমি তাকে এই ঘটনা উল্লেখ করে বললাম, "আমাদেরও তো এই আদেশ মানা উচিত"। তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, "প্রথমত যে স্বপ্নে দেখেছে তার নিশ্চিত হতে হবে, যাকে সে দেখেছে তিনি আসলেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি না? নাকি তার ধারণা হয়েছে মাত্র (কারণ শয়তান হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকৃতি ধারণ করতে পারে না, কিন্তু অন্যের আকৃতি ধারণ করে রাসুল দাবী করতে পারে)। যদি সে সত্যিই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে থাকে এবং তিনি কোন আদেশ নিষেধ করেন তাহলে ঐ আদেশ-নিষেধ শরীয়তের আলোকে যাচাই করতে হবে। যদি শরীয়তের ভিতরে থাকে তাহলে আরো গুরুত্ব সহকারে আমল করা শুরু

করতে হবে। যেমন: দান-সদকা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদি। আর যদি না থাকে, তাহলে আমল করা যাবে না। কারণ আল্লাহ শরীয়ত পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। কারো ব্যক্তিগত স্বপ্নের উপর নির্ভরশীল করে রাখেননি। বরং আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে শরীয়ত ও কুরআন-সুন্নাহকে কেয়ামত পর্যন্ত উম্মতের জন্য পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন। এখন আর শরীয়তে নতুন কিছু বৃদ্ধি পাবে না"।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোচনা যেহেতু চলে এলো, তাই প্রাসঙ্গিক আরেকটি বিষয় উল্লেখ করছি। একবার তিনি বললেন, "আমাদের উস্তাদ বলেছেন - তোমরা পরীক্ষার খাতায়ও (তখন তো সময় সীমাবদ্ধ থাকে) যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামের সাথে দুরুদ শরীফ পূর্ণ লিখবে, সংক্ষেপে লিখবে না (কিছু বিষয় তো এমন আছে যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম বার বার আসে)। পূর্ণ দরুদ শরীফ লিখলে, এর দ্বারা সময়ে অনেক বরকত হবে ইনশা আল্লাহ।

তার আরেকটি গুণ আমি সর্বদা দেখেছি - সেটা হলো 'অন্তরের পরিশুদ্ধতা'। জিম্মাদারী পালনে তিনি ছিলেন তৎপর। মাসায়েল ও পেরেশানীর ক্ষেত্রে কখনও কোন সাথীর উপর অভিযোগ থাকলে হিকমতের সাথে তা প্রকাশ করতেন। এরফলে কিছুক্ষণ পরেই দেখা যেত ঐ সাথী নেতিবাচক চিন্তা মন থেকে সরিয়ে কোন কাজে লেগে গেছে। কিছুদিন পরেই তিনি ঐ সাথীর এমন প্রশংসা করতেন যে, আমি হয়রান হয়ে যেতাম। এমনিতে তিনি সাথীদেরকে খুব মুহাব্বত করতেন। অধিকাংশ সময় সাথীদের কল্যাণকর বিষয়গুলো আলোচনা করতেন।

শুরু থেকেই আমি দেখেছি - তিনি মুজাহিদীনের মাঝে পারস্পারিক ঐক্য ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে অনেক চিন্তা-ফিকির করতেন। তার এই চেষ্টা সম্পর্কে আমিও কিছু বিষয় জানতাম। তিনি একবার তার এক চিঠিতে শায়খ মুস্তফা আবু ইয়াজিদ রহ. এর একটি স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেছেন। শায়খ নিজে তাকে বলেছেন, "আমি স্বপ্নে দেখলাম তুমি আমার কাছে বসে মুজাহিদীনের মাঝে পারস্পারিক ঐক্য ও সুসম্পর্ক কম হওয়ার অভিযোগ করছ। এবং এ ব্যাপারে কথা বলতে বলতে কাঁদছ"। এ কথা বলে শায়খ মুচকি হাসতে লাগলেন এবং বললেন, "আল্লাহ তোমার চিন্তা-ফিকির ও চেষ্টাকে কবুল করুন"।

মুজাহিদীনের বিভিন্ন গ্রুপের মাঝে ঐক্য গঠন করা এক দুঃসাধ্য ও কঠিন বিষয় ছিলো। এই ঐক্য গঠনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের কাছ থেকেই পরিপূর্ণ ইখলাছ, ত্যাগ ও অন্যকে প্রাধান্য দেয়ার গুণ অত্যাবশ্যক ছিল। যখন এই চেষ্টা আলকায়দা উপমহাদেশ শাখা গঠন পর্যন্ত পৌছলো, তখন তার ইখলাছ, কুরবনী ও অন্যকে প্রাধান্য দান দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। নিঃসন্দেহে তার জন্য এ বিষয়গুলো সহজ ছিলো না। এসময়ে আমি তার মাঝে যে খুশি রাখা ও নিজেকে মিটিয়ে দেয়ার গুণাগুণ দেখেছি, নিঃসন্দেহে তা তার ইখলাছ ও স্বচ্ছ হৃদয়েরই প্রমাণ। আল্লাহ তাআলা তার ও সকল মুজাহিদ ভাইদের চেষ্টাকে কবুল করুন এবং জামা'আতের প্রতিষ্ঠা তার জন্য ও উম্মতের জন্য উপকারী করুন। আমীন।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অবস্থারও পরিবর্তন হতে লাগল। কখনো পরিস্থিতি ভালো, কখনো খারাপ। অবস্থা বেশি খারাপ হলে মুজাহিদ

পরিবারগুলোকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হতো। অবস্থা ভালো হলে আবার তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হতো। এমতাবস্থায় প্রত্যেক মুহাজির মহিলাদের মনের অবস্থা এই ছিল যে, আমরা এখানে থেকে শহিদ হয়ে যাব, তারপরও অন্য কোথাও যাব না।

কিছু কারণে ২০১৪ সালে একবার আমার পাকিস্তান আসতে হয়েছিলো। নিরাপত্তার দিক খেয়াল করে আমার স্বামী আমাকে যেতে দিতে চাচ্ছিলেন না। তারপর জুন মাসে দশদিনের জন্য পাঠালেন। আমি পাকিস্তানেই থাকাকালীন সময়েই পাকিস্তান সেনাবাহিনী ওয়াজিরিস্তানে হামলা শুরু করে দিল। আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম এই ভেবে যে, এখন কিভাবে ফিরে যাব?

দশদিনের স্থানে বিশদিন পর আমার ডাক আসলো। আমি সেখান থেকে ওয়ানা চলে আসলাম। কিছু দিন ওয়ানায় অবস্থান করে শাবিলে চলে আসি। আমার স্বামীর কোন খোঁজ-খবর পাচ্ছিলাম না। কিছুদিন পর একটি চিঠি আসলো - তাতে তিনি আমার ফিরে আসায় খুশি প্রকাশ করেছেন। সাথে এটাও লিখেছেন যে, এই মুহূর্তে দেখা করাটা কঠিন মনে হচ্ছে।

এদিকে রমযান মাস শুরু হয়ে গিয়েছিলো। দিনটি সম্ভবত সাত তারিখ ছিলো। আমরা অনেক মুহাজিরা মহিলা বাচ্চাদেরসহ এক ঘরের মধ্যে ছিলাম। এসময় হঠাৎ আমার প্রিয় দুইজন বোন প্রতিযোগীতার সাথে দৌড়ে আমার দিকে আসলো। তারপর বলতে লাগল, আপা! ভাইজান তো এসেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। মুজাহিদগন একজনের খুশিতে সবাই খুশি হন ,একজনের দুঃখে সবাই দুঃখী হন। ঈমানের সম্পর্ক অনেক সময় রক্তের সম্পর্কের চেয়েও গভীর হয়। তিনি এসে বললেন, আগামী নির্দেশ না আসা

পর্যন্ত আমি এখানেই থাকব।

যেদিন তিনি আসলেন, সেদিন রাতে সেহরীতে উঠার জন্য আমি ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রেখেছিলাম। হঠাৎ বোম্বিংয়ের আওয়াজে প্রথমে তার তারপর আমার ঘুম ভাঙলো। তারপরই এলার্ম বেজে উঠলো। অর্থাৎ ঠিক দুইটার সময় হামলা হয়েছে। তিনি বললেন - পাকিস্তানী জেট বিমান বোম্বিং করছে। সাথে সাথে মহিলাদেরকে বাচ্চাসহ আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যেতে বললেন। ভাইদের বললেন ঘর থেকে বের হয়ে গাছগাছালির নিচে আশ্রয় নিতে। নিচের দুইটি কামরাতে সমস্ত মহিলা ও বাচ্চাদের জায়গা হয়ে গিয়েছিল। আর একটি গর্তের মত জায়গা ছিলো, সেখানে আমরা দুইজন জায়গা করে নিলাম। তিনি সবাইকে কিছু জরুরী নির্দেশনা দিলেন। তিনি বললেন, "আমরা সবাই আজ থেকে সেহরী নিচে খাবো(প্রয়োজনে রাতেই খাবার তৈরী করে সকালে ঠান্ডা খাবে)। তারপর ফজর পড়ে উপড়ে যাব। আবার ইফতার শেষ করেই নিচে এসে মাগরীব ও ইশা আদায় করব"। কিছু বয়স্ক মহিলা ও বাচ্চাদের জন্য এই নিয়ম অনুযায়ী চলা খুবই কষ্টকর হয়ে গেলো। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ সবাই এই উসূল অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গরুপে আ'মল করেছেন। আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন। সকালে জানতে পারলাম যে, পাক-বাহিনী সাত জায়গায় বোম্বিং করেছে। শহীদ ও আহতদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল কম, নারী ও শিশুদের সংখ্যা ছিল বেশী। ধংসস্তুপ সরানোর দায়িত্বে থাকা ভাইরা ধ্বংসস্তুপ সরানোর কাজ করছিলেন।এসময় একজায়গা থেকে খুব সুঘ্রাণ আসতে লাগলো। ভাইয়েরা সেখান থেকে তাড়াতাড়ি ধংসস্তুপ সরানো শুরু করলেন। এই সুঘ্রাণ তো

শহীদদের বিশেষ বৈশিষ্ট ছাড়া আর কিছুই না!! তারা সেখানে একজন মহিলার লাশ পেলেন। যিনি পোল্যান্ডের অধীবাসী নওমুসলিম ছিলেন। তিনি কুরআন শরীফ মুখস্ত করছিলেন, মাত্র কয়েক পৃষ্ঠা বাকি ছিলো। আল্লাহ তা'আলা তাকে শাহাদাতের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। (نحسبها كذالك অর্থ:এমনটাই আমাদের বিশ্বাস) এমনিভাবে আমাদের আরেকজন প্রিয় ভাই স্ত্রী ও দুই ছোট মেয়ে সহ শহিদ হন। এক মেয়ের বয়স ছিল সাত বছর, আরেকজনের প্রায় নয় বছর। ছোট মেয়েটিকে তার পিতা কুরআনের শেষ তিন পারা মুখস্ত করিয়েছিলেন এবং লেখাও শিখিয়েছিলেন। মেয়েটি পড়া লেখায় এত মজবুত ছিল যে, লেখা বা পড়াতে কোন ভুল হত না। এছাড়া আরো কিছু মুজাহিদও শহীদ এবং আহত হয়েছেন।

এই হামলায় আল্লাহর রহমতের কিছুটা বহিঃপ্রকাশ এভাবে হয়েছে যে, হামলায় ধ্বসে যাওয়া ঘরগুলোর একটি ঘরে মোটা অংকের বাইতুলমালের আমানত রাখা ছিলো। দায়িত্বশীল ভাইয়েরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ যাদের কাছে আমানত ছিলো তারা তো শহিদ হয়ে গেছেন। এখন এই ধ্বংসস্তুপ থেকে বায়তুল মাল কিভাবে বের করবে? কোথায় তালাশ করবে? আমানতের মাল তালাশের জিম্মাদার মুজাহিদ ভাই সামান-পত্র বের করছিলেন, আর প্রত্যেকটি জিনিস ভালোভাবে দেখছিলেন। কয়েকঘন্টা চেষ্টার পর ক্লান্ত হয়ে ঐ জায়গায়ই বসে পড়লেন।

অপরদিকে উদ্ধারকর্মী ভাইয়েরা তার থেকে কিছু দুরে মাটিসহ আটার একটি বস্তা এবং আরো কিছু সামানা বের করে রাখলেন। জিম্মাদার ভাই নিরাশ হয়ে সেই সামান-পত্রের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল

এর মাঝে আমানতের মাল পাওয়া যাবেনা। এরপর তিনি ঐ সামান খুলতে গেলেন। যেই প্রথম থলে খুললেন, তাতেই ঐ আমানত পেয়ে গেলেন। এটা আল্লাহর এক খাছ রহমত ছিলো, নতুবা এই মাল বের করা মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

বাইতুল মালের ব্যাপারে একভাই একবার বলছিলেন, নিজের মালের তুলনায় আমানতের মালের প্রতি বেশি খেয়াল রাখতে হয়। কারণ এটা গোটা উম্মতের আমানত। সুতরাং তা হেফাজতের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা ও দোয়া করে আল্লাহর উপর ন্যস্ত করা। আর বেশি বেশি এই দোয়া করা, 'হে আল্লাহ! এই মাল আপনার, আপনিই তা হেফাযত করুন। আল্লাহ থেকে বড় হেফাযতকারী আর কেহ নেই।

এই হামলার পূর্বে শাবিল এলাকা তুলনামূলক কিছুটা নিরাপদ ছিলো। কিন্তু হামলার পর সিদ্ধান্ত হলো মুজাহিদ পরিবারগুলোকে আরো দূরবর্তী এলাকায় পাঠানো হবে। আমাদের জন্য এটি খুবই কষ্টদায়ক সংবাদ ছিলো।

সবাই আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলো। আমি গিয়ে সবাইকে বললাম আমাদের সবার চলে যাওয়ার ফয়সালা হয়েছে। একথা শুনে সবাই কিছুক্ষণ চুপ ছিলো। তারপর সবাই হাসতে লাগলো। তখন আল্লাহর রহমত আমাদের উপর নাযিল হচ্ছিলো, তিনিই আমাদের অন্তরগুলোকে প্রশান্ত রেখেছিলেন। আমাদের হাসি শুনে অন্য কামরা থেকে এক বোন এসে বলল, "হাসার কারণ কি"? আমরা কারণ বললাম। সে বলল, "এটা কি হাসির খবর নাকি কান্নার খবর"? আমরা বললাম, "আল্লাহ আমাদেরকে বোমা বর্ষণের মাঝেও যখন হাসাচ্ছেন তখন আমরা কেন হাসব না?!!!"

এবার আমাদের প্রসঙ্গে চলে আসি। তিনি যখন আমাকে বললেন, তোমাদের সবাইকে এখান থেকে চলে যেতে হবে - তখন থেকে আমার চোখের অশ্রু থামছিল না। তিনি নীরবে বসে আমাকে দেখছিলেন। এশা ও তারাবীহ পড়ে যখন দোয়া করতে বসলাম, তখন আবার অশ্রু প্রবাহিত হওয়া শুরু হলো। যখন কোনভাবেই আমার চোখের পানি থামছিল না, তখন তিনি আমাকে বললেন, "এবার থামো"। আমি অনেক কষ্টে কান্না থামিয়ে তার কাছে এসে বসলাম। তিনি বললেন, "তালেবানদের ইমারতে ইসলামিয়া হাতছাড়া হওয়ার পর শায়খ উসামা রহ. নিজের সাথীদের নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক জায়গায় থামলেন। সেখান থেকে শায়খ উসামা রহ. নিজের রাহবার এবং আরো কিছু সাথী নিয়ে অন্যদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। পৃথক হওয়া দলে শায়খ উসামা রহ. এর একজন ছেলেও ছিল। শায়খ রহ. তার ছেলেকে নিয়ে একপাশে চলে গেলেন। পিতা-পুত্রের এই সাক্ষাৎ খুব আবেগঘন ছিল। কারণ কারোই জানা ছিলো না পরস্পরে আর দেখা হবে কি না!! শায়খ তার ছেলেকে লক্ষ্য করে বললেন, "আমার সাথে ওয়াদা কর - কখনো জিহাদ পরিত্যাগ করবে না!!"। তিনি (আমার স্বামী) এতটুকু বলেই চুপ হয়ে গেলেন। আমি তার নসিহত বুঝতে পারলাম এবং আমার থেমে যাওয়া অশ্রু আবার প্রবাহিত হতে লাগলো।

সেহরির পর সবাই ফজরের নামাযের উদ্দেশ্যে পালাক্রমে অজু করে নিল। এখন আমাদের পালা। আমরা অজুর উদ্দেশ্যে বের হলাম। মাত্র দুই তিন সিড়ি উঠেছি, এমন সময় জেট বিমানের আওয়াজ আসতে লাগলো। আমরা সাথে সাথে নিচে নেমে গেলাম এবং সিড়ির গোড়ায় দাড়িয়ে গেলাম। তখন

আমি বললাম "হে আল্লাহ! আমাদেরকে সবধরনের পরীক্ষা থেকে হেফাযত করুন। বিশেষ করে গ্রেফতারী, অক্ষম হওয়া ও মাজুর হওয়া থেকে হেফাজত করুন এবং পরিপূর্ণ শাহাদাত নছিব করুন"।

একথা শুনে তিনি হাসতে হাসতে রসিকতা করে বললেন, বেগম সাহেবা! শাহাদাত তো সর্বদা পরিপূর্ণই হয়। আধা, পৌনে কিভাবে হয়"? আমি একটু ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললাম, "আমার উদ্দেশ্য হলো দেহের কোন (عضو) 'অঙ্গ' শহিদ না হোক। বরং একসাথে পরিপূর্ণ শাহাদাত নছিব হোক"। একথা শুনে তিনি হেসে বললেন, "বেগম সাহেবা! শব্দটি عضو (আইন ও দ্বোয়া হরফে পেশ দিয়ে) উদু উচ্চারণ হবেনা বরং দ্বোয়া হরফে যজম দিয়ে "উদউ" উচ্চারণ হবে। পরিস্থিতির কারণ তখন আমার উচ্চারণে ভুল হয়েছিল। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে এই পরিস্থিতেও তিনি আমার দোয়া শুনেছেন আর শব্দের ভুল শুধরিয়ে দিচ্ছেন। যাইহোক পরবর্তীতে প্রমানিত হয়েছিল যে, মানুষের কোন দোয়াই বৃথা যায় না। তাই দোয়ার ক্ষেত্রে কৃপণতা করা উচিৎ নয়। শাবিলে আমরা যে বাড়িতে ছিলাম সেখানে উত্তর দিক থেকে মুজাহিদ পরিবারগুলো এসে অবস্থান করত। এরপর সামনের মনযিলে চলে যেত। আমিও আমার পালার অপেক্ষা করছিলাম। আমি ধারণা করছিলাম আমার সফরের সময় আমার স্বামী আমার সাথে থাকবেন। কিন্তু অতি দ্রুতই আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হল।

একদিন আমরা উভয়ে দিনের বেলাই আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেলাম। কারণ উপরে কোন কামরা খালি ছিলো না। তিনি বললেন, "আমি একটু ঘুমাব। আমি বললাম, "না ঘুমানো যাবেনা। আজ আমার সাথে কথা-বার্তা বলবেন"।

তিনি আমার কথা শুনলেন। সাধারণত তিনি বেশী কথা বলতেন না। বিবাহের পর প্রথম প্রথম আমি এবিষয়টা নিয়ে অনেক ঝগড়া করতাম। আমার অভিযোগ ছিল সাথীদের সাথে এত কথা বলেন অথচ আমার সাথে বলেন না। তিনি বলতেন, "সাথীরা তো কোন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করে। তুমিও দ্বীন, জিহাদ বা সমসাময়িক কোন আলোচনা শুরু কর, আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করব। কিন্তু এমনিতেই আমার কথা আসে না"। তারপর থেকে আমাদের কথা-বার্তা জিহাদ ব্যতিত আর কিছুই ছিলনা।

যাই হোক আন্ডারগ্রাউন্ডে বসে আমি আমার মানসিক পেরেশানীর কথা জানালাম। সংবাদপত্র ইত্যাদিতে যে খবরাখবর পড়েছিলাম তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জানতে চাইলাম। তিনি আমাকে সবকিছু বিস্তারিত বললেন।

আইএসের ব্যাপারে আমার মন খুব ভারাক্রান্ত ছিলো। কিছু মুজাহিদ ভাইয়েরা তাদের সাথে যোগ দিচ্ছিলো। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "একজন মানুষ শত কুরবনী করে আল্লাহর রাস্তায় এসে গোমরাহ হয়ে যাবে? এটা কিভাবে এবং কেন হয়? তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঘর থেকে বের হয়, তারপর আল্লাহর সন্তুষ্টির উপরেই নিজেকে অর্পণ করে, তাকে আল্লাহ কখনো গোমরাহ করেন না। কারণ আল্লাহ কারো উপর যুলুম করেন না। কিন্তু মানুষের অন্তরে যদি কোন ত্রুটি থাকে অথবা যদি তার আমল-আখলাকে শরীয়ত বিরোধী কোন দোষ থাকে, তাহলে আল্লাহ তাকে সংশোধনের সুযোগ দেন। যারা ভালো তবিয়তের হয় তারা দ্রুত বা সময়সাপেক্ষে সংশোধন হয়ে যায়। আর কিছু মানুষ আছে যারা আল্লাহর দেয়া সুযোগকে গ্রহণ করে না। নিজের খারাপ স্বভাবের উপর অটল

থাকে। সময়ের সাথে সাথে তার এই খারাপ স্বভাব বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত খারাবির তীব্রতা প্রকাশ পায়। এরাই পরবর্তীতে গোমরাহ হয়ে যায় ”।

এধরনের আরো কিছু কথা জিজ্ঞাসা করার পর আমি তাকে বললাম, “এতদিন তো আপনি আমাকে আঙ্গুল ধরে ধরে এই রাস্তায় চালিয়েছেন, প্রত্যেকটি বিষয় বুঝিয়েছেন। আপনি যদি শহীদ হয়ে যান, তাহলে আমাকে সকাল-সন্ধায় প্রকাশিত এই ফেতনায় কে রাস্তা দেখাবে”? তিনি বললেন, “আল্লাহ তো আছেন। তিনি সবাইকে হেদায়াত দান করেন। তিনিই রাস্তা দেখাবেন”। আমি বললাম, “আল্লাহর সুন্নত হলো দুনিয়াতে মানুষের সংশোধন অন্য কোন মানুষের মাধ্যমে করেন। (আল্লাহ সমস্ত মাধ্যমের স্রষ্টা, তিনি কোন মাধ্যমের মুখাপেক্ষী নন)। আল্লাহ আমার সংশোধনের জন্য আপনাকে নির্ধারণ করেছেন”। তিনি বললেন, “অনেক বিষয়ই তো আমি তোমাকে সাথে সাথে রেখে বুঝিয়েছি। আমার কথাগুলো স্মরণ রাখবে। শায়েখদের বয়ান শুনতে থাকবে। কুরআন তেলাওয়াত করতে থাকবে”। এরপর সবসময় উনি যে কথাটা বলেন সেটা আবারও বললেন, “আমার পর আবার বিবাহ করবে, কোন মুজাহিদের দ্বিতীয়, তৃতীয় নম্বর স্ত্রী হয়ে থাকাকে সহ্য করবে, কিন্তু একা থাকবে না”। শেষে আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন “যদি ফেতনা থেকে বাঁচার কোনও উপায় না পাও তাহলে ইয়েমেনে হিজরত করবে। কারণ (হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী) ইয়েমেনে কল্যাণ রয়েছে”। ঐদিন আমাদের আলোচনা এপর্যন্তই সমাপ্ত হয়েছিলো।

আমার রওনা করার পূর্বেই তার রওনা করার আদেশ হল। আমরা শুধুমাত্র ছয়দিন একত্রে ছিলাম। এই ছয়দিনে তিনি বারবার আমাকে একথা

বলছিলেন, “আমার অমুক কথা ভালোভাবে স্মরণ রেখ, পরে আমি থাকব কি না জানিনা। অথবা আমার অমুক কথা ভালোভাবে বুঝে নাও, পরে আমি নাও থাকতে পারি। অমুক জিনিসটা তোমার কাছে হেফাযত করে রাখ, পরে আমি থাকি কি থাকি না জানা নেই”।

বলতে বলতেই সফরের সময় হয়ে গেলো। তিনি প্রস্তুতি নিলেন। পোশাক পড়ে ক্লাসিনকোভ কাঁধে ঝুলিয়ে নিলেন। তারপর আমার দিকে তাকালেন, আমিও তাকে দেখছিলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেঁসে বললেন, “আমাকে ভালোভাবে দেখে নাও, পরে হয়ত নাও থাকতে পারি”। তারপর তিনি চলে গেলেন।

কিছুদিন পর আমিও ওয়ানায় চলে গেলাম। সেখানে এক আনসারের ঘরে আমার সাথে অপর এক বোনও ছিলো। একদিন খবর পেলাম উত্তরাঞ্চলে বোমা হামলা হয়েছে। দুইজন জিম্মাদার ও চারজন সাথী শহিদ হয়েছেন। সংবাদদাতা মুজাহিদ ভাই যখন পর্দার অপর পাশ থেকে এই খবর দিলেন, তখন আমরা দুইবোন একে অপরের দিকে তাকালাম। মুজাহিদ ভাই একথা বলে চলে গেলেন যে, “যদি বিস্তারিত সংবাদ জানতে পারি, তাহলে জানাবো”। আমরা চুপ করে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর একে অপরকে জিজ্ঞাসা করলাম, মনের কি অবস্থা? (কারণ আমাদের ধারণা ছিলো উভয়ের স্বামীই শহিদ হয়ে গেছে) দু’জনেরই উত্তর ছিলো - মন প্রশান্ত আছে। যদি কিছু না হয়ে থাকে তাহলে তো এমনিতেই প্রশান্ত। আর যদি কিছু হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশান্তির প্রতিশ্রুতি তো আছেই। কিছুদিন ওখানে থাকার পর রমজানের শেষ দশকে আমি পাকিস্তান চলে আসি।

পাকিস্তান আসার পরও আমার স্বামীর সাথে চিঠি-পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ অব্যাহত ছিলো। অক্টোবর মাসে কুরবানী ঈদের দুইদিন আগে তার একটি অডিও বার্তা আসল। তাতে তিনি তার খবরাখবর জানানো ছাড়াও আমার অনুরোধে কিছু নসিহত করেছিলেন। আমি তার নির্বাচিত কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করছি।

"পরীক্ষার এই কঠিন মুহুর্তে ধৈর্য এবং আল্লাহর উপর সুধারণা বজায় রাখবে। প্রত্যেকে নিয়মিত নিজের আমলের হিসাব নিবে, আল্লাহর সাথে সম্পর্কের গভীরতার হিসাব নিবে। দ্বীনের উপর অবিচলতা, জিহাদের সাথে সম্পৃক্ততা, এবং নিজ দেশ ও সারা দুনিয়ায় শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জযবা ঠিক রাখবে। নিজ জাতীকে হেদায়াতের পথে নিয়ে আসার জযবা, এবং এর জন্য কুরবানী পেশ করার জযবা যদি হ্রাস না পায় তাহলে সে সফল। আর এই ধরণের সফলতাই হল আসল সফলতা"

"যেখানেই থাকবে নিজেকে বড় মনে করে নয় বরং বিনয়ের সাথে থাকবে। আশপাশের মানুষের মাঝে কল্যাণ ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। খারাপ কাজে বাঁধা দিবে। এ কাজগুলো করতে গেলে কিছু না কিছু কষ্ট করতেই হয়। অনেক সময় মানুষের কটু কথাও শুনতে হয়। কিন্তু এজন্য সবকিছু ছেড়ে বসে থাকা যাবে না। মোটকথা মনে করতে হবে আল্লাহ আমাদের উপর এই জিম্মাদারী দিয়ে রেখেছেন।

"যদি আমি শহিদ হয়ে যাই তাহলে অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাবে। জানি না জীবনের আর কতদিন বাকি আছে। আল্লাহর কাছে واخلف لي خيرامنه (আল্লাহ! তুমি আমাকে তার থেকে উত্তম প্রতিনিধি দান

কর) বলে দোয়া করতে থাকবে। আল্লাহর ভান্ডারে কোন কিছুরই কমতি নেই। জান্নাতের দিকে প্রত্যেককে একাই সফর করতে হবে। আর প্রত্যেকেই আল্লাহর কাছে একা উপস্থিত হবে।

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا

কেয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে একাকী অবস্থায় আসবে। সূরা মারঈয়াম - ১৯:৯৫

জযবা-উৎসাহ সবই আপন জায়গায় ঠিক থাকবে, বাকি সবার আগে এবিষয়টি চিন্তা করবে যে, দ্বীনের জন্য আমার কোনটা করা উত্তম হবে? আখেরাতের জন্য আমার কী করা উত্তম হবে? একজন মহিলা কি কোন দ্বীনদার, অথবা কোন মুজাহিদ, কিংবা কোন নেককার ব্যক্তি ব্যতিত আখেরাতের পথে চলতে পারবে? যদি না পারে তাহলে এটা আল্লাহর রহমত যে, আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের জন্য এর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তারা আল্লাহর এই নেয়ামত দ্বারা ফায়দা গ্রহণ করবে।

"পরীক্ষার এই স্তরগুলোতে দুর্বলতার কথা যেই বলবে, এর দ্বারা নিজেও প্রভাবিত হবে না, এবং অন্যকেও প্রভাবিত হতে দিবেনা। বরং বুঝাবে যে, এই সমস্ত 'জ্ঞানের' কথা ঐসময় কেন বুঝে আসেনি যখন কুফরের মাথার উপর এবং পাকিস্তানী হুকুমতের উপর ধামাধাম হাতুড়ি পড়ছিলো? আমরা এখন একটু দুর্বল হয়ে গেছি এবং আমাদের উপর কিছু আঘাত এসেছে, এটা ছাড়া তখন আর এখনের মাঝে আর কী পার্থক্য আছে? অবস্থা কঠিন হওয়ার কারণে সঠিক অবস্থান থেকে সরে যাওয়া, ওয়াজিব জিহাদ থেকে পিছু হটা, এটা তো মুমিনের শান নয়!!

এটি সাধারণ কোন বিষয় নয়, এটা আল্লাহর সাথে আমাদের আত্মমর্যাদাবোধের বিষয়। আমাদের জন্য এ রাস্তা থেকে সরে যাওয়া মোটেই উচিত নয়। এগুলি তো আমাদেরকে ধোঁকা দিতে পারেনা। আল্লাহ আমাদেরকে এই পথে দৃঢ়তা দান করুন। আমিন। এই 'জ্ঞানের'কথা বললে, আগেই বলার দরকার ছিল। এই জিহাদের ব্যাপারে কোন সংশয় থাকলে আগেই প্রশ্ন উত্থাপন করে জেনে নেওয়ার দরকার ছিলো, যখন আমাদের শক্তি ছিলো। এখন দুর্বলতার সময় এবিষয়গুলি উত্থাপন উচিত নয়। দুর্বলতার সময় শক্ত হয়ে স্থির থাকো, আর আল্লাহর সাহয্যের অপেক্ষা করতে থাকো। ইনশা'আল্লাহ আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটবর্তী"।

এরপর আরো দুই মাস পার হয়ে গেলো কিন্তু তার কোন খোঁজ-খবর আমি পাইনি। আমি দোয়া করছিলাম আর তাঁর খোজ-খবরের অপেক্ষা করছিলাম। ডিসেম্বর মাসে মিডিয়ায় তার শাহাদাতের অস্পষ্ট সংবাদ প্রচারিত হলো। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তা'আলা আমাকে দৃঢ়তা দান করলেন। তাৎক্ষণিকভাবে আমার স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত হলো। আমি অস্থায়ীভাবে এক আনসারীর বাড়িতে চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম যে, তিনি ভালো আছেন। মিডিয়ার প্রচারিত সংবাদ সঠিক ছিলনা। এরপর তাঁর কিছুদিন পূর্বের লেখা একটি চিঠি আমি পেলাম। তার কিছুদিন পর আবার আমি অন্য এক আনসারীর বাড়িতে স্থানান্তরিত হলাম।

নতুন জায়গায় আমি একদম একা ছিলাম। একটি বড় বাড়ির দোতলা একদম খালি ছিলো, আমি সেখানে থাকতাম। বাড়ির লোকজন নিচতলায় থাকতো। আমি সবসময় উপরেই থাকতাম। তবে রাতের খাবার সাধারণত

নিচে এসে আনসারী মহিলার সাথে খেতাম। তারপর আবার উপরে চলে আসতাম। এই একাকিত্বের মধ্যে আল্লাহ আমাকে স্থির রেখেছেন। আমার স্বামী আমাকে তাফসীর পড়তে বলতেন, কিন্তু তাফসীরের দীর্ঘ আলোচনা পড়তে আমার সাহস হতো না। একবার বলেছিলেন, "'তাফসীরে সা'দী' পড়। এটি সংক্ষিপ্ত এবং ব্যক্তিগত সংশোধনের জন্য অনেক উপকারী হবে ইনশা'আল্লাহ। আসল ফায়দাতো মূল আরবী পড়ায়, কিন্তু তুমি উর্দু তরজমাটাই পড়"।

তিনি নিজেও কিছুদিন পূর্বে এই কিতাব পূর্ণ অধ্যয়ন করেছেন। আমি তার এই নসিহতের উপর পুরোপুরি আমল করতে পারিনি। এখন এই একাকিত্বের সময় তাফসির অধ্যয়ন শুরু করলাম। আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাফসীরের বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করার তাওফীক দান করেছেন। আমিও কিতাবটি অনেক উপকারী পেয়েছি। একাকিত্ব ও পেরেশানীর এই কঠিন মূহুর্তে আল্লাহ আমাকে সূরা আলে ইমরানের ব্যাখ্যা বুঝার তাওফীক দান করেছেন। উহুদ যুদ্ধের আলোচনা, তাতে আল্লাহ তা'আলার কুদরতি পরীক্ষা এবং তা থেকে অর্জিত শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ আমার হিম্মত বাড়িয়ে দিলেন। তিনি তাওফীক দিয়েছেন বিধায় বুঝার জন্য অন্তর এবং জেহেনও খুলতে শুরু করেছিল।

আমি সবধরণের যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম। সংবাদমাধ্যমে তো বিশ্বের খবরাখবর পাচ্ছিলাম, কিন্তু স্বামী ও পরিবারের কোন সংবাদ আমার কাছে ছিলো না। তার শাহাদাতের খবরটিও মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম না।

ঐ সময়েই আমি একটি স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নে শাইখ আয়মান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহকে দেখলাম, বাহ্যত ঐ স্বপ্নে কোন আওয়াজ, কথা বা শাহাদাতের কোন ইঙ্গিত ছিলো না। (বাকি আমি কিছুই বুঝতে পারছিলামনা)। কিন্তু স্বপ্নের মধ্যেই আমার মনে হচ্ছিল যে, এটা তার শাহাদাতের ব্যাপারে স্বপ্ন। এর পূর্বে অক্টোবর মাসে যখন তার অডিও বার্তা পেয়েছিলাম, তখন একদিন স্বপ্নে দেখি যে, তার শহীদ ভাই তাকে নেয়ার জন্য এসেছে। তখনও স্বপ্নের মধ্যেই মনে হয়েছিলো, এটি তার শাহাদাতের ব্যাপারে স্বপ্ন। এই দুই স্বপ্ন দেখার পরেও আল্লাহ আমার অন্তরকে স্থির ও প্রশান্ত রেখেছেন।

সময়টা মার্চের একুশ তারিখ ছিলো। আমার শ্বশুর আমার সাথে দেখা করতে আসলেন। আমি ধারণা করলাম তিনি বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে এসেছেন। সালামের পরই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আব্বুজি! ভালো আছেন তো"? তিনি ইতিবাচক উত্তর দিয়ে আমার সাথে এদিক সেদিকের কথা বলতে লাগলেন। আমি দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করলাম, "আব্বুজি! সবার খবর ভালো তো"? তিনি এবারও ইতিবাচক উত্তর দিলেন এবং অন্যান্য কথা বলতে থাকলেন। এরপর তৃতীয় বার আমার প্রশ্নের পুণরাবৃত্তি করলাম, তখন তিনি বললেন, "বেটি! সালমান তো শহীদ হয়ে গেছে"। আমি 'ইন্না লিল্লাহি ওয় ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়লাম। এরপর বললাম, "কবে"? তিনি বললেন, "জানুয়ারিতে"। আমি বললাম, "নিশ্চিত"? তিনি বললেন, "হ্যাঁ। এই নাও তার লেখা চিঠি। তারপর আমাকে কিছু চিঠি দিলেন"। চিঠির মাঝে সান্ত্বনামূলক কথার সাথে তার একটি ওছিয়তও ছিলো। আল্লাহ আমাকে ধৈর্য

ধারণ করার তৌফিক দিলেন। আমি ওসিয়তনামাটা অক্ষরে অক্ষরে পড়ে শ্বশুরকে শুনালাম।

রাতে ওসিয়তনামাটা কয়েকবার পড়ার পর ঘুমিয়ে পরলাম। কিন্তু একটু পরেই ঘুম ভেঙে গেলো। মন এতটাই অস্থির ছিলো যে, মনে হচ্ছিলো আর কোনদিন মন শান্ত হবে না। তখন আমার ড. আরশাদ ওহিদ রহ. এর স্ত্রীর কথা মনে পড়ছিলো। যখন ড. সাহেবের শাহাদাতের পর আমি তার কাছে গেলাম, তখন তিনি বলেছিলেন - মনে হচ্ছে কে যেন বাস্তবেই আমার কলিজার একটি টুকরা টেনে বের করে নিয়ে গেছে। এই অবস্থায় আমি দোয়া করেছি, আল্লাহ! আপনি আমার কষ্টের প্রতিটা মুহুর্তের জন্য প্রতিদান দান করুন"। আমার মনের অস্থিরতা এতটাই বেশি ছিলো যে, মনে হচ্ছিলো আমার কলিজা ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে। শারিরীকভাবেও কষ্ট অনুভব করছিলাম। এই কঠিন মসিবতে আমার রব ব্যতীত নির্ভরতার আর কেউ ছিলনা। তাই আমি রাতের এই একাকিত্বের মূহুর্তে আল্লাহকেই স্মরণ করতে লাগলাম।

আল্লাহর রহমত, দয়া ও তাঁর ভলোবাসার উপর আমাদের জীবন কুরবান হোক। তিনিই তাঁর বান্দাকে ভালো কাজের তাওফীক দেন। এরপর যখন বান্দা দুর্বল পায়ে উঠে দাঁড়ায়, তখন আল্লাহ নিজে অগ্রসর হয়ে তার হাত ধরেন। তাকে আশ্রয় দান করেন, সান্তনা দান করেন। তার মন ভালো করেন। হিম্মত হারাতে দেন না। মন শক্তিশালি করেন, পথ চলা সহজ করেন। শেষ পর্যন্ত সে নিজ পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। তখন আল্লাহ তাকে পরীক্ষায় ফেলেন। পরীক্ষার ভাটায় ফেলে পাকা বানান। তবে আনন্দের

বিষয় হলো আল্লাহ পরীক্ষায় ফেলে সাথে সাথে এমন প্রশান্তি দান করেন যে, পরীক্ষার কোন কষ্টই অনুভব হয় না। সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম।

শাহাদাতের খবর আসার তৃতীয় দিন। আমি বাহ্যিকভাবে স্বাভাবিক ছিলাম। কিন্তু মন খুবই অস্থির ছিলো। লাগাতার দোয়া কালাম পড়ছিলাম। আমি কাপড় ইস্ত্রি করছিলাম, আর আকাশ-পাতাল ভাবছিলাম। কেবল একটি চিন্তাই সকল চিন্তার উপর প্রবল হচ্ছিল যে, আমার স্বামী সত্যি কী শহীদ হয়েছেন? আমি আর কিছু ভাবতে পারছিলাম না।

বিভিন্ন যিকির আযকার পড়তে পড়তে حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل পড়ছিলাম। হঠাৎ দোয়ার অর্থের দিকে খেয়াল গেলো। আমি কোন দোয়া পড়ছি? আমি কাকে ডাকছি? আমি তো বলছি حَسْبُنَا اللّٰه; আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তাহলে আমার এত চিন্তা করার প্রয়োজন কী? আমার অন্তর অস্থির কেন? আমার আল্লাহ তো আছেন। যিনি চিরঞ্জীব, সর্বদা বিদ্যমান, চিরকাল আছেন, চিরকাল থাকবেন। তারপর আমার ঐসমস্ত আয়াত মনে পড়ল, যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সকল সাহাবায়ে কেরামের সামনে পড়েছিলেন।

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّٰهُ الشَّاكِرِينَ

আর মুহাম্মাদ একজন রাসুল বৈ তো নয়! তাঁর পূর্বেও বহু রাসুল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে

তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুতঃ কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধ হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন। (সূরা আল-ইমরান ৩:১৪৪)

একথাও মনে পড়ল যে, শহীদগণ তো জীবিত। আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিক প্রাপ্ত হন। আল্লহর নেয়ামতে খুশি প্রকাশ করেন। তাদের কোন ভয় নেই, কোন চিন্তা নেই। আল্লাহ আমার অন্তরকে প্রশান্ত করে দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ এর পর আর কখনো মন অস্থির হয়নি।

আমার অন্তরে বারবার এই খেয়াল আসছিলো, না জানি তার জীবনের শেষ দিন কোথায় কিভাবে, কোন অবস্থায় কেটেছে? কার কার কথা মনে পড়েছে? এধরণের অনেক কথা মনে ঘুরপাক খচ্ছিলো। সমবেদনা জানানোর জন্য আগত মহিলাদের মধ্যে একজন বললেন "নিশ্চয়ই তিনি আপানার নামে কোন চিঠি লিখে রাখবেন"। আমি তার কথা শুনে হাঁসলাম আর ভাবলাম, যেখানে তার শাহাদাতের খবরই পেলাম প্রায় সোয়া দুইমাস পর, সেখানে তিনি যদি কোন চিঠি লিখেও রাখেন, তা কিভাবে পাওয়া যাবে? যদি কিছু পাওয়া যেতই তাহলে ওয়ছিয়তের সাথে পাওয়া যেত। কিন্তু ঐ মহিলার কথা অক্ষরে অক্ষরে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে (আল্লাহ তাকে আনন্দিত রাখুন)। কিছুদিন পর আমার নামে লেখা আমার স্বামীর সর্বশেষ পত্র হস্তগত হলো। আলহামদু লিল্লাহ।

সম্ভবত এটি তার সর্বশেষ চিঠি ছিলো - যা তার শাহাদাতের পাঁচ/সাত দিন পূর্বে লিখেছিলেন। এই চিঠি তার অভ্যাসের বিপরীত খুব দীর্ঘ ছিলো। সাধারণত তার চিঠি সংক্ষিপ্ত হত। কিছুটা সরকারী চিঠির মতো। জরুরী কিছু

কাজের কথা বলেই শেষ করে দিতেন। কিন্তু এই চিঠি এমন ছিলো না। এই চিঠিতে আমার অনেক অনুল্লেখিত প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে, যা আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। চিঠিতে লেখা ছিল জীবনের শেষ দুই আড়াই মাসের কারগুজারী, এই সময়ের মধ্যে যে যে কাজ করেছেন,তার বিবরণ। তাছাড়া এই সময়ের মাঝে কিছুদিন একাকী থাকা, ক্ষুধা ও ঠান্ডার কষ্ট এবং এর দ্বারা যে শিক্ষা অর্জন করেছেন তাও উল্লেখ করেছেন। আরো বিভিন্ন আলোচনা যেমন - মুজাহিদের ধৈর্য ও তাকওয়ার নসিহত ইত্যাদীও চিঠিতে উল্লেখ ছিলো। সর্বশেষ কথা ছিলো "আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি কর, তিনিই সর্বোত্তম অভিভাবক"।

তার শাহাদাতের কিছুদিন পর এক বোন সাক্ষাত করতে আসলেন। তিনি আমাকে তার বোনের একটি স্বপ্নের কথা বললেন। সে স্বপ্ন দেখেছে "একটি যুদ্ধের ময়দান। তার মধ্যখানে খুব সুন্দর একটি মহল। মহলের কারুকার্য, জিনিসপত্র এবং খাবারদাবার এত সুন্দর যা কখনো কেহ চোখে দেখেনি, কানেও শুনেনি এবং কেউ এর স্বাদও আস্বাদন করেনি। আমার স্বামী খাবার টেবিলে বসে খাবার খাচ্ছেন এবং জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মুচকি হাসছেন"।

আমি তো এর ব্যাখ্যা বুঝেছি যে, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাঁর ওয়াদা তাঁর এই বান্দার সাথে উত্তম ভাবে পুরা করেছেন। যুদ্ধের ময়দানে মহল মানে হচ্ছে, তার কবর (হাদীস অনুযায়ী) এটি ইনশাআল্লাহ তার জন্য নিরাপত্তার ঘর এবং জান্নাতের বাগান সমুহের একটি বাগান।

আল্লাহর কাছে দুআ করি তিনি যেন তার শাহাদাতকে কবুল করেন।

জান্নাতুল ফেরদাউসে তাকে নবীগণ, সিদ্দিকীন ও শহীদদের সাথে রাখেন। তাঁর শাফাআ'ত থেকে যেন মাহরুম না করেন। আল্লাহ তা'আলার সকল উত্তম ওয়াদা তাঁর ক্ষেত্রে ও তাঁর পিতা-মাতা এবং আমদের সবার ক্ষেত্রে যেন পূরণ করেন। তার থেকে উত্তম ওয়াদা পূরণকারী আর কেউ নেই।

যেই সফর ২০০৬ সালে শুরু হয়েছিলো, তা এখনো শেষ হয়নি। সফর এখনো বাকি আছে, তবে সফরসঙ্গি পরিবর্তন হয়েছে। ইদ্দত পালনের পর আল্লাহ তা'আলা আরেকজন মুজাহিদের সাথে সম্পর্ক জুড়িয়ে দিলেন। আমি আবারও হিজরত করলাম। এবার আমার হিজরত হলো আফগানিস্তানে। বিবাহের মধ্যে উপস্থিত সকল মুজাহিদ ও মুহাজির মহিলাগণই আমার পরিবারের ভূমিকা পালন করেছেন। আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করি, তিনি যেন এই দুর্বল বান্দিকে সকল পরীক্ষা থেকে হেফাযত করেন। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ঈমানকে হেফাযত রাখেন। ঈমানের উপর, সত্যের উপর, জিহাদের উপর অটল রাখেন এবং তার রাস্তায় শহিদ হওয়া থেকে মাহরুম না করেন। আমীন।

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم

وصلي الله تعالي علي خير خلقه محمد وعلي آله وصحبه أجمعين–

****

সত্যের পথে মৃত্যুর

এই অদম্য বাসনা, আমাদেরকে থামতে দেয় না।

উস্তাদ উসামা মাহমূদ হাফিজাহুল্লাহ

সত্যের পথে মৃত্যুর এই অদম্য বাসনা, আমাদেরকে থামতে দেয় না – উস্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহ [উস্তাদ আহমাদ ফারুক রহ. এর শাহাদাত উপলক্ষে বার্তা]

[বিগত ২৫ রবীউল আউয়াল (১৫জানুয়ারী ২০১৫ মোতাবেক) উত্তর ওয়ারিস্তানের লোয়ারাহের ক্যাম্পে আমেরিকান ড্রোন হামলায় আল-কায়েদা ভারত উপমহাদেশের নায়েবে আমীর ও দাওয়াহ বিভাগের প্রধান উস্তাদ আহমদ ফারুক রাহিমাহুল্লাহ শাহাদত বরণ করেন। তিনি এবং আল -কায়েদা অন্যতম নেতা কারী ইমরানসহ অন্যান্য মুজাহিদ রাহিমাহুমুল্লাহের শাহাদত উপলক্ষে আল-কায়েদা ভারত উপমহাদেশের মুখপাত্র উস্তাদ উসামা মাহমূদ হাফিজাহুল্লাহ একটি বার্তা দেন। যার নাম হচ্ছে 'সত্যের পথে মৃত্যুর এই অদম্য বাসনা, আমাদেরকে থামতে দেয় না'। এই বার্তা থেকে উস্তাদ আহমদ ফারুক রাহিমাহুল্লাহর এই জীবনাংশ অনুবাদ করা হলো]

ইসলামাবাদের উস্তাদ আহমদ ফারুক রাহিমাহুল্লাহের প্রকৃত নাম রাজা মুহাম্মাদ সালমান । তিনি ইলমের দ্বীনের পিপাসু ছিলেন, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ইসলামাবাদ থেকে শরয়ী জ্ঞান পরিপূর্ণ করার পর যখন জিহাদের ফরজিয়্যাত তাঁকে জিহাদের ময়দানে নিয়ে আসলো, তখন এখানে কঠিন থেকে কঠিনতর অবস্থা এবং অশেষ জিহাদি ব্যস্ততার মধ্যেও জ্ঞানার্জনের সফর অব্যাহত রাখেন, সাথীদেরকেও এ ব্যাপারে

মনোযোগী করতেন এবং সাথীদেরকে পড়ানোর মধ্যে বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করতেন। উলামাদেরকে খুব ভালবাসতেন এবং তাঁদের অনুসরণকে আবশ্যক মনে করতেন। পাকিস্তানের বিভিন্ন দ্বীনী মাদ্রাসাসমূহের সাথে সুসম্পর্ক রাখার প্রচেষ্টা করতেন এবং ফিকহি মাসয়ালাসমূহে তাদের ফতোয়া তলব করতেন। শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জিহাদের জন্যে উৎসাহিত করা এবং সমাজ সংস্কারের সুত্রধরে তাদেরকে চিঠি লিখতেন এবং নিজের- মত ও নিবেদন তাদের কাছে পৌঁছাতেন। কথা-কাজে শরয়ী হুকুম জানার প্রচেষ্টা এবং শরয়ী মূলনীতি জানার পর সাথে সাথে এটাকে কাজে রূপান্তর করা তাঁর কাজের সুস্পষ্ট সৌন্দর্য ছিল। তাঁকে দেখে, অন্তরে আল্লাহর স্মরণ সতেজ হতো, আল্লাহর শরীয়তের সম্মান ও মর্যাদা অন্তরে বসে যেতো এবং তাঁর সাথে সামান্য সময় অতিবাহিত করলে ইলমে দ্বীনের প্রতি ভালবাসা এবং এরচেয়ে বেশি এর উপর আমল করার জন্যে তীব্র বাসনা সৃষ্টি হতো।

তাঁর ব্যক্তিত্ব বিনয় এবং ইখলাসে পরিপূর্ণ ছিলো, চেহারার মধ্য থেকেও এই উন্নত গুণ পরিলক্ষিত হতো, এটা কোনো সাময়িক, লৌকিক বা কৃত্রিম পোষাক ছিলো না, বরং বেশী নিকটে বসবাসকারীর কাছে বেশি প্রকাশিত হতো যে, তাঁর অন্তর কতো পরিষ্কার। এটা এমন নির্মোহ বৈশিষ্ট্য ছিলো যে, শ্রোতার অন্তরে তাঁর কথা এমন আসন তৈরি করতো যে সে প্রভাবিত না হয়ে পারতো না।

প্রসন্ন স্বভাব ও স্থির মনের অপূর্ব সমন্বয় ছিলো। মুখ ও অন্তরের হেফাজত তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো। মুসলমানদের ব্যাপারে সর্বদা সুধারণা পোষণ করতেন, যদি অন্য কোনো সাথী কারো ব্যাপারে কুধারণা প্রকাশ করতো

তাহলে সাথে সাথে নির্দেশনা দিতেন। হাসি-কৌতুকের মধ্যেও গীবত অথবা অন্য মুসলমানদের ব্যাপারে বিদ্রূপের মতো ত্রুটি প্রকাশ পেতো না। যদি কেউ তাঁকে কষ্ট দিতো অথবা তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলতো, তাহলে সবর করতেন, নিজেও নিশ্চুপ থাকতেন এবং সাথীদেরকেও এইসব ভাইদের ব্যাপারে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় রাখতেন। হাসি-কৌতুকে এই বিষয়ের লক্ষ্য রাখতেন যে অন্তর যেনো আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল না হয়ে যায়, যদি কোনো মাহফিলে হাঁসি-কৌতুক সীমালংঘনের পর্যায়ে যেতো তাহলে সাথে সাথে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ভাইদেরকে আল্লাহর দিকে মনোযোগী করতেন এবং অন্তর মৃত হওয়া বাঁচানোর স্মরণ করে দিতেন। এমন সংস্কারক ও মুরব্বী ছিলেন যে, সাথী যদি কোনো সময় তার সাথে সামান্য সময় ব্যয় করে তাহলে তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেতো। অত্যন্ত ভালোবাসা এবং কল্যাণকামিতার সাথে আত্মশুদ্ধি ও ইসলাহের প্রচেষ্টা করতেন। সাথীদের সাথে সহজেই মিশে যেতেন, প্রত্যেকের সাথে এই পরিমাণ ভালবাসার সম্পর্ক হতো যে, বিদ্যমান সাথীদের প্রত্যেকে এই মনে করতো যে, সেই তাঁর নিকটতম বন্ধু। ইবাদতের মধ্যে আল্লাহর ভয় এবং অন্তরের কোমলতার আমি পরিপূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ করেছি, কুরআন অনুধাবনের স্পৃহা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ আমানত ছিলো, তেলাওয়াত কখনো বন্ধ করতেন না এবং তেলাওয়াতের মধ্যে আল্লাহর আয়াতসমূহে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতেন, আল্লাহর নিদর্শনসমূহ দ্বারা এর মহত্ত্ব অন্তরে বসাতে চেষ্টা করতেন, প্রভূর নির্দেশাবলী পড়ে নিজের আমলের যাচাই করতেন, জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনায় অধিকাংশ সময় চক্ষু ভিজে ফেলতেন। শেষদিন দিনগুলোতে অবরোধের

সময় যে চিঠিটি লিখেছেন, এরমধ্যেও কুরআনের আয়াতের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার আলোকে আমাদের অবস্থার সুত্রে যে শিক্ষা পেয়েছেন তা পাঠিয়ে দিয়েছেন! ফরজ জিহাদ আদায়ের অনুভূতি এবং এটাকে শরীয়ত মোতাবেক দেখার অদম্য বাসনা তাঁর শিরা-উপশিরায় বিদ্যমান ছিলো। জিহাদের ঝান্ডাকে ইলম এবং দূরর্শিতার সাথে সমুন্নত করার ক্ষেত্রে দীন ও জিহাদের দায়ী ছিলেন। কুরআন-সুন্নাহের এই বোঝার ক্ষেত্রে এইসব তাফসীর-ব্যাখ্যাকে সঠিক মনে করতেন যা সাহাবায়ে কেরাম রাজিয়াল্লাহু আনহুম, সালাফে সালেহীন এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী সমস্ত ইমামগণ ও মুহাদ্দিসগণের মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। এরই ধারাবাহিকতায় অঞ্চলের প্রবীণ উলামায়ে কেরামদের থেকে ফায়েদা গ্রহণ করা নিজের জন্যে আবশ্যক মনে করতেন। যেহেতু জিহাদী বিষয়ে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী উলামাগণের সাথে সাথে জিহাদাঙ্গনের শায়খদের নির্দেশনায় চলা আবশ্যক মনে করতেন, জিহাদের ময়দানে শায়খ মুস্তফা আবু ইয়াযিদ, শায়খ আতিয়্যাতুল্লাহ ও শায়খ আবু ইয়াহইয়া রাহিমাহুমুল্লাহের মতো শায়খদের সান্নিধ্য ও নির্দেশনায় এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন। এই মহান নিয়মতের সাথে সাথে শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম, শায়খ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুমাল্লাহু, শায়খ আইমান আজ-জাওয়াহিরি, শায়খ আবু ওয়ালিদ আনসারি, শায়খ আবু কাতাদাহ ফিলিস্তিনি এবং শায়খ আবু মুসআব আস-সুরি হাফিজাহুমুল্লাহর মতো শায়খদের পুস্তকাদি ও রচনা শায়খ উসামা রাহিমাহুল্লাহর প্রজ্ঞাপূর্ণ দাওয়াত এবং গ্লোবাল জিহাদি আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। অর্থাৎ, বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি থেকে মুক্ত এই মানহাজ, যা শরীয়তের প্রত্যেক অবস্থার মধ্যে

অনুসরণ শেখায়, তাওহীদের উম্মাহকে কালেমায়ে তাওহীদের আশপাশে জড়ো হয়ে ফরজে আইন জিহাদের দিকে আহবান করে, মসলকী ও শাখাগত ইখতেলাফকে দূরে টেলে উম্মতে মুসলিমাহর সবদলকে জড়ো করে সবচেয়ে বড় শত্রু আমেরিকা ও ইসরাইল এবং তাদের সেবাদাসদের বিরুদ্ধে দাঁড় করায়, অত্যাচারী কুফরি শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর উপর গুরুত্ব দেয় এবং শরীয়ত বাস্তবায়ন ও নবুওতের আদলে খিলাফত প্রতিষ্ঠার দাওয়াত দেয়। এই মানহাজ আমাদের উস্তাদ আহমদ ফারুক রাহিমাহুল্লাহ জিহাদি শায়খদের কাছ থেকে শিখেছেন, এটাকে শরীয়াহের মনে জেনেছেন এবং উম্মতে মুসলিমার একমাত্র উপায় হিসেবে পেয়েছেন, এবং শায়খ উসামা রাহিমাহুল্লাহ এবং তাঁর দল আল-কায়েদার এই পবিত্র জিহাদি দৃষ্টিভঙ্গির খেদমত, নিজের জাতিকে এরদিকে একত্র করা এবং এর ভিত্তির উপর জিহাদি আন্দোলনকে দাঁড় করানোর প্রচেষ্টাকে নিজের জীবনের লক্ষ্য বানিয়েছেন।

উস্তাদ আহমদ ফারুক রাহিমাহুল্লাহ পিছনের সাত বছর ধরে আল-কায়েদার শায়খদের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের মধ্যে দাওয়াহ বিভাগের দায়িত্বের উপর নিয়োজিত ছিলেন। তিনি এই সময়ে পাকিস্তানের ভেতর শায়খ উসামা রাহিমাহুল্লাহ এবং শায়খ আইমান আজ-জাওয়াহিরি হাফিজাহুল্লাহের জিহাদের দাওয়াতের পূর্ণ মুখপাত্রের ভূমিকায় ছিলেন, এই পথেই সাথীদেরকে দীক্ষা দেন, এই দৃষ্টিভঙ্গির দিকে পাকিস্তানবাসীকে আহবান করেছেন। আল-কায়েদার খোরাসানের দায়িত্বশীল শায়খ মুস্তফা আবু ইয়াজিদ রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে ডাক্তার আরশাদ ওয়াহিদ রাহিমাহুল্লাহের শাহাদতের পর তাঁর স্থলে গ্রুপের নেতৃত্ব দেন। জিহাদের ময়দানে থেকে তিনি

যেখানে জিহাদ ও মুজাহিদদের সম্পর্কিত প্রশাসনিক, সামরিক, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য ব্যস্ততায় নিয়োজিত ছিলেন, সেখানে সাথে সাথে তিনি শিক্ষকতা ও রচনা, আত্মশুদ্ধি ও অন্তরের পরিশোধন, বিবৃতি ও নির্দেশনা, প্রচার-প্রসারে ব্যাপক মনোযোগ ও সময় দিতেন।

পাকিস্তানে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান বাঁধা রাষ্ট্র ও সৈন্যদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও কিতালের বলিষ্ট দায়ী ও উদ্যমী নেতা ছিলেন। শায়খ উসামা রাহিমাহুল্লাহ পাকিস্তানে জিহাদের ঘোষণা করলেন এবং আল-কায়েদা এই জিহাদে পা রাখলো। তখন তাঁর নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় আমেরিকাকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে তাদের সৈন্য এবং গোপন এজেন্সীসমূহে অনেক সফল অপারেশন পরিচালিত হয়।

পাকিস্তানের মধ্যে এবং তার চেয়ে অগ্রসর হয়ে নিখিল ভারতে আল-কায়েদার প্রতিষ্ঠা তাঁর প্রাণিক আকাঙ্ক্ষা ছিলো। এই দলের প্রতিষ্ঠার সময় তিনি নিজের পূর্বের দল বিলুপ্ত করেন এবং অত্যন্ত প্রশান্ত ও প্রসন্ন হৃদয়ে মুহতারাম আমীর মাওলানা আসেম উমর হাফিজাহুল্লাহের হাতে বাইয়াহ দেন। মাওলানা হাফিজাহুল্লাহ তাঁকে নিজের নায়েবে আমীর এবং দাওয়াহ বিভাগের দায়িত্বশীল নির্ধারণ করেন। তিনি নিজের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আদায় করতেন। দায়িত্বশীলতারই এমন অনুভূতি ছিলো যে, তিনি উত্তর ওয়াজিরিস্তানে যুদ্ধের এলাকা এবং অবরোধ থেকে বের হওয়ার মধ্যে নিজের উপর অন্যান্য মুজাহিদদেরকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন সাথীদেরকে বের করতে গেলেন এবং নিজে তাদেরকে বের করার মধ্যে দেরী করতে লাগলেন, এমনকি যখন আমি অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে চিঠি দিলাম এবং

তাড়াতাড়ি বের হতে খুব নিবেদন করলাম, বের হওয়ার বিভিন্ন রাস্তা ও ধারাবাহিকতাও আমি সামনে তুলে ধরলাম, তখন জবাবে আমাকে এই কবিতা লিখে পাঠালেন, যে, (অর্থ)

'যখন আমার জীবনে মৃত্যু একবারই আসবে = তাহলে কেনো এটা শাহাদতের মাধ্যমে হয় না'?

পাকিস্তানকে আমেরিকার দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া, পাকিস্তানের মুসলমানদেরকে জুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্তি দেওয়া, পাকিস্তানের মধ্যে শরীয়তে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাস্তবায়ন উস্তাদ আহমদ ফারুকের স্বপ্ন ছিলো। পাকিস্তানের জিহাদের শক্তিবৃদ্ধি এবং এটাকে শরীয়তের মোতাবেক দেখা, তাঁর এমন আকাঙ্ক্ষা ছিলো যে, এরজন্যে তিনি সর্বদা চিন্তিত ও বিমর্ষ থাকতেন। পাকিস্তানের মধ্যে জিহাদের ঝান্ডা সমুন্নত দেখা, জুলুম ও কুফরের শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই মুবারক জিহাদকে সর্বদা অব্যাহত রাখা, এই জিহাদকে শরীয়তের ভিত্তির উপর সামনে নিয়ে চলা এবং অগ্রসর করার এই পরিমাণ উদগ্র বাসনা ছিলো যে, শাহাদতের দু'দিন পূর্বেও এই ব্যাপারে ওসিয়ত করে চিঠি প্রেরণ করেছেন এবং সাথে অডিওবার্তাও রেকর্ড করে পাঠিয়েছেন। এই চিঠি ও বার্তা এমন সময় তিনি প্রস্তুত করেছেন, যখন তাঁর শাহাদতের প্রায় আশা হয়ে গিয়েছিলো, শত্রুদের প্রচন্ড অবরোধ ছিলো, এবং তাঁকে লক্ষ্য বানানোর জন্যে চল্লিশ দিন ধরে পাঁচ ড্রোনও মাথার উপর ছিলো। কিন্তু এমন কঠিন মুহূর্তেও কুফরি শাসনব্যবস্থার অত্যাচারের বিরুদ্ধে জিহাদের ঝান্ডা সমুন্নত রাখা এবং পাকিস্তানের বরকতময় কাফেলাকে সর্ববস্থায় সামনে অগ্রসর

করার ওসিয়ত দিয়েছেন। এই ওসিয়তে পাকিস্তানের জিহাদে নিয়োজিত সব মুজাহিদদেরকে এই জিহাদকে শরয়ী জিহাদের উপর চলা, শরীয়াহ বহির্ভূত কাজের উপর নীরব না থাকা এবং এই জিহাদকে পাকিস্তানের মুসলমানদের জন্যে প্রশান্তি এবং রহমত বানানোর জন্যে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে জোর দিয়েছেন। জিহাদকে সঠিক রেখার উপর পরিচালনের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাকুলতাকে দেখুন, দীর্ঘ অবরোধের মধ্যেও শেষদিনগুলোতে যখন ডানেবামে শাহাদত এবং গ্রেফতারির সংবাদ আসছিলো, শত্রু মাথার উপর ছিলো, শাহাদত নিশ্চিত ছিলো, এই কঠিন মুহূর্তে 'ফুরসান তাহতা রায়াতিন ন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' [নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পতাকাতলের অশ্বারোহী] গ্রন্থের অনুবাদে ব্যস্ত ছিলেন। মুহতারাম আমীর শায়খ আইমান হাফিজাহুল্লাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ যেখানে তিনি অর্ধ শতাব্দির জিহাদি ইতিহাস, এগুলোর ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাসমূহের গভীরভাবে পর্যালোচনা এবং এগুলোর আলোকে আগামী জিহাদি আন্দোলনের নির্দেশনা, শিক্ষা ও উপদেশ সম্বলিত অনন্য সঙ্কলন। নিজের শেষদিনগুলোতে উস্তাদ আহমদ ফারূক রাহিমাহুল্লাহ বার বার বলতেন, যে, বর্তমান জিহাদ বিশেষভাবে পাকিস্তানের জিহাদের জন্যে এই পাঠ থেকে নির্দেশনা গ্রহণ খুবই আবশ্যক। লিখিত অনুবাদ অনেক সময় খেয়ে ফেলে, তাই তিনি ভয়েস রেকর্ডারের মাধ্যমে অনুবাদ ও পর্যালোচনা রেকর্ড করলেন এবং অধিকাংশের অনুবাদ করে শাহাদতের দু'দিন পূর্বে পাঠিয়ে দিলেন। আল্লাহ তাঁর এই উদগ্র বাসনা এবং জিহাদের রাস্তার ভালবাসাকে কবুল করুন। আমীন।

তিনি প্রত্যেক ধরনের মসলকী ও সাংগঠনিক উগ্রতা থেকে দূরে থাকতেন।

শাখাগত মতানৈক্যের ভিত্তির উপর পৃথক থাকা এবং অন্যকে দূরে ঠেলে দেওয়ার বিপরীতে নিকটবর্তী হওয়া ও নিকটবর্তী করার ক্ষেত্রে, পরষ্পরে মিলেমিশে থাকা এবং কল্যাণের ক্ষেত্রে পারষ্পারিক সাহায্যের পরিবেশ তৈরী করা ছিলো তাঁর উজ্জ্বল গুণ। সাংগঠনিক এবং দলগত সংকীর্ণতা থেকে সরে সব জিহাদী দলসমূহের মুজাহিদ এবং অন্যান্য মুসলমানদের সাথে ভালবাসা রাখতেন, সবার ব্যথায় ব্যথিত এবং আনন্দে আনন্দিত হতেন। তেহরীকে তালেবানের আমীরদের সাথে স্বতন্ত্র সম্পর্কের মধ্যে থাকার চেষ্টা করতেন এবং পাকিস্তানের জিহাদের শক্তিবর্ধন ও সংশোধনের জন্যে কখনোসখনো কাজ ও পরামর্শকে নিজের জন্যে সৌভাগ্য মনে করতেন।

আল্লাহ তাঁর এই পবিত্র আশাকে কবুল করুন এবং পাকিস্তানে লড়াইরত মুজাহিদদেরকে শরীয়তের উপর চলার তাওফীক দিন, তাঁদের অন্তরকে সত্যের উপর অটুট রাখুন। আল্লাহ পাকিস্তানের জিহাদকে খুব উন্নতি দান করুন এবং এই জিহাদকে পাকিস্তানের মুসলমানদের জন্যে রহমত বানান। পাকিস্তান এবং এই নিখিল ভারত উপমহাদেশে দীনের শত্রু এবং আমেরিকার দাসদেরকে নিজের বিশেষ রহমত দ্বারা, এই পবিত্রাত্মার মুজাহিদদের রক্তের বরকতে আমাদের হাতে সুস্পষ্ট পরাজয় দিন এবং এই পূর্ণভূমিতে ইসলামের জয়জয়কার করুন। আমীন।

হিজরতের পথে অবিচল

এক বাংলাদেশী নারীর ঈমানদীপ্ত জীবনকাহিনী

আসমা বিনতে হুসাইন

[এই ঈমানদীপ্ত কাহিনীটি খোরাসান থেকে প্রকাশিত “নাওয়ায়ে আফগান জিহাদ” ম্যাগাজিন – আগস্ট ও সেপ্টেম্বর-২০১৯ ইংরেজি সংখ্যা থেকে থেকে বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে। মুল উর্দু প্রবন্ধটি লিখেছেন একজন পাকিস্তানী মুজাহিদাহ বোন আসমা বিনতে হুসাইন]

খোরাসানের পুণ্যভূমিতে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর পথে অবিচল এক বাংলাদেশী নারীর ঈমানদীপ্ত জীবনকাহিনী

মেয়েটির নাম হামিদা। সে তার পিতা-মাতার ছোট মেয়ে। তার পিতা বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীতে খুব ভালো একটা চাকরি করতেন। তার পিতার সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু ছিল তার দুই মেয়ে। একারণে সুখ-শান্তি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও পিতা-মাতার ভালবাসায় ভরপুর ছিল তাদের পরিবার। হামিদা জীবনে এমন কোন পেরেশানীর সম্মুখীন হয়নি, যা তাকে জীবন সম্পর্কে অপ্রসন্ন করে দিবে। জীবনের প্রাথমিক বছরগুলো এমনি আনন্দের দোলায় কাটছিল যে, সে টেরই পায়নি কিভাবে জীবন থেকে বছরগুলো চলে গিয়েছিল।

তার বয়স যখন ২২ বছর, তখন সে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছে। মাতা-পিতা তার জন্য উপযুক্ত সম্বন্ধ আসার পর বিবাহ দিয়ে দেন। বিবাহের পর

যখন সে শ্বশুরালয়ে পৌঁছালো, তখন সেখানে সুন্দর একটি পরিপাটি বাড়ি তার জন্য অপেক্ষমান ছিল। তার স্বামী ভাইদের মাঝে সবচেয়ে ছোট ছিল। ঘরে ননদ ও ভাবীরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন। সকলেই মন উজাড় করে সুশ্রী হামিদাকে সাদরে বরণ করে নেন। শ্বশুরবাড়িতে তার কাজ বলতে যদি কিছু থেকে থাকে, তাহলে সেটা ছিল শাশুড়ির সাথে বসে বসে সবজি কাটা। বাকী সকল কাজ ননদ ও ভাবীরা নিজেরাই করে নিতো।

হামিদার মায়ের আশা ছিল, মেয়ে যেহেতু পড়ালেখার ব্যস্ততার কারণে গার্হস্থ্য কাজ শিখার সুযোগ পায়নি, তাই এবার হয়তো সেগুলো শ্বশুরালয়ে শাশুড়ি ও ভাবিরা পুরোপুরি শিখিয়ে দিবে। কিন্তু শ্বশুরালয়ের সবাই তাকে এমন ভালোবাসতো যে, গার্হস্থ্য কাজ আর তার শেখা হলো না। তাই সে যতদিন সেখানে ছিল, ততদিন এমন আরাম-আয়েশে জীবন অতিবাহিত করেছিল যে, হামিদা নিজের মায়ের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ির মাঝে কোন পার্থক্য অনুভব করতে পারেনি।

এই সময়ের মাঝেই আল্লাহ তা'আলা তাকে একটি পুত্র সন্তান দান করেন। কিন্তু এখনো সে তাকে ভালো করে দেখতে পারেনি, সে অবস্থাতেই সেই নতুন পুষ্পকলি যেখান থেকে এসেছিল, সেখানে আবার ফিরে গেল। অর্থাৎ মারা গেল। সম্ভবতঃ এটাই প্রকৃত অর্থে এমন দুঃখ-কষ্ট ছিল, যা জীবনে সে প্রথম পেয়েছিল। সে ছেলের মৃত্যুকে ভুলতে পারছিল না। এই শোকাতুর

অবস্থার কিছুদিন যেতে না যেতেই তার স্বামী আবু খলিল তার নিকট এক কঠিন প্রস্তাব রাখলেন।

এমনিতে আবু খলিল স্বামী হিসাবে হামিদার প্রতি খুব গুরুত্বের সাথে খেয়াল রাখতো। আর স্বভাবগতভাবেই সে খুব মিতভাষী ছিল। কিন্তু স্ত্রীর প্রয়োজনাদি ও অনুভূতিগুলোর প্রতি সে খুব খেয়াল রাখত। এমনিভাবে যখন থেকে তার বিবাহ হয়, তখন থেকেই বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি ও উম্মতে মুসলিমার অপদস্ত হালাত নিয়ে হামিদার সাথে মতবিনিময় করত। তারা উভয়েই এই মতাদর্শের উপর ঐক্যমত ছিলেন যে, এই অপদস্থতা ও নীচুতার হালাত থেকে পরিত্রানের কোন রাস্তা যদি থেকে থাকে, তবে সেটা হলো: 'জিহাদ ফি -সাবিলিল্লাহ্'। তাছাড়া আবু খলিল নিজের উপার্জন থেকে অধিকাংশ সময়ই কিছু না কিছু মাল জিহাদ ও মুজাহিদদের জন্য ব্যয় করতেন। কিন্তু অন্যদিকে এটাই সর্বপ্রথম পর্যায় ছিল যে, আবু খলিল হামিদাকে দ্বিমুখী রাস্তার উপর এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। কারণ আবু খলিল বাংলাদেশ থেকে জিহাদী ভূমির দিকে হিজরত করতে চাইছিলেন। তখন হামিদার সামনে দু'টি পথের যে কোন একটিকে গ্রহন করে নেওয়ার প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল-

এক. সে নিজের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, স্বদেশ সব কিছু ত্যাগ করে, তার স্বামীর সাথে হিজরত করে চলে যাবে এবং দুর্দশার জীবন গ্রহন করে

নিবে। এ কথা জানার পরেও যে, জীবনে দ্বিতীয়বার তাদের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

দুই. অথবা নিজের জীবন ব্যবস্থাকে অক্ষত রাখার উদ্দেশে নিজ স্বামীকে এমন চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে।

সে আরো জানতো যে, জিহাদ ও হিজরতের জীবন গ্রহন করার মানে হলো: নিজেকে নিজে সবর ও ধৈর্যের এমন স্তরে নিয়ে যাওয়া; যেখানে আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ সাহায্যকারী হিসাবে থাকবে না। সেখানে পদে পদে অনেক মুসিবত, বিভিন্ন পেরেশানী এবং বিপদ সংকুল অবস্থা তাদের জন্য অপেক্ষা করবে। আর এ পথের শেষ হিসেবে যদি কোন কিছু দেখা যায়, তবে সেটা হলো: একাকিত্ব, শাহাদাতবরণ, আহত হওয়া এবং অন্ধকার প্রকোষ্টে জীবন যাপনের কষ্ট সহ্য করা। কিন্তু কেন জানি! যখন আবু খলিল এ ব্যাপারে তার মতামত জানতে চাইলেন, তখন একবারের জন্যও তার হৃদয়ে একথার উদয় হয়নি যে, সে তার স্বামীকে এমন বিপদ সংকুল জীবন থেকে বাঁধা দিয়ে ফিরিয়ে রাখবে। মন-মস্তিস্কে যদি কোন কথার উদয় হয়েই থাকে, তবে সেটা হলো: আমরা তো এই পথের পথিক হয়েই গেছি। এখন আর পিছনে ফিরে আসার কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু সে বার বার এই চিন্তা করতো যে, আমাদের সামনে বাড়ার হিম্মত আছে তো?

অবশেষে এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব অবস্থায় আল্লাহর মুহাব্বত, তাঁর জান্নাত পাওয়ার

আকাঙ্খা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের স্পৃহা দুনিয়ার সবকিছুকে পিছনে ফেলে বিজয়ী হয়। তাই সে তার স্বামীর সাথে হিজরত করে পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তান নামক এলাকায় চলে আসে। বিলাসবহুল জীবন, সুখ-স্বাচ্ছন্দে ভরপুর পরিবেশে বেড়ে উঠা তানিয়া প্রাসাদ ছেড়ে দিয়ে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়। নিজের বাড়িতে তো সে কখনো ঠান্ডা-গরমের কোন পার্থক্য অনুভব করেনি। কিন্তু ওয়াজিরিস্তানে লাকড়ি জ্বালাতে যেয়ে তার ধোঁয়ায় কাশতে কাশতে দুনিয়ার বাস্তবতা বুঝতে পারে। সেখানে হামিদা হাজারো চেষ্টা করা সত্ত্বেও নিজের শরীরকে গরম রাখতে পারতো না। এই সমস্ত বিপদাপদের পরীক্ষায় সবর করার বিনিময়ে মহান রাব্বুল আলামীন যে সমস্ত পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন, তা মনে করে হামিদা সবর করার আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। অতঃপর দেখতে দেখতেই কয়েক বছর পার হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতের ফায়সালা অনুযায়ী তাদেরকে ছেলে দিয়ে আবার নিয়ে গিয়েছিলেন। তারা এই পরীক্ষায় সবর করার কারণে এখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ঘরকে রহমত ও বরকতসমূহ দ্বারা ভরপুর করে দেন। ডাগর ডাগর চোখ ও হাসিমুখের হাবিবা, লজ্জাবতী খাদিজা এবং সকলের আদরের দুলালী হাফসা তাদের ঘরকে সারাক্ষণ মাতিয়ে রাখে।

হামিদা নিজেকে ও তার সন্তানদেরকে এমনভাবে ওয়াজিরিস্তানের গ্রামীণ জীবনের সাথে মানিয়ে নেয় যে, তাদেরকে দেখে কোন দর্শনকারীর চিন্তা-

ভাবনা ও ধারণাতেও একথা কখনো আসবে না, এই অভিজাত রমনী বাংলাদেশের এমন একটি ধনী পরিবারের সাথে সম্পর্কিত, যে পরিবারে পানি পান করানোর জন্যও খেদমতের চাকর প্রস্তুত থাকে। ফ্রিজ এবং মাইক্রোওয়েভ সুবিধার সাথে অভ্যস্ত হামিদা এখন তিন বেলা নিজ হাতে টাটকা খাবার রান্না করে/ বিভিন্ন আইটেমের খাবার খাওয়ার অভ্যাস ছিল যার, সে এখন সাধারণ মানুষের মত এক বিশেষ ধরনের খাবার খেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে/ অর্থাৎ ফ্রাই, ছোলা, মটরশুটি এবং মসুর ডাল। সে এমন স্থানে বসবাস করত, যেখানে রাত (অন্ধকার) ই হত না, আর সে এখন বিদ্যুৎ না থাকার দরুন পুরো সন্ধ্যা জুড়ে টর্চ-লাইটের আলোতে নিজের সর্বশেষ কাজ গুছিয়ে তারপর ঘুমাতে যায়! খোলা বারান্দায় ও প্রশস্ত ঘরে বসবাসে অভ্যস্ত হামিদার আজ পুরো সংসার একটি ছোট্র কামরাকে ঘিরে। আবার সেই ছোট্র কামরাতেই রান্নাঘর, বেডরুম এবং বৈঠকখানা/

একে তো গ্রামীন জীবন, তার উপর আবার জিহাদী জীবন। যে জীবনে নিজ সকাল-সন্ধ্যার উপর মানুষের স্বাধীনতা খুব কমই থাকে। আকাশে উড়ন্ত ড্রোন বিমান বিদ্যমান থাকার কারণে সে ও তার সন্তানরা সকলেই একটি আবদ্ধ কামরায় অবস্থান করতে হত। কারণ, গোয়েন্দাদের নজরে পড়ার সম্ভাবনা থাকায় তাদের বাহিরে বের হওয়ার অনুমতি ছিল না। এমনিভাবে কোন অভিযান অথবা আক্রমণের আশংকা হলে ততক্ষনাৎ সেখান থেকে

নিজের ঘর-বাড়ি ছেড়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছানোর জন্য মাল-সামানা প্রস্তুত করে রাখা লাগতো। কয়েকবার এমনও হয়েছে যে, হামিদা তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্থানীয় আনসারদের সাথেই ঘর ছেড়ে পালাতে হয়েছে।

হিজরতের পর তখনো বেশী দিন অতিক্রম হয়নি। এমতাবস্থায় সে হাবিবা জন্মের পরে খুব কঠিন একটা সময় পার করে। সে সময় হামিদা যে এলাকায় অবস্থান করছিলো সেখানে সেনাবাহিনীর অভিযানের দরুন তাকে নিজ ঘর ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যেতে হয়। আবু খলিল তখন বাড়িতে ছিল না। একারণে স্থানীয় আনসারের সাথেই সফর করতে হয়েছিল। তখনও পর্যন্ত সে স্থানীয় ভাষা বলতে পারতো না। ছোট হাবিবাকে কোলে তুলে নিয়ে, আল্লাহর উপর ভরসা করে সে বের হয়ে গিয়েছিল। আনসারের পুরো পরিবার এলাকা ত্যাগ করছিল। সামান্য কিছু আসবাবপত্র গাধার পিঠে বোঝাই করা ছিল। আর পায়ে হেটে সফর করতে হচ্ছিল। তাদের ইচ্ছা এই ছিল যে, পাহাড়ের অপর প্রান্তে বিদ্যমান বস্তিতে পৌঁছে যাওয়া। যেখানে আনসারের কতিপয় আত্মীয়-স্বজন বসবাস করতো। এই পথ পাড়ি দিতে ৬/৭ ঘন্টা সময় পায়ে হেটে যেতে হয়। সফরের সময় পরিশ্রমী পশতুন আদিবাসী, যাদের সারা জীবন পাহাড়ের উপর উঠা-নামাতে কেটেছে, তারা খুব দ্রুতই সামনে এগিয়ে গেলো। এদিকে অনভিজ্ঞ হামিদা, এক মাসের বাচ্চা মেয়েকে কোলে নিয়ে, পাহাড়ী উঁচু-নিচু পথ পাড়ি দিয়ে, খুব কষ্টে

নিজেকে ও নিজ সন্তানকে সামলাতে গিয়ে অনেক পিছনে পড়ে যায়। এমন সময় আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়। বিপদ সংকুল অজানা পথ, ছোট্র শিশু, পাশে কোন সাহায্যকারী বিহীন অবস্থায় চলতে হচ্ছিল। আনসারের পরিবারের সদস্যরা এতটাই এগিয়ে গিয়েছিল যে, তারা দৃষ্টি সীমার বাহিরে চলে গিয়েছিল। আর হামিদা আনসারের অনুসরণে চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তথাপি সামনে কাউকে দেখতে না পেয়ে, হামিদা একটি গাছের নিচে বসে পড়ল। সেই উদ্বিগ্ন ও একাকিত্বের হালাতে সাহায্যের জন্য কাকে ডাকা যায়? তাকেই তো ডাকা যায়, যিনি সকল সমস্যায় সর্বদা সঙ্গ দিয়েছেন। যিনি কণ্ঠনালির চাইতেও কাছে অবস্থান করেন। সুতরাং সে গাছে হেলান দিয়ে, দুধের ছোট্র শিশু হাবিবাকে কোলে জড়িয়ে ধরে আপন প্রভু আল্লাহ জাল্লা শানুহুকে ডাকতে লাগল। আর পরম দয়াশীল ও মেহেরবান প্রভু সাথে সাথেই তার আহবানে সাড়া দিলেন এবং তাকে সাহায্য করলেন। এর অল্প কিছুক্ষণ পরই তার আনসার তাদেরকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে এসে পৌঁছালেন। আনসার তাদেরকে গাছের নিচে সহীহ সালামতে দেখতে পেয়ে আত্মায় যেন প্রাণ ফিরে পেলেন। কারণ তার আশংকা হয়েছিল যে, এমন প্রচন্ড বোম্বিংএর সময় সে পিছনে রয়ে গেল, না জানি কোন গুলি বা বোমার লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে কিনা!

২০১৪ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ওয়াজিরিস্তানে অভিযান চালানোর ঘোষণা

দেয়। তখন মুহাজির মুজাহিদীনদের পরিবারগুলোকে তাদের দেশে ফিরে যাওয়ার বা অন্য কোন সুরক্ষিত স্থানে পাঠিয়ে দেওয়ার ফয়সালা হয়। যারা দেশে ফিরে যেতে পারবে, তারা ফিরে গেলো। আর যারা গোয়েন্দা সংস্থার লোকদের নজরদারীতে ছিল এবং যাদের ঘর তখন আর নিরাপদ থাকেনি, তাদের জন্য এমন কিছু আনসারের ব্যবস্থা করা হল, যারা তাদেরকে তাদের বাড়িতে আশ্রয় দিবে। হামিদার দেশের বাড়ি অনেক দূরে ছিল এবং ঐ স্থান পর্যন্ত পৌঁছানোর কোন ব্যবস্থাও তখন বিদ্যমান ছিল না। তাই তাকে পাকিস্তানেরই একটি শহরের এক আনসার তার বাড়ির উপর তলায় থাকার জন্য জায়গা দেয়। এই আনসার তার প্রতি অনেক খেয়াল রাখত, তার সকল প্রয়োজন মেটাতো এবং তার হেফাজতের জন্য সদা সচেষ্ট থাকত। কিন্তু পাকিস্তানে এভাবে লুকিয়ে বসবাস করা তার জন্য খুবই কষ্টকর ছিল। কারণ, তার ও তার তিন সন্তানদের চেহারা-সূরত ও কথা-বার্তার ধরণ দ্বারা খুব দ্রুতই তাদেরকে চেনা যেত যে, তারা এখানকার অধিবাসী নয়। তাই বাধ্য হয়েই তাকে নিজ আনসারের ঘরে সম্পূর্ণরূপে বন্দী জীবন কাটাতে হচ্ছিল। কারো সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করার কোন সুযোগ ছিল না। আশেপাশের লোকেরা এটা জানতো যে, ঐ বাড়ির উপরের তালাটি খালি পড়ে আছে এবং সেখানে কেউ থাকে না। সুতরাং এই ধারণাকে ধরে রাখতে গিয়ে তাকে ও বাচ্চাদেরকে জানালার পাশে যেতে পর্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হত।

এমনিভাবে বাড়িতে যদি বাহির থেকে কোন মেহমান বা অন্য কেউ আসতো, তখন তাদেরকে ফিসফিসিয়ে কথা বলতে হত। এই ভয়ে যে, কোনভাবেই যেন তার বা বাচ্চাদের আওয়াজ নিচতলায় বিদ্যমান মেহমানদের পর্যন্ত পৌঁছে না যায়।

ছোট ছোট বাচ্চারা, যাদের বর্তমান বয়সই ছিল খেলা-ধুলা আর হৈ-চৈ করার, তাদেরকেই যখন হামিদা জোড়ে কথা বলতে নিষেধ করতো অথবা ঘরে দৌঁড়াদৌঁড়ি করতে ও জানালার পাশে যেতে বারণ করত, তখন বাচ্চারা স্বাভাবিকভাবেই রেগে যেত। কিন্তু সে তাদেরকে কিভাবে বুঝাবে যে, আমাদেরকে এখানে এমনভাবে থাকতে হবে, যেন এখানে কেউ থাকেই না। সব সময় এমন শাসনে বাচ্চারা বিরক্ত হয়ে উঠছিল। অতঃপর যখন তিন বাচ্চাকে সামলানো হামিদার জন্য অসম্ভব হয়ে দেখা দিতে লাগলো, তখন আল্লাহ তা'আলা তার জন্য ভিন্ন পথ দেখিয়ে দিলেন। সেটা হলো: হামিদা বাচ্চাদের হাতে রঙ ধরিয়ে দিয়ে বলল যে, তোমরা খেলাধুলা করার পরিবর্তে, বসে বসে ছবি আঁক এবং তাতে রঙ কর।

ওয়াজিরিস্তানের ভূমি মুজাহিদদের হাতছাড়া হয়ে গেলে, তার পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা আফগানিস্তানের ভূমি তাদের জন্য প্রশস্ত করে দিলেন। ফলে মুজাহিদীনরা আফগানিস্তানে হিজরত করলেন। আবার ঘর-বাড়ি আবাদ করলেন এবং আল্লাহর রাস্তায় জীবনের শেষ নিঃশ্বাস বাকী থাকা পর্যন্ত

লড়াই চালিয়ে যেতে ওয়াদাবদ্ধ হলেন। তারপর নিজেদের এই ওয়াদা পুনরায় পূরণ করার ক্ষেত্রে বিজয়ী হলেন। এদিকে স্বামীর পক্ষ থেকে হামিদার নিকট খুব দ্রুতই সংবাদ আসলো যে, সে আফগানিস্তানে এসে তার সাথে সাক্ষাৎ করবে। আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনকারী, প্রাচ্যের এই মহিয়সী মেয়ে হামিদা, তার স্বামীর এ সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই সব দুঃখ-কষ্ট ও বিরহ-যাতনা এবং বিপদাপদের কথা ভুলে গিয়ে পুনরায় জিহাদের ময়দানে যেতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। সেই জন্য তিন বাচ্চাকে সাথে নিয়ে হামিদা আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে সফর করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন।

গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই পথিমধ্যে জানতে পারলেন যে, তার জীবন সাথী, সফরসঙ্গী, যার সাথে জিহাদ ফি-সাবীলিল্লাহর মত কণ্টকাকীর্ণ পথ গ্রহন করেছিলেন, সেই তাকে মাঝ পথে রেখে, আপন গন্তব্যের পথ, আপন জান্নাতে চলে গেছেন। নিজের সফর পুরা করে আপন রবের কাছে মেহমান হয়ে গেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।)

যখন আবু খলিল রহ. এর শাহাদাতবরণের সংবাদ তার নিকট আসে, তখন সে পথিমধ্যে এক আনসারের বাড়িতে অবস্থান করছিল। আনসার পুরুষদের মাধ্যমে যখন আনসার নারীরা এ সংবাদ পান, তখন দুঃখ ও পেরেশানীর দরুন তাদের চোখ বারবার অশ্রুসজল হয়ে উঠছিল। এ কথা ভেবে তাদের সবচেয়ে বেশি পেরেশানী হচ্ছিল যে, তারা হামিদাকে এ সংবাদ কিভাবে

দিবে? যে নাকি এতদিন পর আপন স্বামীর সাথে সাক্ষাত করতে ইচ্ছা করছে এবং তিন বাচ্চাকে সঙ্গী করে আরেকবার হিজরতের সফর শেষ করছে। বাড়ির মহিলারা বার বার গোপনে পরস্পরে পরামর্শ করত, আর চোখের নির্গত অশ্রু মুছত। যখন হামিদা সেখানে চলে আসতো, তখন তাকে দেখা মাত্রই তারা চুপ হয়ে যেত। হামিদাও মহিলাদের এমন অস্বাভাবিক আচরণ অনুভব করতে পারত। পাশাপাশি এটাও সে অনুমান করতে পারত যে, তারা তার ব্যাপারেই কোন কিছু গোপন করছে। কারণ, মহিলারা তাকে দেখা মাত্রই কথা-বার্তার বিষয়বস্তু পাল্টে দিত অথবা চুপ হয়ে যেত। অন্যদিকে মহিলাদের এমন অসম্পূর্ণ আচরণের কারণে হামিদাকে খুব পেরেশানীতে ফেলে দেয় এবং ক্রমান্বয়ে তা রাগে-ক্ষোভে রূপান্তরিত হতে থাকে। অবশেষে যখন তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়, তখন সে মহিলাদেরকে স্পষ্টভাবেই তাদের অস্বাভাবিক আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করে বসে। প্রতিউত্তরে তারা তাকে আবু খলিল রহ.এর শাহাদাতবরণের সংবাদ শোনায়। এ খবর শুনার পর সে একেবারেই চুপ হয়ে মাথা নিচু করে ফেলল এবং কামরা থেকে বের হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ যদিও তার চোখে অশ্রু আসেনি, কিন্তু যখন আসে তখন বর্ষার ন্যায় অনবরত অশ্রু ঝরতে থাকে। আবু খলিল ছিল তার জীবন সঙ্গী, যার সাথে জীবনের এক কঠিন সফরে বের হয়ে এসেছিল। যার জন্য সে তার সকল আত্মীয় স্বজন, সব ধরনের মায়া-

মহব্বতকে পিছনে ফেলে এসেছিল, সেই আজ তাকে মাঝপথে রেখে বিচ্ছেদের দাগ দিয়ে চলে গেলো! রত্নতুল্য ছোট তিনটি মেয়ে ছিল তার সাথে। আর তার আত্মীয়-স্বজনেরা, প্রিয় মানুষেরা এবং নিকটতম বন্ধু-বান্ধবরা এখান থেকে হাজারো মাইল দূরে অবস্থান করছে। যেখান থেকে তারা তাকে শান্তনা ও সমবেদনা জানিয়ে কয়েকটি শব্দও লিখে পাঠাতে পারবে না। তাহলে এখন সে কি করবে? কোথায় যাবে? সে এখন নিজেকে নিজে অনেক নিঃসঙ্গ, দুর্বল ও অসহায় ভাবতে থাকে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হলো যে, কোন দয়াময় হাত যেন তার হৃদয় থামিয়ে দিয়েছে এবং তার চোখের অশ্রু মুছে দিয়েছে। (তখন সে ভাবতে লাগলো যে,) এই হিজরত ও জিহাদের পথ তো সে আবু খলিলের জন্য গ্রহন করেনি। বরং তা তো আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্যই ছিল। নিজের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনকে তো সে আবু খলিলের জন্য ছেড়ে আসেনি। বরং তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই ছিল। সুতরাং মহান আল্লাহ, যিনি সকলের চাইতে সবচেয়ে বেশী গুণগ্রাহী। সেই মেহেরবান আল্লাহ তা'আলা কি এমন কঠিন মুহুর্তে তাকে একাকি হালতে ছেড়ে দিবেন? (নাহ, তা হতে পারে না।) ফলে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে সান্ত্বনার বারি বর্ষণ করলেন এবং সামনে বাড়ার হিম্মত দান করলেন।

(হামিদা আরো ভাবলো যে,) আবু খলিল শহীদ হয়েছে তো কি হয়েছে?

আল্লাহ তা'আলা তো অবশ্যই সাথে আছেন। আর যদি আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে তার আর কোন চিন্তা থাকতে পারে না। তাই সে পুনরায় জিহাদের পথের পথিক হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। (সে আরো ভাবলো যে,) জিহাদের মত এমন মহান রাস্তায় একবার পা ফেলানোর পর, এখন কি করে আবার পিছনে ফিরে যাওয়া যায়। (নাহ, তা সম্ভব নয়।) অতএব, সে বাচ্চাদেরকে সঙ্গে নিয়েই সামনে অগ্রসর হতে থাকে।

নিশ্চয় আল্লাহ মানুষকে কখনো হাসান আবার কখনো কাঁদান। তাইতো স্বামী আবু খলিলের শাহাদাতের পর আল্লাহ তা'আলা হামিদাকে হানজালার আশ্রয় দান করেন। ধীরে ধীরে হামিদার চিন্তা-পেরেশানী দূর হয়ে যায়। তার শুষ্ক ঠোঁটে আল্লাহ তা'আলা আবার হাসি ফিরিয়ে দেন। ব্যথিত হৃদয়ে প্রশান্তির দৌলত দান করেন। নিঃসন্দেহে তিনিই দুঃখ প্রদান করেন এবং তিনিই আবার আনন্দ দান করেন। তিন কন্যা সন্তানের পর এবার আল্লাহ তা'আলা হামিদাকে এক পুত্র সন্তান দান করলেন। এতে সে আবারো নিজের ঘর ও বাচ্চাদেরকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু তার পরীক্ষা এখানো শেষ হয়নি। তার দ্বিতীয় বিবাহ হয়েছে মাত্র আড়াই বছর হল, এ সামান্য সময় পার হতে না হতেই এক রাতে শত্রুরা তার বাড়িতে হামলা চালায়। প্রিয়তম স্বামী তার চোখের সামনেই তাদের সাথে আমরণ লড়াই করতে করতে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।)

ফলশ্রুতিতে হামিদা আবারো জিহাদের পথে একা হয়ে গেলেন। পুনরায় জীবনের দ্বীমুখী রাস্তায় উপনীত হলেন।

এক. এখন কি সে বাচ্চাদেরকে সাথে নিয়ে নিজ দেশে চলে যাবে? যেখানে তার পিতা-মাতা ও ভাই-বোনেরা রয়েছে, যারা তাকে একটি পূর্ণাঙ্গ নিরাপদ ও সুরক্ষিত এবং প্রশান্তময় জীবন উপহার দিতে পারবে। ঐ সমস্ত প্রিয়জনদের মাঝে ফিরে যাবে, যাদেরকে ছেড়ে চলে এসেছে প্রায় নয় বছর হয়ে গেল।

দুই. নাকি ঐ পথেই অটল-অবিচল থাকবে, যে পথে তার প্রাক্তন দুই স্বামী জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে।

কিন্তু এবার সে একা সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। তার নয় বছরের মেয়ে নিজের চোখের অশ্রু ও তার মায়ের চোখের অশ্রু মুছে দেয় এবং বলে যে, *"আম্মু! আল্লাহ তা'আলা চাইলে আবারো আব্বুর ব্যবস্থা করে দিবেন, কিন্তু আমরা এখান থেকে কোথাও যাব না। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরাও শহীদ হয়ে যাব এবং আব্বু (আবু খলিল) ও হানজালা আব্বুর নিকট পৌঁছে যাব।" (ইনশা আল্লাহ)*

অনুবাদ: Know Your Deen

একটি প্রেমের গল্প...

জালাল ইবনে সাইদ

একটি প্রেমের গল্প...

এটা হল সুহাইলা এবং ফারুক নামক এক দম্পতির গল্প।

তাদের বিয়ে হয়েছিল রোমান্টিকভাবে, আর তারা একে অপরকে খুব ভালবাসত, এই সময় টা ছিল...সম্ভবত উমার ইবনে আব্দুল আযীয এর খিলাফতকাল। তিনি ছিলেন ইসলামের পঞ্চম খলিফা। যখন কোন মুসলিমই দরিদ্র ছিল না। সবাই সম্পদশালী ছিলো। দুঃখিত, শুধু মুসলিমরাই নয়, কেউই দরিদ্র ছিল না। তখন কোনো দরিদ্র লোকই ছিলো না। কারণ, ইসলামী অর্থনীতি, অর্থায়ন এবং ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবেই কাজে লেগেছিল না। (ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণা পোষণকারী অমুসলিমদের কটাক্ষ্য করে)

যাইহোক, এই রকম একটা রোমান্সের কথা চিন্তা করুন,

সুহাইলা এবং ফারুকের বিয়ে হল, তারা একসাথে ৩ মাস অতিবাহিত করল, এরপর জিহাদের ডাক এল এবং ফারুক চলে গেল। সে সমান্য কিছু অর্থ রেখে গেল, ৩০০০ দিরহাম এর মত, আর তাকে বলল, এটা দিয়ে ৩ মাস চালিয়ে নাও, আমি ৩ মাস পরেই ফিরে আসব। তার একটি সিন্দুক ছিল, যার মধ্যে ৩০০০০ ত্রিশ হাজার দিনার ছিল, যা প্রায় ২২ কোটি টাকার সমতুল্য, সিন্দুক টি ঘরেই ছিল, আর সে বলেছিলো এইটাতে হাত দিও না। এটা হল আমানত, আর আমি ৩ মাসের মধ্যেই ফিরে আসব, কারণ সে সময় তারা এমনটাই করত, সৈন্যরা যুদ্ধে যেত,আবার ফিরে ও আসত,

৩ মাস কেটে গেল, ৬ মাস কেটে গেল ৯ মাস কেটে গেল, সেই সময় সুহাইলা গর্ভবতী ছিল, বছর কেটে গেল, সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল, ফারুকের দেখা নাই, দেড় বছর কেটে গেল, ২ বছর কেটে গেল, কিছু লোক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসল, তাদের একজন বলল আমি দেখেছি ফারুক নিহত হয়েছে। এখন সে জানল যে, ফারুক মারা গেছে, আর তাই সে এখন সেই সিন্দুকটি খুলল, যার মধ্যে ছিল প্রায় ২২ কোটি টাকা, সেইসময় পর্যন্ত সে ফারুকের আনুগত্য করেছে এবং সিন্দুকটি স্পর্শ করেনি। সুবহানআল্লাহ! মাত্র ৩০০০ তিন হাজার দিরহাম দিয়ে সে এই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত চালিয়ে নিয়েছে। ৩০ বছর কেটে গেল, সে সন্তানটির লালন পালন করছে। তার একটি পুত্র আছে, সে উত্তমরূপে তার দেখাশোনা করছে। সে তার পড়াশোনার খরচ বহন করছে। ৩০ বছর এভাবেই চলে গেল, এটা ছিলো মদিনার ঘটনা। ৩০ বছর ধরে ফারুক সম্পর্কে ভাবতেছিল যে সে কত মহান ব্যক্তি মহান বীর আমার স্বামী, সে জিহাদ করেছিল এবং নিহত হয়েছিল, সে ছিল চমৎকার একজন মানুষ, সুহাইলা তাকে খুব ভালবাসতো। ফারুক যখন জিহাদে যাচ্ছিল, সে দ্বিতীয়বার ভাবল, ফিছনে ফেরে তাকাল, সুহাইলা তাকে ঠেলে দরজার বাইরে বের করে দিল, আর বলল, “তুমি কি আল্লাহকে ভয় করনা?” জান্নাত তালাশ কর,আর আমি তোমার সাথে ওখানে সাক্ষাত করব। সে ছিল একজন পূন্যবতী নারী, সে তাকে ঠেলে বের করে দিল, আর বলল যাও। আর সে জিহাদে চলে গেল।

যাইহোক, ৩০ বছর কেটে গেল, এই টা ছিল মদীনায়, চলুন এবার মদীনা

ত্যাগ করি, গুগল, গুগল অর্থে আপনি একদম চীন পর্যন্ত চলে যান, ঠিক আছে? আমরা এখন মুসলিম ভূমিসমূহের সীমান্তবর্তী অঞ্চল গুলোতে অবস্থান করছি, আমরা এই মুহুর্তে চীন সীমান্ত এলাকায় আছি, দুনিয়ার বুকে সে সময় রাত, সৈন্য শিবিরে আগুন জ্বলানো হয়েছে। সৈন্যরা মুসলিম ভূমিসমূহের সিমান্ত প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত, আর তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি একটি সেতুর উপর বসে আছে। সে যা করছিল তাকে বলা হয় রিবাত, ঘুমন্ত সৈন্যদেরকে পাহারা দেয়। আর সে চারদিকে দেখছিল, আকাশ দেখছিল, তারা দেখছিল, সে কিছু রোমান্টিকরা অনুভব করল, আর সে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা অনুভব করছিলো, সে ভাবছিল আর ভাবছিল, হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, তার একজন স্ত্রী আছে, যার সাথে তার বিয়ে হয়েছিল, তার জানতে ইচ্ছে করছিল সে কেমন আছে? কি ঘটেছে? সে কি বিয়ে করেছে? বা সে কি মারা গেছে? সে অন্য কোথাও চলে গেছে? সে কি সেখানে আছে? চিন্তায় সে পাগল হয়ে যাচ্ছিল, সে পাগলের মত ভাবতে লাগল, ৩০ বছর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে কেটে গেছে, সে জিহাদের জন্য দুর্বারভাবে অগ্রসর হতে থেকেছে, আর কোন যুদ্ধে সে নিহত হয়নি। যে মনে করে যে, যুদ্ধ তার জীবন কেড়ে নেবে তার জন্য এটা একটা উদাহরণ, ৩০ বছর কেটে গেছে জিহাদে এই ব্যক্তি এখনো জীবিত আছে, এ আর কেউ নয়, এ হচ্ছে ফারুক, চীনের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সে অবস্থান করছিল, যখন সে জিহাদে গিয়েছিল তখন উম্মাহর প্রতিরক্ষা আর আল্লাহর জন্য কাজ করার মিষ্টতা তাকে থামাতে পারে নি। সে আর ফিরে যেতে পারে নি। সে তখন চীনের সীমান্তবর্তী

অঞ্চলে অবস্থান করছিল, কিন্তু তার চিন্তাগএলো তাকে প্রভাবিত করছিল, এখন সে একজন বয়স্ক, জ্ঞানি ব্যাক্তি, এখন আর সে শুধু একজন কম বয়সী আবেগী মানুষ নয়, সে বার বার তার স্ত্রীর কথা ভাবছিল, যেই ভাবা সেই কাজ, সে সকালে তার কমান্ডারের অনুমতি নিল, চীন থেকে সে ঘোড়ায় লাফিয়ে চড়ল সে বাতাসের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল মদীনার পানে, সে যতই মদীনার নিকটবর্তী হতে লাগল ততই তার হৃদস্পন্দন বাড়তে লাগল, সে উত্তেজিত হচ্ছিল, সে পারস্যের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, সে যত কাছাকাছি আসতে লাগল, তার উত্তেজনা ততই বাড়তে লাগল, কি হবে যদি সুহাইলা বেঁচে না থাকে? কি হবে যদি সে আবার বিয়ে করে থাকে? এই সব চিন্তা তাকে পাগল বানিয়ে দিচ্ছিল, ইতিমধ্যে সে মদীনায় পৌঁছে গেল, স্ত্রীর কাছে ছুটে যাওয়ার মুহুর্তে ভালবাসায় পাগল হওয়ার পূর্বে, রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ তার মনে পড়ে গেল, সে একজন নেককার ব্যাক্তি ছিলো, সে সরাসরি বাড়ীতে চলে যায়নি, সে দুই রকাত সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে চলে গেল, কারণ এটাই আপনার করা উচিৎ। যখন আপনি কোন সফর থেকে ফিরে আসেন। সে মসজিদে নববীতে গেল, দুই রাকাত সালাত আদায় করল, আর দেখল তখন আসর এর সময় হয়ে গেছে,

সে ভাবল, বাড়িতে গিয়ে কি হবে, আমি বরং অপেক্ষা করব, আসরের সালাত আদায় করে তারপর বাড়িতে যাবো। যখন সে অপেক্ষা করছিল, সে মদিনার আলেমদেরকে, লক্ষ্য করছিল, মনে রাখবেন এটা উমর বিন আব্দুল আযীয এর সময়, সুবহানাল্লাহ কি চমৎকার ছিল তখনকার

আলেমগণ, তখনকার জ্ঞানচর্চা কতটা উৎকৃষ্টতা অর্জন করেছিলঃ আল্লাহু আকবর! তারা কুরানের তাফসীর করছিল,কাহিনী বর্ণনা করছিল,আর তারা ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ হয়ে বসতো, আর লোকেরা তাদের চারপাশে ভিড় জমাত, আলেমগণকে মা শা আল্লাহ অনেক সুন্দর দেখাত, তাদের সবার মধ্যে একজন ছিল যাকে খুবই উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল, শাইখ আব্দুর রহমান, তিনি ছিলেন সর্বোত্তম জ্ঞানী ব্যাক্তিদের একজন, শাইখ আব্দুর রহমান বক্তাদের মধ্যে সবচাইতে উত্তম, ফারুক তাকে দেখে চমৎকৃত হল, আযান হল, আসর এর সালাত শেষ হল, এখন আমি সোজা আমার বাড়িতে যাব, ভাবল ফারুক। সে বাড়ির দিকে ছুটতে লাগলো, যেই সে তার বাড়িতে পৌছল, যখন সে তার বাড়িতে পৌছল, সে লক্ষ্য করল অন্য একটি লোক ভিতরে যাচ্ছে, সে ভাবতে লাগল কি হয়েছে? তার উত্তেজনা ফেটে পড়ল, সে একজন আরব. তার ভিতরে আছে গীরাহ, ঈর্ষা, সে বলল, এই শোন! সে লোকটির কাছে গিয়ে জাপটে ধরল, বলতে লাগল, এটা আমার বাড়ী, এটা আমার বাড়ী, তাদের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেল, শহরের লোকেরা তাদের পাশে এসে জড়ো হল, ফারুককে বলল, তাকে ছেড়ে দাও, এটা তারই বাড়ী, আর সে বলতে লাগল, “আমি ফারুক, এটা আমার বাড়ী।”

ঐ বাড়ীর মধ্যে ছিলেন একজন বয়ষ্ক মহিলা, আর সে সেখানে বসে কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল, এটা কি হতে পারে? না...সে নিজেকে আবৃত করে নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে এল, আর ফারুককে দেখতে পেয়ে

চিৎকার করে উঠল, "এ হচ্ছে আমার স্বামী ফারুক, তাকে ছেড়ে দাও, সে ৩০ বছর যাবৎ জিহাদে ছিল, এইমাত্র সে ফিরেছে।" লোকেরা কাঁদতে লাগল, ফারুক আর সুহাইলা পরস্পর ভালবাসার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হল, তার আবার একত্রিত হল, এবং গল্প করতে করতে ভিতরে চলে গেল, তার হাসছিল, ঠাট্টা করছিল, কাঁদছিল, তাদের ভিতর সবকিছু বেরিয়ে আসতে লাগল, সুহাইলা বলল, আহ ফারুক! তুমি আমাকে যেমন টা রেখে গিয়েছ, আমি তার চাইতেও অনেক বয়স্কা হয়েগেছি,আমি অল্প বয়স্কা ছিলাম, সুন্দরী ছিলাম, আমাকে দেখতে এখন আর ওরকম লাগে না। আর সে তাকে বলল, সুহাইলা তুমি পৃথিবীর সবচাইতে সুন্দরী রমণী, কারণ সে তার ধার্মিকতা, সচ্চরিত্র কে ভালবাসত, আর সে এখনো সুহাইলাকে পাগলের মত ভালবাসে, আর সে সেখানে তাকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করে রেখেছিল, আর তার দুই জনই কাঁদছিল। অবশেষে ফারুক সম্বিৎ ফিরে এল, স্বাভাবিক হল, আর বলল,

-"আচ্ছা সুহাইলা, আমি একটা সিন্দুক রেখে গিয়েছিলাম, এর মধ্যে ২২ কোটি টাকা ছিল। ৩০০০০ হাজার দিনার ছিল ওতে। কি হয়েছে ওটার?"

- সুহাইলা বলল, " ফারুক, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাস করি, তুমি কি মসজিদে গিয়েছিলে?" সে জানে ফারুক গিয়েছিল, সুহাইলা বিচক্ষণ ছিল, তারা আল্লাহভীরু আর দ্বীনদার ছিল, আর এটা ছিল সুন্নাহ, তুমি কি মসজিদে গিয়েছিলে?

- “হ্যাঁ, আমি গিয়েছিলাম।” ফারুক বলল।

- তুমি কি সেখানে কিছু দেখেছো?

- সে জবাব দিল “চমৎকার উলামাবৃন্দ” এই সময় টা বদলে গেছে, দ্বীনের ইলম বিস্তারের ধরণই পালটে গেছে।

- “তুমি কি বিশেষ কাউকে দেখেছো?” সুহাইলা আবার জিজ্ঞাস করে।

- ফারুক বলল, “একজন ছিল সত্যি অসাধারণ।”

- সুহাইলা জিজ্ঞাস করল- “এরকম একজন আলিম হওয়ার জন্য তুমি কি ব্যয় করতে রাজী আছ?”

- ফারুক জবাব দেয়, “আমি একজন জ্ঞানী হওয়ার জন্য যেকোন কিছু দিতে রাজী আছি”

- সুহাইলা এবার বলল, “তুমি কি এর জন্য ৩০০০০ দিনার খরচ করতে?”

- “হ্যাঁ, আমি করতাম।” ফারুক জবাব দেয়। “আমি চোখ বন্ধ করে, প্রায় ২২ কোটি টাকা খরচ করতাম।”

- সুহাইলা বলল, “কেমন হবে, সে যদি তোমার সন্তান হয়?”

এর পর সুহাইলা বলল, “সে তোমারই পুত্র ‘আব্দুর রহমান’।”

তার পুত্র ছিল মদীনার সর্বোৎকৃষ্ট আলেম। কারণ এটা ছিল হালাল অর্থ, আর সুহাইলা এর পুরোটাই তার পড়াশোনার জন্য খরচ করেছিল।

অনলাইনে কেনাকাটার পরিবর্তে, সে তার সন্তানকে সবচাইতে ভাল ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিল। সে সময় সে প্রায় ২২ কোটি টাকা খরচ করেছিল! এত অর্থ! তার পড়াশোনার পিছনে। আজ, এই সময়ে আমরা ইলমের জন্য কত টাকা খরচ করি? ফারুক আর সুহাইলার গল্পে ফিরে আসি, সুহাইলা বলল, "সে তোমারি সন্তান, ফারুক আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল, সে বাইরে এসে চিৎকার করতে লাগল, শাইখ আব্দুর রহমান হচ্ছে আমার সন্তান, আর আমি হচ্ছি ফারুক।" আর সে খুশীতে নাচতে লাগল, বুঝতেই পারতেছেন সে খুবই উত্তেজিত ছিল। তারা বলল "কি বলছ এসব!" তারা আব্দুর রহমানকে ডাকল, আবদুর রহমান বেরিয়ে আসল। সে বলল, "আমি তার বাবা, সে কোথায়?" একজন ব্যক্তি বলল, "আমি 'আব্দুর রহমান'।" আর যখন ফারুক তাকে দেখল, সে বুঝতে পারল, শুরুতে যে ব্যক্তির সাথে সে লড়াই করেছিল, সে তার বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছিল, সে ছিল তার পুত্র, সে তাকে জড়িয়ে ধরল, আলিঙ্গন করল, গোটা শহর এসে এই পিতাকে দেখতে লাগল,আর সে খুশীতে ফেটে পড়ল, আমার পুত্র কোন সাধারণ ব্যক্তি নয়, সে হচ্ছে 'শাইখ আব্দুর রহমান' আর সবাই এটা দেখে কাঁদতে শুরু করে দিলো। সবাই তার সাথে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ল, আর যারা কাঁদছিল তাদের মধ্যে একজন ছিলেন, যে প্রথমে অবস্থায় বাকবিতণ্ডা থামাতে এসেছিলেন, তিনি হলেন মহান ইমাম মালিক, মালিকী মাযহাবের ইমাম। তিনি সেখানে কি করছিলেন? তিনি সেই ভীড়ের মাঝে কী করছিলেন? ইমাম মালিক ছিলেন শাইখ আব্দুর রহমান ইবনে ফারুক এর

ছাত্র। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

তার নিদর্শন সমূহের (মধ্যে) এও একটি যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে (তোমাদের) সঙ্গিনীদের বানিয়েছেন,যাতে করে তোমারা তাদের কাছে সুখ শান্তি লাভ করতে পার, (উপরন্তু) তিঁনি তোমাদের মাঝে ভালবাসা ও (পারস্পারিক) সৌহার্দ্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন, অবশ্যই এর মাঝে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে। (সূরা: রুম–আয়াত: ২১)

পাঠকের পাতা

মুওয়াহহিদ
প্র কা শ ন

বিশুদ্ধ আকিদা ও নববী
মানহাজের দিকে আহবানকারি